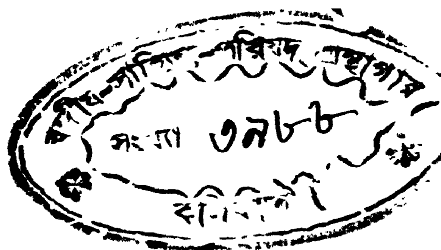
ভ্রমণের নেশা





শ্রীমণীন্দ্র নাথ মুস্তোফী

প্রকাশক—শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার
এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স্
১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

দাম দেড় টাকা

সিংহ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
প্রিণ্টার—শ্রীশচীন্দ্ররঞ্জন দাস
বাদুড়বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা
সন ১৩৩৭ সাল



স্বর্গীয় লাবণ্যকুমার সরকার

লাবণ্য আমাদের ছেড়ে চলে গেছে

তাই তারই

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গ ক'রলুম

ভূমিকা

Calcutta Wheelersদের সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যদিও আমি মোটেই সাইকেল চড়তে জানিনে। তাহ'লেও এই যুবকদল যখন যেখানে যাবার জন্য যাত্রা ক'রেছেন, সেই যাত্রার দিনে আমাকে 'শিবাস্তে পন্থানঃ' ব'লে তাঁদের যাত্রা আরম্ভ ক'রে দিতে হয়েছে। এ অবস্থায়, এই দলের অন্যতম অধিনায়ক শ্রীমান্ মণীন্দ্রের এই 'ভ্রমণের নেশা' বইখানির ভূমিকা লেখা আমার পক্ষে যে শোভন হয় না, তা আমি বেশ বুঝি। কিন্তু, শ্রীমান্ মণীন্দ্র আমাকে কিছুতেই অব্যাহতি দিতে চান না; তার প্রধান কারণ এই যে, আমিই তাঁকে এই ভ্রমণকাহিনী লিখ্‌তে প্রথম উৎসাহিত করি এবং এই 'ভ্রমণের নেশা' আমার সম্পাদিত 'ভারতবর্ষেই' প্রকাশিত হ'য়েছে। সুতরাং, যাঁকে সাইকেল চালানো থেকে টেনে এনে কলম চালানোতে আমি লাগিয়েছি, তাঁর লেখাকে অভিনন্দিত করবার ভারও আমাকেই নিতে হোলো।

শ্রীমান্ মণীন্দ্রের এই ভ্রমণের যে একটা বিশেষত্ব আছে, এ কথা সকলেই স্বীকার করতে হবে। কারণ, এঁদের ভ্রমণে, আর আমাদের সখের ভ্রমণে ঢের তফাৎ। আমরা হাবড়া ষ্টেসনে গিয়ে গাড়ীতে উঠে বিছানা পেতে শুই, আর পরদিন ঘুম ভেঙ্গে কাশীতে নেমে পড়ি। এ ভ্রমণও নয়, এর বৃত্তান্তও নেই। কিন্তু, এই wheelers দল কখন সাইকেলে চ'ড়ে, কখনও বা সাইকেল কাঁধে ক'রে, ঝড় বৃষ্টিতে ভিজে, বিপদ আপদ তুচ্ছ ক'রে এই সারা রাস্তা চলে তবে, কাশীতে হাজির হয়েছেন, জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছেন,

ষ্টিলিং এ গিয়েছেন, এমন কি ভূস্বর্গ কাশ্মীর পর্য্যন্ত ধাওয়া ক'রেছেন—এঁরাই ত ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখবার প্রকৃত অধিকারী; আর এঁদের লিখিত বিবরণই প্রকৃত ভ্রমণকাহিনী। এই সব কথা ভেবেই আমি শ্রীমান্ মণীন্দ্রকে এই সব কাহিনী লিখ্তে বলেছিলাম; তিনিও আমার অনুরোধ রক্ষা ক'রেছেন; খুব ভাল ভাবেই যে ক'রেছেন, তা, যিনি এই 'ভ্রমণের নেশা' পড়বেন তিনিই অসঙ্কোচে সে কথা বলবেন। আমি যোগ্যপাত্রেই ভার অর্পণ ক'রেছিলাম, এই আমার আনন্দ; এবং সেই আনন্দ প্রকাশের জন্যই এই সামান্য কয় লাইন এই বইখানির 'ভূমিকা' স্বরূপ লিপিবদ্ধ করলাম।

২৬।১এ, মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, ১৩৩৭ সাল

স্বাক্ষর—
শ্রীজলধর সেন।

বক্তব্য

ক্লাবের সভ্যগণ ও অন্যান্য অনুসন্ধিৎসু সাইকেল ভ্রমণকারীদের বিশেষ অনুরোধে, সাময়িক পত্রিকায় পূর্ব্বপ্রকাশিত ভ্রমণবৃত্তান্তগুলি, আজ কিঞ্চিন্মাত্রায় পরিবর্দ্ধিত ও পরিশোধিত ক'রে পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টিত হয়েছি। কিন্তু তাড়াতাড়িতে লেখার দরুণ 'ভ্রমণের নেশায়' পাঠকপাঠিকাগণের যে কতটা নেশা লাগবে—সে বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। চতুর্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত ব্যতীত বাকিগুলি চলিত ভাষায় সাময়িক পত্রিকায় লিখেছিলুম, সে জন্য আর ভাষার পরিবর্ত্তন করলুম না। ওই একই কারণে ছাপার ভুলও থেকে যেতে পারে,—এই সমস্ত অসামঞ্জস্যের জন্য আমি আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

এই পুস্তকের সমস্ত ছবি আমাদের তোলা; কিন্তু বন্ধুবর শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষের চেষ্টাতেই আজ গ্রন্থকারের ছবিটা এই পুস্তকে বিরাজ ক'রছে। গরীব-দেশে নিজেদের তোলা সমস্ত ছবিও পাঠকপাঠিকাগণকে উপহার দেওয়ার সৌভাগ্য সব সময়ে হয় না; তাই আমারও হয়নি। জনসাধারণের উৎসাহ লাভে যদি বঞ্চিত না হই, তবে আশা আছে ভবিষ্যতে নিজেদের তোলা ছবির আরও কতকগুলি উপহার দিতে পারবো।

আজ একটি কথা বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের কার্য্যকরী সমিতির সভ্য, বাল্যবন্ধু লাবণ্যকুমার সরকারকে চিরদিনের মতই হারিয়েছি। মানুষ চিরদিন বাঁচে না—সে জন্য দুঃখ করা বৃথা; তথাপি তার অভাবে আজ আমরা দুঃখে ও শোকে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছি। চতুর্থবারের ভ্রমণে সে আমাদের সঙ্গে যোগদান ক'রেছিল, তার সেই ভ্রমণ-কাহিনী আজ দশজনের হাতে দেবার সৌভাগ্য হয়েছে—কিন্তু, সে আজ কোথায়! মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে তাকে এমন ক'রে তিন দিনের মধ্যে নিউমোনিয়া রোগে নিষ্পেষিত ক'রে ছিনিয়ে নেবার কি প্রয়োজন ছিল বিধাতার! ২রা শ্রাবণ ১৩৩৭ সালে সে আমাদের ছেড়ে গেছে, তাই তার স্মৃতি আমাদের কাছে চিরন্তন ক'রে রাখতে চাই।

সুবিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেন মহাশয় অনুগ্রহ পুর্ব্বক এই পুস্তকের মলাটের ছবিটী ও ক্লাবের চিহ্ন স্বরূপ রেখা চিত্রটী অঙ্কিত ক'রে দিয়েছেন।

কি আমাদের ভ্রমণে, কি এই পুস্তক প্রকাশে—পূজনীয় জলধর দাদামহাশয়ের যে স্নেহের তাড়না ও উৎসাহ পেয়েছি, তা' এই বক্তব্যের মধ্যে তুচ্ছ এক লাইনের একটু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাঝ দিয়েই শেষ ক'রে ফেলে, তাঁর সে আন্তরিক স্নেহ ও উৎসাহকে অপমানিত করতে চাই না।

প্রুফ দেখা ও অন্যান্য ব্যাপারে বন্ধুবর সুসাহিত্যিক শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্যের অনেক সাহায্য পেয়েছি, সে জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'রতে চাই না, কারণ তাকে জ্বালাতন ক'রবার দাবী রাখি।

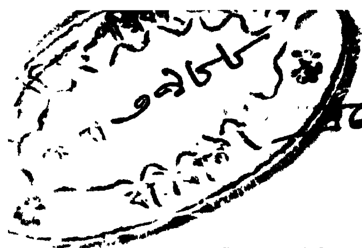
১৯ বি, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা
১৪ই চৈত্র, ১৩৩৭ সাল

গ্রন্থকার

সূচীপত্র



গ্রন্থকার



ভ্রমণের নেশা

কি করা যায়!

"ক্লাবের উৎপত্তি"

পচা ভাদ্রের শেষ। চারিদিন ধরে অনবরত ঝুপ্ ঝুপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে। সূয্যিমামা মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে উঁকি মেরে আবার কোথায় লুকিয়ে পড়ছেন। প্রকৃতিদেবী সহরটিকে মেঘের মশারি দিয়ে ঢেকে আব্ছা কালোবর্ণে ভূষিত করেছেন। সর্ব্বত্র জলে প্যাচ্ প্যাচ্ করছে। বিশেষতঃ সরু গলি গুলির অবস্থা একেবারে শোচনীয়। কোন কোন বড় রাস্তা পাথরের খোয়া বেরিয়ে কঙ্কালসার হয়ে পড়েছে। পথিকের পথ চলা ভার। কাজের খাতিরে অনেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঘরের ভেতর থেকে বাধ্য হয়ে পথে বেরিয়েছেন।

এমনি বর্ষার দিনে বিডনষ্ট্রীটে পিচের রাস্তা দিয়ে একখানি 'ফোর্ড' মোটর এক খর্ব্বকায় বিরাট বপু বিশিষ্ট লোককে নিয়ে রাস্তার কাদাটে জল ছিটোতে ছিটোতে চিৎপুর রোড্ লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছিল। হঠাৎ পিছ্লে গিয়ে সার্কুলার রোড্ অর্থাৎ একেবারে উল্‌টো দিকে ঘুরে একখানা গরুর গাড়ীর পিছনে লাগালো ধাক্কা। যা'হোক্, বিশেষ কিছু ক্ষতি না হ'লেও দুই চালকে বহু বাদানুবাদের পর বর্ষাঋতুকে দোষারোপ ক'রে যে যার গন্তব্য পথে চলে গেল। তখন আমি, আমার মেজদাদা

শ্রীদেবেন্দ্র মুস্তোফী ও বাল্যবন্ধুদ্বয়, জহরলাল দত্ত এবং লাবণ্যকুমার সুরকার, কলকাতার উত্তরভাগে হেদুয়াপুকুরে ন্যাসন্যাল সুইমিং ক্লাবে'র সভ্যরূপে, সাতার কাট্‌তে দ্বিচক্রযানে আরোহণ ক'রে রবিবাবুর "বারি ঝরে ঝর ঝর ভরা ভাদরে..." গাইতে গাইতে যাচ্ছিলুম। পথে এই মজার ধাক্কাধাক্কির দৃশ্য দেখে আমাদের গান গাওয়া থেমে গেল। আমরাও ধাক্কাধাক্কির ভয়ে খুব সাবধানে সাইকেল চালিয়ে সুইমিং ক্লাবে হাজির হলুম। সে দিন ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯২৬ সাল।

আমরা এখন মা' সরস্বতীর কৃপা হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে মা' লক্ষ্মীর কৃপালাভের জন্য ব্যস্ত। কোন লম্বা ছুটি পেলে কলকাতায় থেকে ঘরে বসে বাজে গল্প-গুজব কিম্বা বন্ধুর বাড়ী গিয়ে তাস পাশা খেলে বৃথা সময় কাটানো আমাদের স্বভাবের বিরুদ্ধ। কলকাতার নিকটে বা দূরে ছুটি পেলেই যথা সম্ভব একটু হৈ হৈ করতে বেরিয়ে পড়ি। হঠাৎ আমাদের ঘাড়ে কি ভূত চাপ্‌লো জানি না—পুকুরে সাঁতার কাট্‌তে কাট্‌তে চারজন বন্ধুতে পরামর্শ হ'ল, এবার পূজার ছুটিতে সাইকেলে 'ডায়মণ্ডহারবার' বেড়িয়ে আস্‌তে হ'বে। আমি বললুম, "ডায়মণ্ড-হারবারে" কয়েকবার ট্রেণে যাওয়া হয়েছে, তার চেয়ে মধুপুর কিম্বা গিরিডি পর্য্যন্ত গেলে হয় না?" জহর বললে' "শোন হে শোন, চল এখান থেকে একেবারে ৺কাশীধামে। একটু পুণ্যি সঞ্চয়ও করা যাবে, আর ভাব দেখি বিডিনষ্ট্রীটে গরুর গাড়ীর সঙ্গে অদ্ভুতভাবে ধাক্কা লাগিয়ে মোটর খানার পিপের মত ক্ষীণ দেহী মালিক যখন দেখলেন, তাঁদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয়নি, অমনি বলে উঠলেন—'বাঃ বেশ একটা adventure হয়ে গেল'—তেমনি আমরাও পথে যেতে যেতে দু-চারটে adventureও করবো; কি বল হে?" জহরের কথায় আমরা হাসি সম্বরণ করতে না পেরে একচোট খুব হেসে নিলুম। এরূপ পাজরফাটা হাসি দূর থেকে শুন্‌তে পেয়ে সুইমিং ক্লাবের বন্ধুবর ব্যোমকেশ দাস

ঝপাং ঝপাং ক'রে সাঁতার কাটতে কাটতে আমাদের দলে এসে ভিড়ে গেল। আমরা এখন দলে পাঁচজন হয়ে পূজার ছুটিতে কি করা যায়, এ বিষয় নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হ'ল—সাইকেল ক'রে চারিদিক দেখতে দেখতে ৺কাশীধাম পর্য্যন্তই পাড়ি দিতে হবে।

বেড়ানোর নেশা আমাদের প্রচণ্ড। কাছাকাছি গ্রামে বা সহরে পায়ে হেঁটে কিম্বা ট্রেণে চড়ে এ সাধ আমরা মেটাই। ট্রেণে বেড়িয়ে তেমন আনন্দ হয় না; কেন না ট্রেণে চেপে যাওয়া মানে—একস্থান থেকে অন্য স্থানে হুস্ ক'রে গিয়ে পড়া। যেখানে গেলুম সেই স্থানেরই যা-কিছু বৈচিত্র উপভোগ করলুম, পথের মাঝে দেখবার এবং উপভোগ করবার যোগ্য কত স্থানের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটে না। তার উপর তা'তে adventure এর মজাটুকু ভাগ্যে জোটে না। কিন্তু সাইকেলে ভ্রমণ করলে এ আনন্দ উপভোগ করবার যথেষ্ট সুযোগ ঘটবে—ঝাঁ ঝাঁ রৌদ্র, ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি, হি হি শীত—সবই সহ্য করতে হবে। কোথায় খাবো, কি বা খাবার জুটবে কিছুরই স্থিরতা নাই, তবু এতেই প্রচুর আনন্দ। তার সঙ্গে দুঃসাহসিকতা, বিপদের সম্মুখীন হওয়া এবং দলবদ্ধভাবে থাকা—এ সব ত আছেই। পদব্রজে ভ্রমণ করার ফল একই বটে, কিন্তু তা' কম সময়ের মধ্যে হয়ে ওঠে না। মোটর কিম্বা মোটর-সাইকেলে কিছু আরাম পাওয়া যায় বটে; কিন্তু সাইকেলে কিম্বা পদব্রজে কয়েকজন মিলে যদি কতকগুলি নিয়ম মেনে ভ্রমণ করা যায়, তাহলে দলবদ্ধভাবে থেকে কষ্ট সহ্য করা, একত্রে কোন কাজ করা ও অন্যান্য অনেক জিনিষই শেখা যায়। আমাদের এই ভারতবর্ষের মধ্যে কতদিকে কিরূপে পাহাড়-পর্ব্বত, বন-জঙ্গল ও নদনদী অতিক্রম ক'রে 'হাঁটাপথ' ছাড়িয়ে রয়েছে, লোকে তা' ধারণা করতেও পারে না। প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জরীপের পর নূতন পুরাতন পথ সকল মানচিত্রে প্রকাশ হওয়ায়, আজিকাল ভ্রমণের সুবিধাও যথেষ্ট। অধিকাংশ পথেই মোটর গাড়ী চলতে পারে। যাঁ'

হোক, অবসর মত সাইকেল, মোটর-সাইকেল, মোটর অথবা পদব্রজে এই সকল পথ অতিক্রম করা ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করবার জন্য একটি ক্লাব গঠনে আমাদের চার-বন্ধুর ইচ্ছা জাগল।

ক্রমে দিনের পর দিন অতিবাহিত হয়ে বর্ষার প্রচণ্ড ভাব কেটে গেল। পেঁজা তুলার মত শরতের মেঘের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যদেব আবির্ভাব হোলেন। সহরের লোকেরা এতদিনে যেন হাঁফছেড়ে বাঁচল। ওদিকে মা'দুর্গার আগমনীর বার্ত্তায় সারা সহরটি যেন কি এক অপূর্ব্ব আনন্দে ভরে উঠলো। সকলের মনেই স্ফূর্ত্তি; কিন্তু মায়ের আগমনের জন্যই কি সকলে হাসি-খুসি ভাব ধারণ করেছে? না, বর্ষার শেষে প্রকৃতিদেবী অন্যরূপ ধারণ করায় আজ সহরবাসী এত স্ফূর্ত্তিযুক্ত।

আমরাও ছুটিতে মহা আনন্দে পূজার মরসুমে ১৮ই অক্টোবর সাইকেল ভ্রমণের দিন স্থির করলুম। সঙ্গে সঙ্গে এই পথের পথিক হতে অনেক নূতন সাথীর আবির্ভাব হ'ল। একদিন সকলে একত্র হওয়ায় আমার মেজদাদা ক্লাবটি "ক্যালকাটা হুইলার্স" নামে অভিহিত করলেন। নামটি সকলেরই মনমত হ'ল; কিন্তু ক্লাবের সভ্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখবার জন্য ভ্রমণকারীদের উপযুক্ত নিয়ম কানুন স্থাপনের কথা তোলায় দু-চারজন ব্যতীত সকলেই অমত প্রকাশ করলেন। তাঁদের মতে নিয়মের মধ্যে থাকলে পরে না কি 'বন্ধু-বিচ্ছেদের' সম্ভবনা বেশী। আসল কথা আমাদের দেশবাসী এখনও এত পিছিয়ে রয়েছে যে, কেউ কারো অধীনে থেকে নিয়মের ভিতর দিয়ে সুশৃঙ্খলভাবে কোন কাজ করতে সক্ষম নয়; কিন্তু প্রত্যেক কাজ নিয়ম-কানুনের ভেতর দিয়ে পরিচালিত হ'লে একতা স্থাপিত হয় এবং অতিদুরূহ কাজও সহজে সম্পন্ন হয়। কথায় বলে—"সকলে রাজা হ'লে প্রজা হবে কে?" অগত্যা নিয়ম কানুনের কথা বাদ দিয়ে আমরা তাঁদের মতেই মত দিলুম।

"আসানসোলের পথে"

ভ্রমণকাহিনী সুরু করবার আগে আমাদের সঙ্গে কি কি জিনিষ ছিল, সংক্ষেপে সেটা বলা দরকার। প্রত্যেক সাইকেলের ক্যারিয়ারে একটি থলের ভিতর কম্বল, সোয়েটার, একখানি ধুতি ও সাদা রংএর সার্ট কিম্বা পাঞ্জাবী। একজনের কাছে সাইকেলের 'রড্' এ বাঁধা 'হ্যাভার্স্যাকে'র মধ্যে সাইকেল মেরামতের যাবতীয় যন্ত্রপাতিগুলি রাখা ছিল। তিনটি 'টর্চ-লাইট,' একটি বড় গোছের মাংস খোড়া মজবুত ছুরি, একটি দার্জ্জিলিংএর ভোজালি, পাউরুটি কাটা ও কতকগুলি পেন্সিল কাটা ছুরি, প্রত্যেকের কাছে জলের বোতল, একজনের কাছে 'বেঙ্গল কেমি-ক্যাল এণ্ড ফার্ম্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস্' প্রদত্ত নানা প্রকার প্রয়োজনীয় ঔষধাদি, একটি ক্যামেরা এবং প্রত্যেকের কাছে 'অসময়ের বাঁশী' অর্থাৎ এই বাঁশী (Guard's whistle) বিপদকালে বাজালেই—যে যেখানে থাকবে, তার সাহায্যার্থে আস্তে বাধ্য হবে। পরনে খাকী 'সার্ট' ও 'হাফ্প্যাণ্ট,' পায়ে পশমের মোজা ও বাদামী কিম্বা কালো রংএর 'ডারবি' অথবা 'অক্সফোর্ড' জুতো এবং ক্লাবের Badge আঁটা মাথায় 'সোলাহ্যাট্'।

১৮ই অক্টোবর ভোর সাড়ে চার-টের সময় বাড়ী থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আটজন দেবেন্দ্র মুস্তোফী, কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী, জহরলাল দত্ত, মণিলাল গুঁই, রাধারমণ দত্ত, বলাইচন্দ্র বসু, ব্যোমকেশ দাস ও মণীন্দ্র মুস্তোফী, তীর্থভূমি বারাণসীর উদ্দেশ্যে বের হলুম। বড়ই দুঃখের বিষয় লাবণ্যকুমার সরকার 'নিউমোনিয়া' রোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমাদের সঙ্গের সাথী হতে পারেনি। চারবৎসর পরে এই একই রোগ যে, তার কালসরূপ হ'বে, তা' কে জানতো!

তখনও রাস্তায় গ্যাসের আলো পথ দেখাচ্ছে। কোথাও বা কোন বাড়ীর রোয়াকে, কোথাও বা ফুটপাতে পাছের গায় হেলান দিয়ে, লাল পাগড়ীওয়ালারা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে সকাল হলে, কখন তাদের সঙ্গীরা এসে

রেহাই নেবে, বোধ হয় সেই স্বপ্নই দেখছে। আর মাঝে মাঝে দু-একটা 'রিক্স'—ঠং ঠং শব্দে চলেছে। বালতি ঝাঁটা হাতে নিয়ে রাসভারি সুরে 'রামা হো, রামা হো' করতে করতে ঝাড়ুদার সবেমাত্র মহানগরীর পথে বেরিয়েছে। কোথা থেকে লাঠি হাতে একটি লোক ছুটতে ছুটতে রাস্তার গ্যাসে লাঠিটাকে ঠেকাতেই—টুপ ক'রে নিভে আলোটা ছুটি পেয়ে বাঁচলো; আমরাও গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডে এসে পৌছলুন।

অন্ধকারে যেতে প্রথমে বড়ই অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু যখন পিচের রাস্তায় এসে পড়া গেল, তখন আমরা বেশ আরামের সঙ্গে জোরে যেতে লাগলুম। কিছুক্ষণ যেতেই রাস্তার পাশ দিয়ে গঙ্গা। ওপারের আকাশটায় লাল আভা ক্রমশঃই ফুটে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে 'বালি'তে এসে হাজির হলুম। পিচের রাস্তা বালি পর্য্যন্তই শেষ। এবার রাস্তা খারাপ থাকা সত্ত্বেও ভোরের বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চন্দননগর (২৩ মাইল) এসে শ্রীযুক্ত সত্যেন বসু মহাশয়ের বাড়ীতে তাঁর কথামত উপস্থিত হলুম।

চন্দননগর পৌছেই আমরা যে যার গাড়ীগুলা পরিষ্কার ক'রে স্নান করতে গেলুম। স্নান সেরে ঘরে ঢুকতেই দেখি, আমাদের জন্য চা ও জলখাবার প্রস্তুত। কিছুক্ষণ গল্প গুজব ও ভাতের চিন্তা করতে করতেই ডাক পড়লো—তখন বেলা ১২টা। বেলা দেড়টার সময় সত্যেন বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে বর্দ্ধমান অভিমুখে যাত্রা করলুম।

পাণ্ডুয়াতে অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর পুনরায় সাইকেলে চেপে বসলুম। গোধূলি-লগ্নে প্রকৃতি-দেবী যেন একখানা ছাই রংএর শাড়ী প'রে মোহন-পটে আবির্ভূত হয়ে সন্ধ্যার আগমন জানিয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে গগনে শান্ত, স্নিগ্ধ রশ্মিযুক্ত সুধাকরের আবির্ভাব হ'ল। মনে হ'ল যেন প্রকৃতি সুন্দরী তাঁর সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করবার জন্য ছাই রংএর আবরণ পরিত্যাগ ক'রে 'চাঁদের আলো' শাড়ী পরেছেন। সারা দিনের শ্রান্ত দেহে ঠাণ্ডা মেঠো হাওয়া লাগতেই নূতন বলের সঞ্চার হ'ল। বর্দ্ধমানের

রাঙ্গামাটির পথ দিয়ে হু হু ক'রে এগিয়ে চলেছি; এমন সময়, বাঁশীর ইঙ্গিতে সকলকে থাম্‌তে হ'ল। গাড়ীর 'ব্রেক' কস্‌তে না কস্‌তেই আমাদের জহর, "একটা ছাতি পড়ে আছে" বলে চীৎকার করতে করতে তার গাড়ীটা কোন রকমে আমার হাতে ঠেকিয়ে দিয়ে, এক গাছতলা থেকে একটা নূতন ছাতি নিয়ে এসে হাজির করলে। ছাতির মালিকের অনুসন্ধানের জন্যে, পথে কোন ব্যক্তিকে না দেখতে পেয়ে 'কার ছাতি পড়ে আছে' বলে অনেক ডাকাডাকির পরও যখন ছাতির অভিভাবকের সন্ধান পাওয়া গেল না, তখন পথের স্মৃতি-স্বরূপ ছত্র মহাপ্রভুকে সঙ্গীরূপে বরণ ক'রে. দাবী বিহীন দ্রব্য নেওয়ার অপরাধে অপরাধী হলুম।

তখন রাত সাড়েন-টা। দূরে কতকগুলি আলো দেখা গেল। যতই কাছে যাই ততই আলো। দু-একটা গরুর গাড়ী কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ শব্দ করতে করতে তার গন্তব্য পথে চলেছে। ক্রমে ক্রমে লোকজন, গাড়ী ঘোড়া, ঘর বাড়ী দেখা যেতে লাগলো। রাস্তার খেঁকি কুকুরগুলো আমাদের দেখে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকতে ডাকতে, আমাদের বর্দ্ধমান (৭৩ মাইল) পৌঁছান সংবাদ সহরবাসীদের জানিয়ে দিলে। বর্দ্ধমানের পুলিস সুপারিণ্টেনডেণ্ট রায় সাহেব তপেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীতে আমরা অতিথি হলুম। তপেন বাবু নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন; আমাদের আগমন বার্ত্তা তাঁর নিকট পৌঁছাতে তৎক্ষণাৎ উঠে এসে অভ্যর্থনা করলেন।

১৯শে অক্টোবর:—ক্লান্ত দেহ পেয়ে নিদ্রাদেবী গতরাত্রি আমোদে কাটিয়ে সকাল সাতটার সময় অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় গ্রহণ করলেন। আমরাও নিশুতিসুন্দরীর অভাবে অলসে বিছানায় পড়ে না থেকে, নির্দ্ধারিত কাজ সাইকেল পরিষ্কারে লেগে গেলুম। আমাদের বর্দ্ধমান ত্যাগ করবার কথা ছিল ভোর ছ-টার সময়, কিন্তু অনিয়মে 'গোলে হরিবোল' দিয়ে বেরুলুম বেলা আটটায়।

পথে যেতে যেতে হঠাৎ আমার গাড়ীর সামনের টিউবটা 'লিক্' হ'ল; রাস্তার ধারে গাছের গায়ে গাড়ীটা রেখে রাধু খুব শীঘ্রই 'লিক্' সেরে দিলে। আমাদের ভেতর সকলের অপেক্ষা রাধু সাইকেলের "ডাক্তারী" ভাল রকম জানে। কয়েকজন এগিয়ে পড়েছিল, আমরা ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী হাঁকিয়ে তাদের নিকটবর্ত্তী হলুম। চলেছি-ত চলেছি-ই! ক্রমশঃ সূর্য্যের তেজ প্রখর হ'তে প্রখরতর হ'তে লাগলো। সবুজবর্ণ রেখার ন্যায় দু-পাশে ধানের ক্ষেতগুলি হুস্ হুস্ ক'রে পার হয়ে যেতে লাগলো। এমন সময় একটি গ্রাম দেখা গেল। বেলা এগারটা প্রায় বাজে। স্নানাহারের বন্দোবস্ত কোথায় করা যায়? তাই আমরা গ্রামটি পেয়ে সাইকেল চালান স্থগিত রাখলুম। গ্রামের নাম 'গোলসি' (৮৭ মাইল)।

ম্যালেরিয়াপ্রধান বর্দ্ধমান জেলার গ্রামটির ভিতর ঢুক্তেই 'বালামৃত' বিজ্ঞাপনে দাঁড়িপাল্লায় উপবিষ্ট কঙ্কালসার বুক ও মোটা-পেট বিশিষ্ট বালকের ন্যায় গণ্ডাকতক ছোট ছোট দিগম্বরের দল এসে আমাদের ঘিরে ফেল্লে। সঙ্গে দু-চারজন বয়সী লোক থাকায়, এস্থানে ভাল পুকুর কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করলুম। দিগম্বরের দল সমস্বরে চীৎকার ক'রে বলে উঠলো "মোশাইরা আসুন আসুন, গাঙ্গুলীদের পুকুরে ভাল জল আছে, চান কর্‌বেন ত? আমরা পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।" হৈ হৈ ক'রে তারা ত আমাদের গ্রাম্য মেঠো পথ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রায় মাইল খানেক পরে একটি বেশ বড় পুকুর-ধারে এনে হাজির করলে। পুকুর ত পাওয়া গেল, এখন একটু 'ক্লান্ত-পদে' তৈল মর্দ্দন করলে হতো ভাল, কিন্তু তেল পাই কোথা? আমাদের এরূপ পরামর্শ শুন্‌তে পেয়ে, ছেলেরা পোঁ ক'রে ছুটে যেতে যেতে বল্‌তে লাগলো, "গাঙ্গুলী বাড়ী থেকে তেল এনে দিচ্ছি, মোশাইরা একটু অপেক্ষা করুণ, মোশাইরা একটু অপেক্ষা করুণ...।" অবশেষে দিগম্বরবৃন্দ তৈলের বদলে গাঙ্গুলী

মহাশয়কে এনে হাজির করলে—আমরা ত অবাক! যা'হোক, হিন্দুর হিন্দুত্ব বজায় রাখ্তে গাঙ্গুলী মহাশয় দ্বারে অতিথি দেখে, আমাদের তাঁর বাড়ীতে যেতে অনুরোধ করলেন। গ্রামের মধ্যে পুকুর খুঁজতে খুঁজতে ভাগ্যক্রমে এরূপ সদাশয় ব্রাহ্মণের আশ্রয় পেয়ে আমরা হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলুম এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরে উঠ্লো। গাঙ্গুলী মহাশয়দের পুকুরে খুব একচোট সাঁতার দেওয়া গেল। আমাদের সাঁতার কাট্তে দেখে অনেকেই আশ্চর্য্য হ'য়ে বলেছিলেন, "কল্কাতার নোক্ আপনারা, কি ক'রে সাঁতার শিখ্লেন, ওখানে কি পুকুর-ঘাট আছে?" আমরা তাঁদের বুঝিয়ে দিলুম—কলকাতার অমন "ন্যাসন্যাল্ সুইমিং ক্লাব" থাকতে সাঁতার শেখার ভাবনা! অতঃপর শ্রীযুক্ত বলরাম গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ীতে আহারান্তে বেলা তিনটার সময় বিদায় নিলুম।

যখন 'পানাগড়' (১০৩ মাইল) এ পৌছলুম, তখন রাত হয়ে গেছে। পানাগড় ছাড়িয়ে পথে প্রায় চার মাইল জঙ্গল। রাত হয়ে যাওয়ায় আর 'এগুনো হ'ল না। রাস্তার বাঁ-দিকে কিছু দূরেই রেলওয়ে ষ্টেসন। তথায় কয়েকটি খাবারের দোকান আছে। একটি দোকান থেকে 'পুরি' ইত্যাদি কিনে উদরানল পরিতুষ্ট করা গেল। দোকানে এক ভদ্রলোকের সহিত আলাপ হ'ল। তিনি পানাগড়ের নিকটবর্ত্তী 'কাঁক্সা' নামক গ্রামের দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার। ডাক্তার বাবুর কৃপায় তাঁর বাড়ীতেই রাত কাটানো গেল।

২০শে অক্টোবর :—প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর, চা ও মুড়ি ঠেসে খেতে খেতে চোয়ালে বেদনা ধরলো। কি জানি, পথে যেতে যেতে এ বেলা যদি কোন আহার না জোটে; সেই কারণে চোয়ালের বেদনা অগ্রাহ্য ক'রে সকলের মুখেই 'কড়র্-মড়র্-চাকুম্ চুকুম্' শব্দে ঘরটি মুখরিত হয়ে উঠ্লো। এরূপে উদর-পুষ্টির পর আবার যাত্রা। পথে দুর্গাপুর

জঙ্গল প্রায় ১১১ মাইলে আরম্ভ। এখানে নাকি শূকরের ভয় আছে। কিন্তু বানর ও শৃগাল ব্যতীত আমাদের নজরে অন্য কোন জন্তু আবির্ভূত হয়নি। দু'পাশে কয়েক স্থানে জঙ্গল বেশ ঘন। এই জঙ্গল থেকে রাস্তা উঁচু-নীচু সুরু হয়েছে। চারি মাইল জঙ্গলটি পার হ'তে লাগলো প্রায় মিনিট কুড়ি। জঙ্গল শেষে বাঁয়ে—ফরিদপুর থানা। থানার ধারে একটি বড় ইঁদারায় পরিষ্কার জল দেখে, শূন্য জলের বোতলগুলি পূর্ণ করা হ'ল।

১১৭ মাইল পাথরের কাছাকাছি পথের ডানদিকে চমৎকার একটি সাদা বাড়ী দেখতে পাওয়া গেল। ধান ও আকের ক্ষেতের মাঝে আলের উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে ক্ষেত ধোয়া জল বাঁচিয়ে সাইকেল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে গ্রামের মধ্যে হাজির হলুম। গ্রামের নাম 'ভিরিঙ্গী'। সাদা বাড়ীটা জমিদার শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের। গ্রামের ভিতর প্রবেশ করতেই স্বয়ং জমিদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। তিনি আমাদের সাইকেল-ভ্রমণের বিষয় অবগত হয়ে অতিশয় সন্তুষ্ট-চিত্তে অভ্যর্থনা করলেন। বাঙ্গলার সচরাচর জমিদার বর্গের সঙ্গে বসন্তবাবুর স্বভাব মোটেই খাপ্ খায় না। নানারূপ আলোচনায় যতদূর বুঝলুম, তিনি পরমধার্ম্মিক বলেই মনে হ'ল। প্রত্যহই এঁর বাড়ীতে বহু অতিথির সমাগম হয়। এ ছাড়া 'বারো মাসে তের পার্ব্বনে'র সময় গরীবদুঃখী প্রজারা কিঞ্চিৎ লাভবান্ হয়ে দু-হাতে জমিদার মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করতে করতে চলে যায়। বসন্তবাবুকে দেখলে কেহ 'জমিদার' বলে ধারণা করতে পারে না; মনে হয় যেন দুর্গম পথের পথিক—এক সাধু!

তখন সন্ধ্যা ছ-টা। আসানসোলের (১৩৭ মাইল) পোষ্ট-অফিসে চিঠি ফেলতে গাড়ীর গতিরোধ করলুম। আমাদের দেখতে অনেক লোক এসে ভিড় ক'রে ফেললে ও নানারূপ জবাবদিহি করতে করতে আমরা হাঁফিয়ে যাবার উপক্রম হলুম। সাইকেল হাতে একটি ভদ্রলোক

ভিড় ঠেলে আমাদের নিকট উপস্থিত হ'লেন। আলাপ পরিচয়ে জানতে পারলুম, ইনি আসানসোল থেকে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী 'রতিবাটী-কোলিয়ারী'র ম্যানেজার। ম্যানেজারবাবু রতিবাটি নিয়ে যাবার প্রস্তাব করায়, আমরা ত নেচে উঠলুম ; কারণ আমাদের ভাগ্যে কোলিয়ারীর দর্শন ঘটবে। চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। আমরা সাইকেলের আলো জ্বেলে নিলুম। আবার যেদিক থেকে এসেছিলুম, সেই দিকে প্রায় তিন মাইল গিয়ে, ডান দিকে একটা রাস্তা ধরলুম। হঠাৎ দেখি ম্যানেজারবাবু পাকা রাস্তা ছেড়ে মেঠো রাস্তা ধরলেন। আমরাও তাঁর পেছু নিলুম। এই মেঠো কদর্য্য রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে অনেকে 'কুমড়ো গড়াগড়' খেতে লাগলো। অবশেষে ক্ষুদ্র একটী নদীর ধারে এসে পড়লুম। নদীতে কোন সাঁকো না থাকায় জুতো-মোজা খুলে গাড়ী কাঁধে হাঁটুভোর জল পার হয়ে পরপারে উপস্থিত হলুম। নদীর ধারে খোলা যায়গার উপর ম্যানেজারবাবুর 'বাংলো' অবস্থিত। রাত্রে ম্যানেজারবাবুর বাংলোয় গান-বাজনার মজলিস্ জমানো হ'ল। অনেক রাত অবধি খুব আমোদে কাটিয়ে, বিছানো কম্বলের উপর গা ঢেলে দিলুম।

২১ শে অক্টোবর :—প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কোলিয়ারী দেখতে সকলে সাইকেল সমেত যাত্রা করলুম। অতি জঘন্য পথ বেয়ে মাইলখানেকের মধ্যে কোলিয়ারী। ম্যানেজারের সঙ্গে কোলিয়ারীর গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করায় কর্ম্মীগণ আমাদের শুদ্ধ লম্বা লম্বা সেলাম ঠুকতে লাগলো। আজকের কাজ কর্ম্মের সম্বন্ধে বন্দোবস্ত ক'রে ম্যানেজারবাবু আধঘণ্টা পরে আমাদের নিয়ে এলেন এক 'লিফ্ট' এর কাছে। লিফ্টের নিকট সর্ব্বদাই একটি লোক দাঁড়িয়ে থাকে। ম্যানেজারবাবুর হুকুম মাত্র সে একটা লোহার তার ধরে কয়েকবার নাড়া দিতেই একটি খাঁচা নীচু থেকে উপরে এসে হাজির হ'ল। আমরা সেই

খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করতেই তীরবেগে খাঁচাটি পাতাল প্রবেশ করতে লাগলো। খাঁচাটি বাষ্পীয়শক্তির দ্বারা চালিত। যতই পাতালপুরীতে অগ্রগামী হচ্ছি, ততই অন্ধকার ঘভূণীভ হ'তে লাগলো। গর্ত্তের গাঁথুনির গা দিয়ে বৃষ্টির মত জল চুয়ে চুয়ে পড়তে লাগলো। পাতালপুরীর পথটি ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হওয়ায়, ম্যানেজারবাবুর কথামত সঙ্গে আনীত সাইকেলের আলোগুলি প্রজ্জ্বলিত করলুম। সুড়ঙ্গটি দৈর্ঘ্যে ২৭৫ ফিট্ মাত্র। পথের শেষে খাঁচাটি গেল থেমে। আমরাও একে একে ম্যানেজার-বাবুর আলো লক্ষ্য ক'রে সুড়ঙ্গের মধ্যে এগিয়ে চললুম। কখন দাঁড়িয়ে, কখনও বা বসে যেতে যেতে হঠাৎ সঙ্গির দল ফুডুক্ ক'রে কোন এক গর্ত্তের ভেতর ঢুকে পড়লো, দেখতে পেলুম না। দলছাড়া হয়ে অন্ধকারে ঘুরতে ঘুরতে মাথাটা ঠকাৎ ক'রে গাঁথুনির গায়ে ঠুকে গেল। ভাবলুম, এমন জায়গাও আছে যেখানে আবার 'মাথায় হোঁচট্' লাগে। যা'হোক, কুঁজো হয়ে হাঁট্ছিলুম, এখন মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বসে বসে দলের অনুসন্ধানে ফিরচি, এমন সময়, মনে হ'ল বুঝি শীঘ্রই মসীময় সঙ্কীর্ণ পথের অবসান হবে, এখনি পাতালপুরীর দর্শন পাওয়া যাবে। কেন না, বন্ধদুয়ার ঘরের মধ্য হতে রাগিণীর মূর্চ্ছনা ভেসে এলে যেমন একটা চাপা চাপা ভাব থাকে, ঠিক্ তেমনি ভাবে যেন নিরালা সুড়ঙ্গ মধ্য হ'তে কতকগুলি বামাকণ্ঠের গীতধ্বনি রয়ে রয়ে ভেসে আস্ছে। 'আমি পথভোলা এক পথিক'—সে কথা মুহূর্ত্তের জন্য ভুলে গিয়ে 'ঠাকুরমার ঝুলি'র পাতালপুরীতে রাজকন্যার সাক্ষাৎলাভের জন্য আঁধার পথে এধার সেধার ক'রে বেড়াচ্ছি; হঠাৎ দেখি, কেরোসিন ডিপের আলোয় মৃদু আলোকিত স্থানে দাঁড়িয়ে কয়েকজন সাঁওতালরমণী তালে তালে কয়লার সুড়ঙ্গ গায়ে কোদাল ঠুক্তে ঠুক্তে আপন মনে গানে মত্ত। 'তারা বড় বড় ঝুড়ি নিয়ে পায়ের কাছে বাগিয়ে ধরে কয়লার দেওয়ালে কোদালের ঘা দিচ্ছে, যা'তে কয়লা গড়িয়ে এসে

তাদের কর্ম্মক্লিষ্ট পা-দুখানির ক্ষতিগ্রস্থ না করে। ঠেলা গাড়ীর পাতা লাইন সাপের মত এঁকে বেঁকে এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। কয়লা বোঝাই ঠেলাগাড়ী ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে রাজকন্যার সখিগণ—না না!—ভিন্ন একটী রমণীর দল আমার পশ্চাতে সহসা আবির্ভূত হ'ল। এরাও ছিল গানে মাতোয়ারা, কিন্তু সম্মুখে এক অচেনা হ্যাট্-পেণ্টুলুন-ধারী যুবামূর্ত্তি দেখে ভোড়্‌কে দাঁড়ালো। পরক্ষণেই কি এক ভেবে প্রায় ঊনবিংশতি-বর্ষীয় এক যুবতী আমার নিকটস্থ হয়ে বলে উঠলো, "তুই কাম্ সিখ্‌বি বুঝিরে? তোর সাদ্ধি হয়েছেরে বটেক্...... ?" একথা বলেই তার সঙ্গিনীদের প্রতি তাকাতেই, সকলে হো হো ক'রে হেসে কুটি কুটি। আব্‌ছা আলোয় তাদের এরূপ ভঙ্গি দেখে, আমি ত মহাবিভ্রাটে পড়ে গেলুম। এমন সময় তারা এক গান ধরলে। গানের প্রথম ছত্রটী আমার একটু একটু মনে পড়ছে, "এত্তঃ বড় গাইরস্থের ছেইল্লে সড়কে বাহিরিলো......।" পাতালপুরীর সুখস্বপ্নে উন্মত্ত হয়ে কল্পনা সাগরে ডুবে আছি; এমন সময়, পাশের এক গর্ত্তের ভিতর থেকে অজানিত একটি হাত এসে আমার হাতের কব্জি খপ্ ক'রে ধরায় মনে হ'ল—এবার বুঝি বা স্বয়ং রাজকন্যার সাক্ষাৎ পেলুম! ফিরে দাখি আমার সকল কল্পনা ব্যর্থ ক'রে 'জহর' বলে উঠলো, "বেশ ত তুমি! আমরা তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুমি এখানে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছ?" পাঁচ মিনিটের মধ্যেই হ'ল পাতালপুরীর সকল সুখ-স্বপ্নের যবনিকা পতন। পুনরায় দলভুক্ত হয়ে কোলিয়ারীর কয়েকটী স্থান দর্শনের পর খাঁচায় আবদ্ধ হলুম। ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কোলিয়ারী সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে, দিনের আলোয় আলোকিত বসুন্ধরার মাঝে উপস্থিত, অর্থাৎ কি না—পুনর্মূষিকো ভব।

বাংলো অভিমুখে আবার সেই জঘন্য রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পথের মাঝে বর্ষার জমা জলের মধ্যে একজন ঝুপ্ ক'রে পড়ে, জুতো মোজা

ভেজালে। আর একজনের পাথরে ধাক্কা লেগে হাত পা ছড়ে গেল। আমাদের 'বলাই' একটু ওস্তাদি করতে গিয়ে ধপাস্ ক'রে পড়ে চোখবুজে সটান শুয়ে রইলো; আর উঠতে চায় না। প্রথমে তার এই অবস্থা দেখে আমাদের বড়ই ভয় হ'ল। তারপর তার চালাকি বুঝতে পেরে 'রাধু' "এক প্রকার মজা আছে বল দেখি সবে, রাগিলেও হেসে তুমি গড়াগড়ি যাবে" এই হেঁয়ালিটি বলতে বলতে বলাইয়ের নিকটস্থ হতেই কাতুকুতুর ভয়ে সে ধড় মড়িয়ে উঠে পড়লো। অতঃপর যখন বাংলোয় পৌঁছলুম, তখন বেলা সাড়ে এগারটা।

আজ আমাদের ভ্রমণের চতুর্থ দিন। এই চার দিন আমরা সকলেই ভালরূপ অনুভব করেছি যে, বাঁধাবাঁধি নিয়মের অভাবে কখনই সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া যায় না। এ কদিন ধরে লক্ষ্য ক'রেছি, আমরা প্রত্যেকেই শুতে, বসতে, উঠতে, দাঁড়াতে—মিলিটারী। তাই আজ চারদিন অনেক প্রকার অসুবিধা ভোগ ক'রে প্রায় সকলেই বলে উঠলো, —"নিয়মকানুন না থাকলেই বন্ধুবিচ্ছেদের সম্ভবনা বেশী দেখছি, এস আজ মোটামুটি কতকগুলো নিয়ম ঠিক্ করা যাক্।"

"নিয়ম-পদ্ধতি"

ক্ষুদ্র নদীর ধার। ওপারের ওই 'কালী' পাহাড়টী সঙ্গীহীন অবস্থায় বিরাজমান। চতুর্দ্দিকে কোলিয়ারীর কালো কালো চিম্‌নী যেন ঐ পাহাড়টীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় সকল চিম্‌নী থেকেই ধূম নির্গত হচ্ছে। শীতকাল; অরুণদেব বেলা তিনটায় ম্লান-রশ্মি ধরণীর গায়ে বিস্তার ক'রে রেখেছেন। অদূরে অবস্থিত বাংলোর নিকটবর্ত্তী নদীকূলে একটি মহুয়া গাছের নীচে বসে 'হুইলার্স'গণ নিম্নলিখিত কতকগুলি নিয়মে আজ আবদ্ধ হ'ল।

<u>কার্য্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন পদনিয়োগ</u>

১। **ক্যাপ্টেন** :—এঁর কাজ, যাতে পথে শৃঙ্খলা থাকে। কেহ অসুস্থ বা আহত হ'লে তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা। পথে কোন্ স্থানে থামা হবে, সকলের সঙ্গে পরামর্শান্তে তা নির্দ্দেশ করা। যাত্রার প্রারম্ভে সকলকে ঠিক্ সময় প্রস্তুত হবার জন্য আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া। সকলে নিজ নিজ কাজ ঠিক্‌মত করছেন কিনা—তা' দেখা। ভ্রমনান্তে ক্লাবের দ্রব্য সামগ্রী সকলের নিকট হ'তে আদায় ক'রে ক্লাবের সেক্রেটারীর নিকট পেশ করা, ভ্রমণের পূর্ব্বে যতদূর সম্ভব সারা পথের খোঁজ-খবর রাখা, ইত্যাদি।

২। **ভাইস-ক্যাপ্টেন** :—প্রত্যেক বিষয়ে ক্যাপ্টেনকে সাহায্য করা এবং ক্যাপ্টেনের অবর্ত্তমানে বা কোন কারণবশতঃ ক্যাপ্টেন কাজে অসমর্থ হ'লে, ঐ কাজের সম্পূর্ণ ভার নেওয়া।

৩। **কোয়ার্টার-মাষ্টার** :—এঁর কাজ, কোন স্থানে পৌছুলে থাওয়া এবং থাকা সম্বন্ধে ব্যবস্থা করা। খাবার কেনবার আগে ইনি দেখবেন, সে খাবার স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল কি না। এঁর অনুমতি

ছাড়া কেউ কোন খাবার কিনে খেতে পাবেন না। পথের দৈনিক খরচের জন্য সকলে এঁর কাছে দরকার মত সমান ভাগে চাঁদা দিতে থাকবেন। এই সকল খরচ খরচা প্রত্যহ পরিষ্কার ভাবে হিসাব রাখা চাই। যদি কেহ মাঝ-পথ থেকে যে কোন কারণবশতঃই হোক্ ফিরে যান, তাহ'লে কেহ পথের মাঝে এই সকল খরচ মেটাবার জন্যে দাবী করতে পারবেন না। ভ্রমণের নির্দ্ধারিত স্থানে পৌছে দলের সকলকে হিসাব বুঝিয়ে প্রত্যেকের নাম সহি করিয়ে নেওয়া এবং উক্ত খাতা ক্যাপ্টেনের নিকট পেশ করা। প্রত্যেকবার যাত্রা করবার আগে সকলে জলের বোতলে জল পূর্ণ করেছে কিনা—দেখা। পথে জলযোগের দরকার হ'বে কি না সে সম্বন্ধে ক্যাপ্টেনের সহিত পরামর্শ ক'রে যাত্রার পূর্ব্বেই তার বন্দোবস্ত করা, ইত্যাদি...।

৪। **মাষ্টার-মেকানিক্**ঃ—দলের মধ্যে যিনি সাইকেল সম্বন্ধে সব চেয়ে বিশেষজ্ঞঃ, তাঁকেই এই পদে নিযুক্ত করা হ'বে। সাইকেল সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্রপাতির ভার এঁর উপর। প্রত্যহ সকল গাড়ী পরীক্ষা করা এবং দরকার মত মেরামতের ব্যবস্থা করা। গাড়ী পরিষ্কার করবার জন্য সকলকে আগে থেকে জানিয়ে দেওয়া।

৫। **রিপোর্টার**ঃ—এঁর কাজ, দৈনিক ভ্রমণবৃত্তান্ত বিস্তারিত লিখে রাখা এবং ভ্রনণান্তে ক্যাপ্টেনের নিকট রিপোর্টের খাতা পেশ করা। ভ্রমণের বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠাবার আগে ক্যাপ্টেনের দ্বারা সহি করিয়ে নেওয়া।

৬। **ফটোগ্রাফার**ঃ—পথে ফটো তোলবার ভার এঁর উপর। ভ্রমণান্তে ফটোর সকল সামগ্রী ক্যাপ্টেনের নিকট অর্পণ করা।

৭। **কর্পোরাল**ঃ—যদি ভ্রমণের পথে বন্দুক থাকে, তাহ'লে এর

উপর বন্দুকের ভার অর্পণ করা হ'বে। যিনি দলের মধ্যে খুব ভাল শিকারী তাঁকেই এই পদে নিযুক্ত করা হবে।

৮। বিউগ্‌লার :—এঁরকাছে সারা পথের একটি 'ম্যাপ্‌' থাকবে —এবং আগে থেকে রাস্তা সম্বন্ধে যতদূর খোঁজ খবর নেওয়া সম্ভব, ক্যাপ্টেনের ন্যায় এঁকেও তা' নিতে হবে; কেন না—এঁকে পথ-প্রদর্শকরূপে সকলের আগে আগে যেতে হ'বে। পথে কোন বিপদ কিম্বা অন্য কোন কারণবশতঃ সকল[illegible]াবধান করা দরকার মনে করলে 'বিউগ্‌ল' বাজিয়ে সঙ্কেত করবেন। এ ছাড়া বিউগ্‌লারের যে যে সময় বিউগ্‌লে সঙ্কেত করা দরকার—এঁকেও তাই করতে হ'বে।

৯। স্কাউট্‌ :—[illegible]য়োজনানুযায়ী সকলকে সাহায্য করা। কোথাও কোন [illegible]র নেবার দরকার হ'লে,—ইনি সে কাজের ভার [illegible]বেন।

পথে প্রথমে বিউগ্‌লার, তারপর যথাক্রমে ভাইস্‌ ক্যাপ্টেন, স্কাউট্‌, মাষ্টার মেকানিক্‌, ফটোগ্রাফার, রিপোর্টার, কোয়ার্টার মাষ্টার, কর্পোরাল ও সকলের পিছনে ক্যাপ্টেন,—এ ভাবে একটি সারি দিয়ে যেতে হ'বে। গ্রাম বা সহরের বাইরে, যাঁর যেমন ভাবে ইচ্ছা যেতে পারেন; কিন্তু আন্দাজ পঞ্চাশ ফিটের বেশী কেউ ছাড়াছাড়ি হ'তে পারবেন না। ক্যাপ্টেনের ইঙ্গিতমাত্র বিউগ্‌লে 'সারি দিয়ে যাবার' সঙ্কেত বেজে উঠ্‌লেই—তখন পুনরায় সকলে নিজ নিজ স্থান দখল ক'রে সারি দিয়ে সাইকেল চালাতে থাকবেন। পথে বহু ব্যক্তি অনেক প্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রে থাকেন; সেই সময় ক্যাপ্টেন এবং কোয়ার্টার মাষ্টার ব্যতীত দরকার না হ'লে অন্য কেহ সে সকল প্রশ্নের উত্তর দিবেন না। প্রত্যেক 'হুইলার' প্রত্যেকের কাজে যথাযথ ভাবে সাহায্য করতে বাধ্য; এবং দলপতি অর্থাৎ ক্যাপ্টেনকে সকলে সকল সময়ে মেনে চলবেন।

আর একটি কথা—প্রত্যেক 'হুইলারে'র সাজ-সজ্জা যতদূর সম্ভব এক রকম করা উচিত,—কারণ দেখতে বড়ই সুন্দর হয় ও সকল কাজে তৎপরতা আসে।

দলের সরঞ্জাম

১। ঔষধাদি ঃ—টিংচার আয়োডিন ও বেন্‌জিন, বোরিক তুলা (অন্তত: এক পাউণ্ড), দুই ও তিন ইঞ্চি ব্যাণ্ডেজ (অন্তত: এক ডজন), ক্লোরোডাইন, স্মেলিং সল্ট্, এম্‌ব্রোকেশন্, জাম্বাক্, টাই-কোটিন্ ট্যাব্‌লেট্ (অন্তত: চার ফাইল), টয়েলেটিং পাউডার (আগে থেকে চুলকোনার দায় হ'তে বাঁচবার জন্য ব্যবহার করা উচিত) কুইনাইন ট্যাব্‌লেট, স্পিরিট্ এমন্ এরোমেট্, ডায়েরীয়া ট্যাব্‌লেট্, গ্লিসারীণ, নির্ব্বেদিন কিম্বা ক্যা[illegible]পিরীন, ক্লোরো-ড্যাক্ (সব সময়ে জল ফুটিয়ে পানকরবার সময় হয়ে ওঠে না, অতএব জলের অবস্থা বুঝে এটা ব্যবহার করা উচিত), লেক্সিন (সর্পদংশনের উত্তম পরিশোধক), কোল্ড ক্রীম, ডাই নাম গ্যালি-সিয়া, গুলর্ডলোসন (আট আউন্স শিশি); হোমিও-প্যাথিক ঃ—আর্নিকা, বেলেডোনা, পালসেটিলা, নক্সভমিকা, ব্রায়োনিয়া (এক ড্রামশিশি) এবং কিছু পাতিলেবু (কায়িক পরিশ্রমের জন্য শরীর উত্তপ্ত হওয়ায় নানা প্রকার পেটের ব্যায়রাম, এমন কি রক্ত আমাশয় পর্য্যন্ত দেখা দেয়। এ সবের হাত থেকে বাঁচবার জন্য মধ্যে মধ্যে 'লেবুর জল' পান করা উচিত। লেবু সংগ্রহের জন্য গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করা বিধেয়।)

দলের মধ্যে এই সকল ঔষধাদির উপযুক্ত ব্যবহার সকলেরই ন্যুনাধিক জানা উচিত। সকলের অভিজ্ঞতা না থাকলেও অন্তত: দলের মধ্যে দু-জনের ভ্রমণের পূর্ব্বে এ সমস্ত ঔষধের ব্যবহার এবং প্রাথমিক প্রতি

বিধান সম্বন্ধে শিক্ষা করা প্রয়োজন। বিজ্ঞ 'হুইলারে'র নিকট একটি Red-cross চিহ্ন-যুক্ত থলের (Haversack) মধ্যে এই সমস্ত ঔষধাদি সতর্কভাবে সাইকেলের 'রড্' এর সঙ্গে বাঁধা থাকবে। অবশ্য হোমিও-প্যাথিক ঔষধাদির ভার অপর ব্যক্তি উপর রাখতে হ'বে। যদি কেউ পথের মাঝে কোনরূপ রোগগ্রস্ত কিম্বা বিশেষ ভাবে আহত হন, তাহলে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্ত্তী ডাক্তার কিম্বা ডাক্তারখানার অনুসন্ধান ক'রে তাঁর চিকিৎসার বন্দোবস্ত এবং ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ স্থানে তিন-চার দিন অপেক্ষা করবেন। এর মধ্যে রোগী ভ্রমণোপযোগী না হ'লে, ভ্রমণকারীর দল তাঁর জন্য আর অপেক্ষা না ক'রে আবশ্যক মত কলকাতায় ক্লাবের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিকে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত 'টেলিগ্রাম' করলেই—কলকাতার রেলওয়ে ষ্টেসনে তিনি হাজির থাকবেন ও একজন কিম্বা দরকার হলে দু-জন 'হুইলার' রোগী সমেত ট্রেণে কলকাতায় পৌছে, প্রতিনিধির জিম্মায় রোগীকে দিয়ে পরবর্ত্তী গাড়ীতে ফিরে পুনরায় দলভুক্ত হ'বেন। রোগীর বাড়ীতে খবর দেওয়া এবং অন্যান্য সকল ব্যবস্থা প্রতিনিধির দ্বারাই হ'বে।

২। যন্ত্রপাতি ঃ—একটি ছোট হাতুড়ী, টায়ার লিভার চারটি, স্লাইড্ রেঞ্চ্, প্লায়ার্স, স্ক্রু-ড্রাইভার, বেয়ারীংস্প্যানার দুইটি, চারটি সলিউশনের টিউব, গজখানেক টিউবের টুক্‌রা, টায়ারের টুক্‌রা অন্ততঃ আট্‌টি (৭-৮ ইঞ্চি লম্বা), ফ্রির স্প্রীং এর জন্য খানিকটা ষ্টীলের তার, সমস্ত অংশের মুহুরী (Nut) প্রত্যেকটা চারটে ক'রে, ব্রেকের রবার আধ-ডজন, এক সেট সাইকেলের 'বল', এক ডজন স্পোক্, কটার পিন্ আধ-ডজন, ঘণ্টার (Bell) স্প্রীং, ষ্ট্যাণ্ডার্ড গাড়ীর জন্য একটি ফ্রী-হুইল (যে গাড়ীর অংশ সাধারণতঃ পাওয়া দুরূহ, সেইরূপ প্রত্যেক গাড়ীর এক একটি ফ্রী-হুইল এবং অন্যান্য উপরি উক্ত অংশ সকল নেওয়া উচিত), প্রত্যেক সাইকেলের জন্য এক একটি অয়েলক্যান

এক পাউণ্ড সাইকেলের তেল, এক কৌটা ভ্যাস্‌লিন, শিরিস কাগজ (Sand Paper), ফ্রেঞ্চ চক্ (Powder), আটটি গাড়ীর জন্য অন্ততঃ চারটি সিরীপ্প ও তার 'টিউব' উপরি দুইটি এবং সাইকেল পরিষ্কার করবার জন্য প্রত্যেকের নিকট ঝাড়ন অথবা ছেঁড়া কাপড়।

উপরি উক্ত সাইকেলের যন্ত্রপাতি 'মাষ্টার মেকানিকে'র জিম্মায় থাক্‌বে। সঙ্গে প্রাইমাসের ফোল্‌ডিং ছোট ষ্টোভ্ থাকা খুবই প্রয়োজন এবং তার আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি। মাঠের মাঝে বাতাসের হাত হ'তে নিষ্কৃতি লাভ করবার জন্য প্রাইমাস ষ্টোভের "এয়ার প্রোটেক্‌টর"। দলের মধ্যে সকলেরই "গ্যাস কিম্বা ইলেকট্রিক লাইট" থাকা উচিত নয়। দু-একটি ভাল তেলের আলোও থাকা দরকার। প্রত্যেকের নিকট 'টর্চ্চ লাইট' আমার মতে না থাকাই ভাল ; কারণ সকলের কাছে 'টর্চ' থাকলে টর্চের উপরি ব্যাটারীও তাহলে প্রত্যেককে রাখ্‌তে হয় ; তখন ঐ সকল উপরি ব্যাটারীগুলির জন্য দলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল ভাগ ক'রে রাখার সময় থলিতে স্থানের অকুলান এবং টর্চের অপব্যবহার হয়। দলের মধ্যে তিনটি ভাল 'টর্চলাইট' থাকলেই যথেষ্ট,—বন-জঙ্গলের পথ রাত্রে অতিক্রম করবার সময় দলটি দুই পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত করা উচিত এবং প্রথমে বিউগ্‌লারের পাশে যে থাকবে তার কাছে, মাঝে একজনার কাছে আর পিছনে কাপ্তেনের কাছে 'টর্চ' থাকা কর্ত্তব্য। এই সময় চতুর্দ্দিকেই অর্থাৎ সামনে, ডান পাশে, বাম পাশে এবং পিছন দিকে একটির পর একটি টর্চের আলো অনেক সময় বন্যজন্তুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য নিক্ষেপ করা উচিত। কার্ব্বাইটের আলোর জন্য উপরি 'বার্ণার', 'পোকার' এবং ভিতরের 'ওয়াসার' প্রায়ই খারাপ হয়ে থাকে—সেজন্য আধ-ফুট মোটর টিউবের টুক্‌রা সঙ্গে রাখতে হয়। আধ পাউণ্ড "ব্রুক-বণ্ড টি-এর কৌটার মত একটি পাত্রের মধ্যে

কার্ব্বাইট সংগ্রহ পূর্ব্বক সাইকেলের ক্যরিয়ারের উপর রেখে, সিটে'র নীচের দুইটি রডের সঙ্গে ভালরূপে বেঁধে রাখা কর্ত্তব্য—থলের ভিতর কিম্বা অন্য কোন দ্রব্যের সঙ্গে রাখা উচিত নয়। কার্ব্বাইটে সাইকেলের তেল মাখিয়ে রাখলে অনেক দিন স্থায়ী হয়। আর একটি কথা বলতে ভুল হয়েছে,—সকলের নূতন টায়ার ও টিউব থাকলে উপরি নেবার কোন দরকার হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে যেখানেই ভ্রমণ করি না কেন, পথে মধ্যে মধ্যে বড় বড় গ্রাম বা সহরে সাইকেলের দোকান পাওয়া যায়। ভ্রমণকালে নূতন 'টিউবে' পুরোপুরি হাওয়া (Hard Pump) থাকলে টায়ার ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। যদি বা হয়, টায়ারের টুক্‌রার দ্বারা অনায়াসে কাজ চলে। শিকল যুক্ত তালা প্রত্যেকের সঙ্গে রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

৩। দ্রব্যাদি :—পুরাতন গাড়ীর অবস্থা ভাল থাকলে এরূপ ভ্রমণ করা যেতে পারে। অবস্থা ভাল হ'লে যে কোন মার্কার (Maker) সাইকেলে ভারত ভ্রমণ সাঙ্গ করা যায়। Racing কিম্বা Fixed wheel গাড়ীতে এরূপ ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য নয়; কারণ পর্ব্বোতারহণ বা অবতরণ কালে ভীষণ বেগ পেতে হয়। গাড়ীর Mud Guard খোলবার প্রয়োজন নাই। যেমন গাড়ী আছে, তেমনি থাকবে। কেবল মাত্র বসবার স্থানটি 'Brooks Release' এর মত হওয়া উচিত। প্রত্যেক গাড়ীর 'রড্' এ বাঁধা থলের (Waterproof Haversack) ভিতর প্রত্যেকের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল রাখা উচিত; যেমন :—পায় জামা কিম্বা লুঙ্গি, ক্ষৌর কার্য্যের দ্রব্য সকল, দাঁতের মাজন ও 'ব্রাস্', জুতো পরিষ্কার করবার ক্রীম ও ছোট ব্রাস্, আয়না, চিরুণী, গামছা, দস্তানা, একটি গেঞ্জি এবং সার্ট কিম্বা পাঞ্জাবী। এরূপ থলের মধ্যে মাষ্টার মেকানিকের সাইকেলের যন্ত্রপাতি ও অপর একজন ব্যক্তির নিকট ঔষধাদি থাকায়, দু-জন 'হুইলার্স'কে এঁদের উপরি উক্ত দ্রব্য সামগ্রীর ভার বহন করতে হ'বে। ভিন্ন দুইটি থলের ভিতর—একটিতে প্রাইমাস ষ্টোভ, সাইকেলের

তেলের-টিন এবং ভ্যাস্‌লিন; আর অপরটিতে ক্ষুদ্র এলোমুনিয়ামের ডেক্‌চি, চা, চিনি, কন্‌ডেন্স-মিল্ক (ছোট ছোট টিন পাওয়া যায়, তাই নেওয়া উচিত; কারণ ছোট টিন প্রতিবারে খরচের পরই—টিন শূন্য। কিন্তু বড় টিন একবার খোলার পর বাকি দুধ খারাপ হয়ে যায়), মাখন ('পলসন্‌' এর ছোট টিন পাওয়া যায়), চামচ্‌ (প্রত্যেকের জন্য একটি ক'রে), ছাঁক্‌নী, কিছু গোলমরীচের গুড়া, লবণ এবং 'কারী পাউডার'—এই দুইটি থলে প্রত্যেক 'হুইলার' পালা করে পিঠে বহন করবেন। দলের সামগ্রী অর্থাৎ—উপরি 'টর্চের-ব্যাটারী' সকল, উপরি 'কনডেন্স-মিল্কে'র ও 'পলসন্স্‌-বাটারে'র টিন সকল, কূয়া থেকে জল তোলবার জন্য 'ক্যান্‌ভাসে'র বালতি একটি, মজবুত লম্বাদড়ি, কয়েক বাণ্ডিল "সুতলি', মোমবাতি আধ-ডজন, এক ডজন তিন ইঞ্চি পেরেক (রাত্রে কিম্বা বৃষ্টির দিনে ঘরের ভিতর পোষাকাদি শুখাবার জন্য গৃহের মালিকের অনুমতি নিয়ে দেওয়ালে পেরেক পুতে দড়ি বাঁধা হ'বে।), সূচ-সূত', কাপড় কাচা এবং গায় মাথা সাবান......ইত্যাদি; এ সকল দ্রব্য প্রত্যেক 'হুইলার'কে সমান ভাগে বিভাগ ক'রে দেওয়া হ'বে। প্রত্যেক 'হুইলারে'র নিকট কি কি দ্রব্য রাখা হয়েছে, ক্যাপ্টেনের নিকট তার একটি তালিকা থাকা প্রয়োজন।

এ ছাড়া—ফটোগ্রাফারের কাছে ক্যামেরা ও তার সরঞ্জাম; কর্পোরালের কাছে বন্দুক, টোটা ও বন্দুক পরিষ্কার করবার দ্রব্য সকল; রিপোর্টারের নিকট রিপোর্ট-বুক, খাম, পোষ্টকার্ড, ক্লাবের নামের কার্ড, এবং অটোগ্রাফের খাতা; বিউগ্‌লারের নিকট বিউগ্‌ল ও পথের ম্যাপ; ইত্যাদি। সাইকেলের ক্যারিয়ারে—একটি কম্বল. একটি গরম কোট ও প্যান্ট, একটি আলোয়ান, একটি ধুতি, ব্যালাক্ল্যাভা ক্যাপ্‌ একটি, গেঞ্জি একটি এবং সোয়েটার একটি; স্থানের আবহাওয়া বুঝে পোষাকাদির বহর বাড়াতে বা কমাতে হ'বে। 'সুটকেস্‌' অপেক্ষা এই সকল জিনিষ

একটি ক'রে এক গজ 'ওয়াটার প্রুভ ক্যান্‌ভাস' কাপড়ে বাণ্ডিল বেঁধে রাখা ভাল। প্রথমে কম্বল ও আলোয়ান ব্যতীত অন্য সকল পোষাকাদি এবং প্রত্যেকের ভাগে যে সকল দ্রব্যাদি পড়ে, সে গুলি একটি বড় ঝাড়নে পরিষ্কার ভাবে বাঁধলে বালিশের ন্যায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এই কৃত্রিম বালিশটিতে আলোয়ান ও কম্বলটা জড়িয়ে, ক্যান্‌ভাস কাপড়টি দিয়ে একটি বাণ্ডিল তৈরী ক'রে সাইকেলের ক্যারিয়ারে প্রত্যেকটা এক রকম ভাবে বাঁধা থাকলে বেশ সুন্দর দেখায়। চামড়ার 'ষ্ট্র্যাপ্' পথে যেতে যেতে ছিঁড়ে যায়, অতএব মশারীর ছাদে যে ফিতা (Nair) দেওয়া হয়, ঐ ফিতা কোন প্রকার রং ক'রে বাণ্ডিল বাঁধ্‌লে বড় একটা ছেঁড়্‌বার ভয় নাই। ক্যান্‌ভাস কাপড় গুলা অনেক সময় মাটিতে শুতে হলে কাজে লাগবে। তা' ছাড়া রাত্রে যদি মাঠের মধ্যে কাটাতে হয়, তাহ'লে এগুলি তাঁবুতে পরিণত করাও যেতে পারে। পথে বৃষ্টির দায় হ'তে নিষ্কৃতি পাবার জন্য 'ওয়াটার প্রুভ কোট' নেওয়া উচিত—এই কোটটি ভাঁজ ক'রে সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে বাঁধা থাক্‌বে। পথে প্রচণ্ড ধূলা ও রৌদ্রের জন্য 'গগ্‌লস্' চশমা প্রয়োজন। উপরি উক্ত সকল দ্রব্য-সামগ্রী দলের ব্যক্তি অনুযায়ী কম বেশী নিতে হবে।

স্বাস্থ্যরক্ষা

অনেকে মনে করেন যে হুস্ হুস্ ক'রে সাইকেল চালিয়ে অল্পদিনের মধ্যেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছান—একটা বাহাদুরী। যখন কোন দূর-দেশে পাড়ি দিতে হ'বে তখন এরূপ বাহাদুরী না করাই উচিত। আজ আমি ৮০মাইল দৌড় দিলুম—কাল কিন্তু তা কখনই হয়ে উঠবে না, বরং এতে শরীরের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হয়ে পড়ে। আর যে স্থানে সেদিনের জন্য ভ্রমণ স্থগিত করা হবে—এতদূর সাইকেল চালানোর দরুণ শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ায়, স্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ পরিচয়

কিম্বা বেড়িয়ে চারিদিক দেখা—এ সবের মাধুর্য্য ভোগ করা অসম্ভব; তখন মনে হয় নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে আশ্রয় পেলেই বাঁচি। প্রতিদিন অতিরিক্ত ভাবে ভ্রমণ করার ফলে আজ না হ'ক কিছুকাল পরে অসম্ভব রূপ কায়িক পরিশ্রমের জন্য অনেক প্রকার রোগ জন্মাতে পারে। শরীরের দিকে যতদূর সম্ভব দৃষ্টি রাখা প্রধান কর্ত্তব্য। যদি কোন প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে সাইকেলের দৌড়দিতে হয়—তখন অবশ্য একথা খাটে না; কিন্তু প্রতিযোগিতার জন্য এরূপ লম্বা পাড়ি কখনই সম্ভব পর নয়। আহারান্তে অন্ততঃ অর্দ্ধঘণ্টা কাল বিশ্রামের পর যাত্রা করা উচিত। দুধ, কাঁচা কিম্বা অর্দ্ধ-সিদ্ধ ডিম, মাংস—(অবশ্য পরিমাণে অল্প), পাতিলেবুর জল, অল্প পরিমাণে ভিজা ছোলা, ফলাদি—এই কয়েকটি ভ্রমণ পথের প্রধান আহার্য্য। সাইকেল চালাবার পূর্ব্বে কিছু আহার করা বিশেষ দরকার; একেবারে শূন্য পেটে বেশী পথ সাইকেল করা কোন মতে উচিত নয়। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত যখন তখন ঔষধাদি ব্যবহার না করা বিধেয়। আট্ ঘণ্টা কাল সাইকেল চালান, রাত্রে আট্ ঘণ্টা নিদ্রা এবং বাকি আট্ ঘণ্টা আহারাদির সংস্থান বা পর্য্যাবেক্ষণ করা,—দৈনিক কার্য্যের তালিকা এরূপভাবে যতটা সম্ভব স্থির করা উচিত। প্রচণ্ড রৌদ্রে ভ্রমণ না করাই ভাল। প্রত্যহ স্নান করবার পূর্ব্বে শরীরে ভালরূপ সরিষার তৈল মর্দ্দন করা চাই। প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গে অন্ততঃ দশ মিনিট কাল শ্বাস প্রশ্বাসের (Breathing control) ব্যায়াম করা প্রয়োজন। দুইদিন অন্তর পরণের পোষাকাদি ভালরূপে সাবান দেওয়া ও প্রত্যহ রাত্রে পরণের গেঞ্জিটি জল-কাচা করা উচিত। সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত কর্‌তে ম্যালেরিয়া যুক্ত স্থানে অনেক সময় 'কুইনাইন' গলাধঃকরণ করতে হয়। পানীয় জলের দিকে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা—দরকার মত ফুটিয়ে কিম্বা 'ক্লোরোড্যাক্' দিয়ে পান করা উচিত। অনেক সময় পাহাড়ী ঝরণার জল এতদূর খারাপ হয়, যে ঐ জলে তৃষ্ণা

নিবারণ কিম্বা স্নান করলে অল্পক্ষণ পরেই প্রচণ্ড ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হ'তে হ'বে। এরূপ ঝরণা ছোটনাগপুর অঞ্চলে বেশীর ভাগ দেখা যায়। এজন্য প্রত্যেকের নিকট জলের বোতলে ভাল জল পরিপূর্ণ থাক্‌লে, যেখানে সেখানে জলপান করবার দরকার হয় না। বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত রাত্রে ভ্রমণ করা উচিত নয়।

কর্ত্তব্য

ভ্রমণে বেরুবার পূর্ব্বে পথের একটি 'ম্যাপ' তৈয়ারী ক'রে, কখন কোথায় আস্তানা গাড়্‌তে হবে—তার একটা খসড়া ক'রে ফেলা উচিত। যতদূর সম্ভব এই তালিকা অনুযায়ী পথ চলা এবং সকল বিষয় অনুসন্ধান পূর্ব্বক 'রিপোর্ট'বুকে লিখে রাখলে অনেক বিষয় অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। মিলিটারী সাজে সজ্জিত হ'য়ে পথে অনেকে গরীব-দুঃখী—নৌ-বাহক, ফেরীওয়ালা, দোকানদার প্রভৃতির উপর উগ্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রে বিনা পয়সায় কাজ হাঁসিল করেন; ফলে অন্যান্য ভ্রমণকারীর দল এদের কাছে কোনরূপ সাহায্য পান না;—এরূপ কিঞ্চিৎ লাভের প্রত্যাশায় নিজদেশবাসীর বদনাম করা মোটেই উচিত নয়। নানাদেশের লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও পথে দেখবার মত স্থান সমূহ দর্শন—এসব চাই। পথে কতগুলা আস্তানা গাড়্‌তে হ'বে সেই অনুযায়ী পাথেয় খরচের একটা মোট মাট হিসাব ক'রে, কত টাকা খরচ হ'তে পারে—তা' জানা যাবে। কিন্তু অল্পটাকা সঙ্গে থাকা ভাল; প্রত্যেকের বাকি টাকাগুলি ক্লাবের প্রতিনিধির জিম্মায় থাকবে। যখনই টাকা ফুরিয়ে আসবে, তখনই প্রতিনিধির নিকট 'টেলি-গ্রাম' করলে 'টেলি-গ্রাফিক' মনিঅর্ডার যোগে তিনি টাকা পাঠিয়ে দিবেন।

উপরি উক্ত নিয়ম পদ্ধতি বজায় রেখে সকলে যদি এরূপ ভ্রমণ কিম্বা

যে কোন বড় কাজে অগ্রসর হন, তা'হলে তাহা অতি সহজে ও সুশৃঙ্খল ভাবে সম্পাদিত হবেই হবে।

"পরেশনাথ অভিমুখে"

রতিবাটীর পর থেকে পূর্ব্ব কথিত নিয়মপদ্ধতি অনুযায়ী আমাদের দলটি উত্তম রূপে গড়ে উঠলো। অবশ্য কতকগুলি জিনিষের অভাবে, উপরি-উক্ত সকল জিনিবই মাঝ পথ থেকে নেওয়া সম্ভবপর হ'ল না; কিন্তু এই বারাণসী ভ্রমণ ব্যতীত, নিয়মপদ্ধতির সকল বিষয় বজায় রেখে নির্ব্বিঘ্নে অপর ভ্রমণগুলি সাঙ্গ করা হয়েছে। প্রতি 'হুইলার'কে নিম্ন-লিখিত পদসমূহে নির্ব্বাচিত করা হ'ল :—দেবেন্দ্র মুস্তোফি (ক্যাপ্টেন), মণীন্দ্র মুস্তোফি (ভাইস-ক্যাপ্টেন), জহর লাল দত্ত (কোয়ার্টার মাষ্টার), রাধারমণ দত্ত (মাষ্টার মেকানিক্), মণিলাল গুঁই (ফটোগ্রাফার), ব্যোমকেশদাস (রিপোর্টার), বলাই বসু (স্কাউট্), কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী (বিউগ্‌লার)। পদ নিয়োগ ত করা হ'ল; কিন্তু বিউগ্‌লারকে নিয়ে মহা বিপদ, কেন না—চক্রবর্ত্তী বিউগ্‌লার পদে নিযুক্ত হয়ে বড়ই দুঃখের সহিত বলে উঠলো, "আমাকে ত তোমরা বিউগ্‌লার করলে, বিনা বিউগ্‌লে আমি কি তা'হলে হাতটা মুখের কাছে ঠেকিয়ে পোঁ পোঁ করবো?" সত্যই তো—এ এক মহা ফাঁপরে পড়া গেল! চট্ ক'রে বিউগ্‌লার নিয়োগ ক'রে ফেলা হ'ল—এদিকে যে আসল দ্রব্যই নাই, সে কথা ত কেউ আমরা ভাবিনি। অগত্যা কি করা যায়, পদের মর্য্যাদা রক্ষা করতে আমার সাইকেলে লাগানো Horn টি খুলে Ball শূন্য করলুম এবং একটি চমৎকার 'নেকটাই' এর দ্বারা Horn টি শোভিত

হয়ে, চক্রবর্ত্তীর গলায় বিরাজিত হ'তেই, সে তখন মহা আনন্দে "একটা কিছু পেয়েছি গো" বলেই তাতে ফুৎকারিত করতে লাগলো; Horn টি ক্রমাগতঃ একই সুরে বাজ্‌তে লাগলো—পোঁ-পোঁ-পোঁ-পোঁঃ।

সভা ভঙ্গে আমরা রত্তিবাটী পরিত্যাগ করলুম। জুতো মোজা খুলে সাইকেল কাঁধে ক্ষুদ্র নদীটি অনায়াসে পার হয়ে গেলুম; কিন্তু আমাদের মাষ্টার মেকানিকের বোধ হয় হর ভীমরতি চাপলো। সে বললে, "এই দেখ, আমি সাইকেল চেপে নদী পার হচ্ছি! এই কথা বলবামাত্র যেমনি সে জলের ভিতর সাইকেল চেপে হাজির হয়েছে, অমনি গাড়ীর চাকা বালিতে বসে গিয়ে তার একটা পা জুতো-মোজা সমেত ঝপাং ক'রে জলের মধ্যে ঢুকে গেল। আমরা তখন আহ্লাদে আট-খানা হয়ে বলে উঠলুম—"কেমন জব্দ—কেমন জব্দ; যেমনি কর্ম্ম তেমনি ফল।" কিন্তু তবু সে একটা পায় লেংচাতে লেংচাতে নদীর পরপারে এসে উপস্থিত। বালি মাথা এক পাটী জুতো মোজা জলে ধুয়ে নিয়ে, সে ভিজে অবস্থায়েই পায়ের ভিতর গলিয়ে নিলে। অতঃপর মেঠো রাস্তা অতিক্রম পূর্ব্বক গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোডে উপস্থিত হয়ে হু হু-শব্দে আসানসোলে পুনরায় এসে হাজির। বাজারে কয়েকটি দ্রব্যাদি ক্রয় ক'রে সন্ধ্যা সাড়ে ছ-টা নাগাদ 'কুল্টি'তে (১৪৬ মাইল) পৌছলুম। তখন সবে চারিদিক অন্ধকার হয়েছে। কুল্টির লোহার কারখানা (Bengal Iron Co LTD.) নানারকম শব্দে মুখর। সহরটি নেহাৎ মন্দনয়; কিন্তু রাস্তায় আলোর বিশেষ অভাব। লোহার কারখানা দেখবার অভিপ্রায়ে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত কারখানার প্রধান ডাক্তার রায় অতুলচন্দ্ররায় বাহাদুর মহাশয়ের বাড়ীতে অতিথি হলুম।

২২শে অক্টোবর:—প্রত্যুষে কারখানা দেখতে বেরুলুম। কারখানাটি বৃহৎ—তবে অবশ্য সিংভূম জিলার 'টাটা'র কারখানার মত নয়। তারপর এখানকার সহর বাজার ইত্যাদি দেখা সাঙ্গ ক'রে, ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে

ফিরে এলুম। আমার একটু-আধটু 'ম্যাজিক' দেখান এবং নানারূপ জন্তু জানোয়ারের ডাক অর্থাৎ 'হরবোলা'র ডাক, ডাকার খেয়াল থাকায়, কলকাতার বাইরে যেখানে যাই সঙ্গে অন্ততঃ সামান্য ম্যাজিকের দ্রব্যাদি নিতে ভুলি না। কারণ—এই ম্যাজিক-ই আমাকে ও আমার একজন বন্ধু অজিতকুমার বসুকে একবার বড়ই রক্ষা করেছিল। হঠাৎ একদিন খেয়াল চাপায় আমরা দুই বন্ধুতে মিলে হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেণে চেপে বসলুম; উদ্দেশ্য—আসানসোলের নিকট 'বার্ণপুর'এ "ইণ্ডিয়া-আইরন্-এণ্ড-ষ্টীল কোং লিঃ' এর লোহার কারখানা দেখতে যাওয়া। বার্ণপুরে কারখানা দেখা সাঙ্গ হ'লে, আমরা রেলওয়ে ষ্টেশনে এসে টিকিট্ কিন্‌তে গিয়ে দেখি—পথে আসতে আসতে কখন আমার টাকার থলেটি পকেট থেকে পড়ে গেছে। ঐ থলের মধ্যে যা' কিছু টাকা কড়ি ছিল। এরূপ রিক্ত হস্তে আমরা মহাবিপদে পড়লুম। কি করি—অগত্যা চরণ-যুগল হাঁকিয়ে দিয়ে কোন প্রকারে সন্ধ্যার প্রারম্ভে আসানসোলে উপস্থিত হলুম। আসানসোলে পৌঁছে কি উপায়ে কলকাতায় ফির্‌বো—এ বিষয় নানারূপ চিন্তা করছি, এমন সময়—আজিতের কথামত বাধ্য হ'য়ে ষ্টেশনের 'ওয়েটিংরুমে' প্যাসেনজারদের নিকট ম্যাজিক দেখিয়ে কিছু টাকা রোজগারের মতলব করা গেল। মতলবটি কাজে পরিণত করবার জন্যে যা' কিছু অল্প ম্যাজিকের সামগ্রী সঙ্গে ছিল, সেই সমেত ওয়েটিংরুমে প্রবেশ করলুম। ওয়েটিং রুমের ভিতর কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্র-মহিলা ও মহোদয়, জনকয়েক পশ্চিম দেশীয় এবং বাঙ্গালী চারজন অপেক্ষা করছিলেন। আমরা ঘরে প্রবেশ করতেই একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি আজ রাত্রিটা এখানে কাটিয়ে, কাল অতি প্রত্যুষে ছোটনাগপুর অঞ্চলে যাত্রা করবেন। ভদ্রলোকটি কোন 'চা-কোম্পানী'র দালাল। যা' হোক আমরা যেন ম্যাজিক দেখিয়েই রোজগার করি—এই ভাবে ছোট একটি ইংরেজীতে বক্তিমা দিয়ে ম্যাজিক আরম্ভ

করতেই, ঘর শুদ্ধ লোক মহা আনন্দের সহিত নিকটস্থ হ'য়ে আমার খেলা দেখে বেশ আমোদ পেতে লাগলো। আধ-ঘণ্টার পর খেলা সাঙ্গ হ'লে রাস্তার যাদুকরের ন্যায় অজিত তার টুপীটি ধরে পয়সা সংগ্রহ করতে লাগলো। বড়ই দুঃখের বিষয় চার-জন বাঙ্গালী ব্যতীত সকলেই চার-আনা দু-আনা ক'রে অতি আনন্দের সহিত দিতে লাগলেন। কিন্তু তিন জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক ত সে ঘর থেকে ম্যাজিক দেখার পর কখন যে সরে পড়েছেন, আমরা তা দেখতেই পাইনি। অজিত যখন সেই দালাল ভদ্র-লোকের অনুসন্ধানে ফিরছিল, তখন হঠাৎ আমি দেখি যে—ত্রস্ত গতিতে তিনি টেবিলের উপর বিছানা পেতে একটি চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত ক'রে নাসিকা গর্জ্জনে উন্মত্ত হ'লেন। অতঃপর কলকাতার দিক্ হ'তে হুস্ হুস্ ক'রে একটি ট্রেণ এসে পড়ায়, প্রায় সকল প্যাসেনজার ওয়েটিংরুম ফাঁকা ক'রে চলে গেলেন। অজিত তখন মহা স্ফুর্ত্তিতে আমাকে বলে উঠলো, "ওহে আমাদের কলকাতা যাবার ভাড়া ছাড়া বর্দ্ধমানের মিহিদানা খাবারও সংস্থান হয়ে গেছে!" এরূপ বিপদে ম্যাজিক আমার সহায় হয়েছিল বলে, তারপরথেকে ম্যাজিকের কিছু কিছু জিনিষ ছাড়া বিদেশে কোথাও যাই না। কুল্টিতে সকলে আমার ম্যাজিকের খবর জানতে পেরে ধরে বসলেন—"আমাদের ম্যাজিক না দেখিয়ে আজ আপনারা কোথাও যেতে পাবেন না।" অগত্যা রাত্রে মহাসমারোহে ম্যাজিকের খেলা সাঙ্গ করা গেল।

২৩শে অক্টোবর:—সকাল সাতটার সময় ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় গ্রহণ ক'রে, কুল্টি থেকে 'তোঁপচাঁচি'র দিকে রওনা হলুম। তিন মাইল অতিক্রম করার পর 'বরাকর' নামক স্থানে উপস্থিত হ'তেই দেখতে পেলুম বাঁ-দিকে পুরুলিয়া যাবার একটি রাস্তা চলে গেছে। বরাকর নদীর সেতু পার হয়ে বিহার প্রদেশ আরম্ভ হ'ল। 'রাজগঞ্জ' (১৫৯ মাইল) নামক স্থানে পোষ্ট-আফিস্ দেখতে পেয়ে কলকাতায় পত্র দেবার জন্য

থামা হ'ল। স্থানীয় পোষ্ট-মাষ্টার শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ের সহিত আলাপ পরিচয় হ'তেই, তিনি ধরে বসলেন—দুপুরে তাঁ'র এখানে আহারাদির পর তবে তিনি আমাদের ছাড়বেন। আমরাও তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে বিনা আপত্তিতে আহারাদির পর বেলা সাড়ে-তিনটার সময় যাত্রা করলুম।

বেলা পড়ে আসছে। রাস্তা ভয়ানক উঁচু-নীচু। সন্ধ্যাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য, যেন—দু-দিকের ছোট বড় পাহাড়গুলি সার বেঁধে অপেক্ষা করছে। মাঝে মাঝে ছোট ছোট জঙ্গল। অল্পদূরে পরেশনাথ পর্ব্বত শিখরের উপর রক্তাক্ত কলেবরে দিনান্তের ক্লান্ত রবি ম্লান আভা বিতরণ করছেন। মাথার উপর দিয়ে এক ঝাঁক্ টিয়া কলরব করতে করতে কুলায় অনুসন্ধানে ফিরে চললো। পরেশনাথ পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী 'তোপচাঁচি' (১৯০ মাইল) নামক গ্রামে তখন আমরাও এসে উপস্থিত হলুম। পাহাড়ের কোলে ক্ষুদ্র গ্রামটিতে একজন বাঙ্গালী দেখতে পেয়ে বড়ই আনন্দ হ'ল। এঁর নাম শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিশ্বাস। ইনি চাকুরীর খাতিরে পরিবারবর্গ নিয়ে এখানে অনেকদিন থেকে বসবাস করছেন। এঁর অনুগ্রহে স্কুলবাড়ীর ক্ষুদ্র চালায় আমাদের আশ্রয় জুটলো। শীতের তাড়নায় কোনরকমে কুয়া থেকে জল তুলে হোমিওপ্যাথিক ডোজে মুখ-হাত-পা ধোয়া গেল। কোয়ার্টার মাষ্টার নিকটে একটি পুরির দোকানে আহারাদির বন্দোবস্ত করলে। আর একটু মোষের দুধ পাওয়ায়—সকলে মহা আনন্দে হোমিও-ডোজেই গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হলুম।

নানারূপ খোস-গল্পের পর মাটির উপর বিছানো কম্বলে গা-ঢেলে দিয়ে স্বর্গসুখ অনুভব করলুম। কিছুক্ষণের পর কম্বলের উপর শুয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়েও শীত ভাঙ্গে না। কি করা যায়—তখন যে যার মাথার বালিস্ 'সোয়েটার' গুলকে টেনে নিয়ে গায় দিলুম এবং পায়ের জুতোকে

মাথার বালিসে পরিণত ক'রে আরামে শোয়া গেল। রাত্রি একটা দেড়টার সময় প্রচণ্ড শীত করতে লাগলো। শীতের জ্বালায় সকলেরই নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে; কিন্তু প্রত্যেকেই চোখ বুজে পড়ে পড়ে ভাবছে—"যত শীত কি আমার স্কন্ধেই চাপলো—আর সব ত বেশ ঘুমোচ্ছে?" সহসা—সকলেই যেন আনমনে ধীরে ধীরে এর ওর কম্বল ধরে টানাটানি আরম্ভ করায়, সকলে বুঝতে পারলে কেউই ঘুমিয়ে নেই। অগত্যা ভীমের কীচক বধের ন্যায় কুণ্ডলী পাকিয়ে—রাতটা এক রকম জেগে জেগেই কেটে গেল।

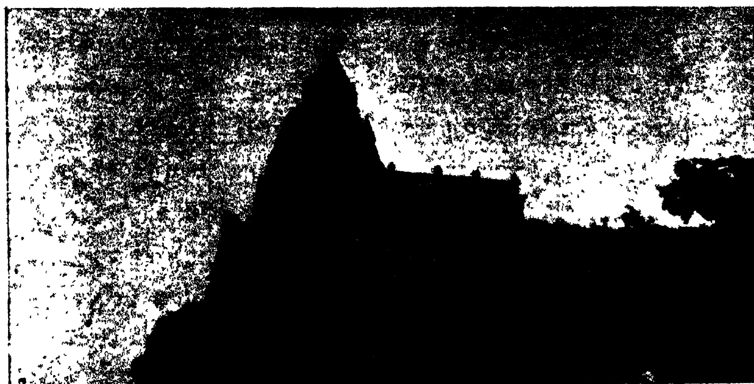
২৪ শে অক্টোবর:—তোপচাঁচি থেকে বেরিয়ে বেলা ন-টার সময় 'নিমিয়াঘাট' (১৯৮ মাইল) পৌছে সাইকেল গুলো ইনেস্‌পেক্সন্ বাংলোয় তালাচাবি দিয়ে রাখা হ'ল; কারণ পরেশনাথ পর্ব্বত শিখরে মন্দির মধ্যে ঠাকুর দর্শনের অভিপ্রায়। এ অঞ্চলের পাহাড় গুলির মধ্যে 'পরেশনাথ' পাহাড় উচ্চতম। সমুদ্র বক্ষ হ'তে প্রায় ৪৪৭০ ফিট্ উচ্চ। পর্ব্বতশিখরে পরেশ-নাথ দেবের মন্দিরে আরোহণ করবার দু-টি পথ আছে। একটি গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের উপর ১৯৮ মাইলে অবস্থিত নিমিয়াঘাট ও অপরটি 'ইস্‌রি' থেকে ১৩ মাইল দুরবর্ত্তী 'মধুবন'। এই পর্ব্বতের তলদেশ হ'তে প্রায় উপর পর্য্যন্ত ভীষণ বন্য জন্তু ভরা জঙ্গল; কিন্তু স্থান মাহাত্ম্য এরূপ —আজ অবধি কোন ব্যক্তি যে হিংস্র জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এমন কথা শোনা যায়নি। আমরা একজন স্থানীয় ব্যক্তিকে পথ-প্রদর্শকরূপে সঙ্গে নিলুম। কিছু আহারাদি জোগাড়ের কথা তাকে জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলুম, এখান থেকে দু-মাইল দূরে নিমিয়া ঘাট রেলওয়ে ষ্টেসনের কাছে একটি মাত্র ক্ষুদ্র পুরীর দোকান ব্যতীত নিকটে কোন দোকানাদি নাই; তবে চাল, ডাল এবং ডিম যদি আমাদের দরকার হয় ত সে কিনে আনতে পারে। কিন্তু আমাদের পক্ষে এখন সকল জিনিষ যোগাড় ক'রে রেঁধে পেট-পূজা করতে হ'লে অনেক দেরী হয়ে যাবে।

দু-মাইল পথ অতিক্রম ক'রে দোকান থেকেই দক্ষিণ-হস্তের কার্য্য সাঙ্গ করলুম। পুনশ্চঃ ঐ দু-মাইল পথ হেঁটে আসতে হ'ল নিমিয়া ঘাটে। চার-মাইল ত হাঁটা হয়ে গেছে—এখন আবার পাহাড়ে উঠতে ছ-মাইল ও নামতে ছ-মাইল, মোট ১৬ মাইল আজ আমাদের হাঁটতে হবে—তার মধ্যে ছ-মাইল পথ একেবারে খাড়াই! দোকান থেকে নিমিয়াঘাটে ফিরে এসে ঘড়িতে দেখি সাড়ে এগারটা। আমাদের পথ-প্রদর্শক বললে, "বাবুয়ো এ সময় কেউ পাহাড়ে উঠে না, এখোন সব নাম্‌তে সুরু করবেক্। আপনি সব দেরী করে ফেল্‌লে; এন্নে বড়ো বড়ো বাঘো—ভালু আছেইন। এখইন্ উঠ্‌বেক্—নাম্‌তে রাত হোবে।" এই কথা বলবামাত্র আমাদের স্কাউট্ ইলেক্‌ট্রিক্ টর্চের আলো চট্ ক'রে তার মুখে নিক্ষেপ ক'রে বললে,—"আরে মিতে চল্ চল্, জানোয়ার আসে ত এই ত্থাখ্। এর আলোতে সে বেটা চোখ ঝল্‌সে বাড়ী গিয়ে চিৎপটাং হয়ে থাকবে।" যা'হোক্, যদিও পথ-প্রদর্শকের কথায় সকলের মনে ভয় হচ্ছিল, কিন্তু সকলেই সকলকে বল্‌তে লাগলুম,—"হ্যাঁ, অত ভয় করতে গেলে আর adventure করা হয় না! যখন একবার পদার্পণ করা গেছে, তখন বাবা পরেশনাথকে না দেখে ছাড়ছি না।" এই বলে আমাদের সম্বল—একটা দার্জ্জিলিং এর ভোজালি, পাঁউরুটি কাটা ও কতকগুলি পেন্‌সিল কাটা ছুরি, ও একটা বড় গোছের মজবুত মাংস-খোড়া ছুরির সাহায্যে কয়েকটি গাছের ডাল কেটে যষ্টীতে পরিণত ক'রে পর্ব্বতারোহণ করতে সুরু করা গেল।

প্রায় চার পাঁচ হাত চওড়া পথটি ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে উপর দিকে উঠেছে। মাঝে মাঝে ভীষণ চড়াই। কোথাও সূর্য্যদেব কিরণ বিস্তারে উন্মত্ত—আবার কোথাও বা বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদি তাঁর আভা প্রসারণের পথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই ভীষণ পাহাড়ী জঙ্গলে আমাদের চিরপরিচিত 'কদলী-বৃক্ষ'ও বিরাজমান।

ঘোড়া দেখলেই খোঁড়া হওয়ার মত প্রায় সাড়ে তিন মাইলে একটি ঝরণা দেখতে পেয়ে 'বড় ক্লান্ত' বলে ধপ্ ক'রে সব ঝরণার ধারে বসে পড়লুম। অথচ যতক্ষণ না ঝরণা পেয়েছিলুম, ততক্ষণ বেশ যাচ্ছিলুম। ঝরণার জল অতি স্বচ্ছ ও বেশ ঠাণ্ডা। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর জলের বোতলে ঝরণার জল ভর্ত্তি ক'রে নিয়ে, আবার পথ চলতে সুরু করা গেল।

প্রায় মন্দিরের নিকটবর্ত্তী হয়েছি, তখন কয়েকজন স্বজাতীয় ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ। তাঁরা ঠাকুর দর্শন ক'রে নীচে নেমে যাচ্ছেন। আমাদের অসময়ে পাহাড়ে ওঠার দরুণ তাঁরা বাঘ-ভালুকের গল্প আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাঁদের গল্প আমরা বিভোর হ'য়ে শুনছি দেখে—'স্কাউট্' বলে উঠ্‌লো, "মোশয়রা, কিছু মনে করবেন না। সন্ধ্যা হ'তে ত ম'টে কয়েক ঘণ্টা বাকি আছে, আপনারা যে রকম গপ্পিদাদার মত গল্প ফেঁদে বসেছেন দেখছি—এ যে চট্ ক'রে সাঙ্গ হ'বে বলে মনে হচ্ছে না।



পরেশনাথ-পর্ব্বত শিখরের মন্দির

শেষকালে এতটা সাবধান হয়েও, আপনারাও কি বাঘের পেটের মধ্যে আশ্রয় নিতে চান?" স্কাউটের কথা শ্রবণ মাত্র সকলের যেন জ্ঞান হ'ল।

তার কথায় সকলেই একটু হেসে নিয়ে 'গপ্পিদাদার' বাঘ-ভালুককে বিদায় দিয়ে যে যার গন্তব্য পথে চলতে আরম্ভ করলুম। পৌনে ছ-মাইলে একটি ডাক-বাংলো অবস্থিত। বাংলো ছাড়িয়ে মন্দিরে উঠ্‌বার সিড়ি। পথ-প্রদর্শকের কথানুযায়ী তার জিম্বায় আমাদের জুতোগুলি রেখে মন্দিরে এসে উপস্থিত।

কলকাতায় উল্টাডিঙ্গীতে যাঁর সুবৃহৎ পরেশ-নাথ দেবের মন্দির শোভা বর্দ্ধন করছে, সেই স্বর্গীয় বদ্রিদাস মহাশয় কয়েক লক্ষ মুদ্রা দিয়ে ব্রিটীশ গভর্মেণ্টের কাছ থেকে এই বৃহৎ পর্ব্বতটি ক্রয় ক'রে, তার চূড়ায় পরেশনাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতদ্ব্যতীত তেইশটি ক্ষুদ্র মন্দির পর্ব্বতে ভিন্ন ভিন্ন সুরম্য-স্থানে বিরাজ করছে। কিম্বদন্তি আছে —এই সকল ইষ্টক নির্ম্মিত মন্দির নির্ম্মাণ কালে, পর্ব্বতের উপর প্রত্যেক ইটটি তুলতে একটাকা ক'রে ব্যয় হয়েছিল।

এখন শ্বেতাম্বর এবং দিগম্বর জৈন-সম্প্রদয়ের তীর্থস্থান হওয়ায়, পর্ব্বতে শিকার করা আইন বিরুদ্ধ। পর্ব্বত শিখরে দেব-দর্শনার্থে অধিকাংশ যাত্রী ইস্‌রী থেকে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী মধুবন দিয়ে এসে থাকেন। মধুবন পর্ব্বতের পাদ দেশে অবস্থিত। শালবন মধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য পথের মধ্য দিয়ে এই পথটি ছায়াযুক্ত করায়, যাত্রীদের গমনা গমনের বিশেষ সুবিধা। ইস্‌রীতে জৈন দিগের তিন-চারটি ধর্ম্মশালা, ক্ষুদ্র বাজার ও নিকটে রেল-ওয়ে-ষ্টেসন থাকায় যাত্রীদের কোনরূপ কষ্ট ভোগ করতে হয় না। এমন কি যাঁরা পথ চলতে অক্ষম, তাঁরা এখান থেকে 'ডাণ্ডি'তে আরোহন ক'রে যেতে পারেন। কিন্তু অপর পথ নিমিয়াঘাটে একটি ইনেস্‌পেক্সন বাংলো ব্যতীত অবস্থান করবার সুবিধা নাই। খাদ্য দ্রব্যাদি মেলা দুষ্কর এবং রেলওয়ে ষ্টেসনও দু-মাইল দূরে। পর্ব্বতারোহণের জন্য এস্থানে 'ডাণ্ডী' পাওয়া যায় না। গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোডের উপর নিমিয়াঘাট অবস্থিত থাকায়, আমাদের এই পথ দিয়ে পর্ব্বতে আরোহণ করা সুবিধাজনক।

অতএব নিমিয়াঘাটের পথেই আমরা পরেশনাথদেবের মন্দিরে উপস্থিত হয়েছি।

পর্ব্বত শিখরে মন্দিরটি বৃহৎ; অনেকটা কলকাতার পরেশনাথ দেবের মন্দিরের আকারে নির্ম্মিত। মন্দির মধ্যে পরেশনাথ দেবের দুইটি পদ-চিহ্ন ব্যতীত কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি নাই। মন্দিরে একজন পূজারী ও দরোয়ান থাকেন। পূজারী আমাদের প্রসাদ খেতে দিলেন। প্রসাদ বড় অদ্ভুত রকমের—চাল, নারিকেল-কুচি, ছোট এলাইচ ও লবঙ্গ হলুদ জলে মিশ্রিত। কিন্তু একটু ঐ প্রসাদ ও জলের বোতল থেকে ঝরণার জল পান করায়, আমাদের ক্লান্ত দেহে বল সঞ্চার হ'ল। অর্দ্ধ-ঘণ্টা বিশ্রাম ক'রে পূজারী ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করলুম।

আরোহণ অপেক্ষা অবতরণ আরো কঠিন। অনবরত নীচের দিকে যেতে যেতে পেটের নাড়ী ছেঁড়্বার উপক্রম করতে লাগলো। ঝাঁকানির চোটে শরীরটা ধক্ ধক্ করতে করতে অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে, মাইল পাথর চোখে পড়ায় হিসাব ক'রে দেখি, মাত্র আর দু-মাইল পথ বাকী আছে। যখন দিনের আলো পর্ব্বতের গায় গায় ঘেঁস্তে ঘেঁস্তে কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে চারিদিক অন্ধকার ক'রে ফেললে, তখন আমরা টর্চের আলোর সাহায্যে এগিয়ে চললুম। হঠাৎ দেখি—দূরে সাদা সাদা কি সব নড়্ছে! নিকটবর্ত্তী হ'তেই আশ্চর্য্য হয়ে দেখি যে, উঠবার সময় বাঘ-ভালুকের গল্পে যাঁদের সঙ্গে উন্মত্ত হয়ে গেছলুম—তাঁরা এখনও নাম্ছেন। তাঁরাও আমাদের এত শীঘ্র নাম্তে দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বললেন, "একি মশাই! আপনাদের পায়ে ঘোড়া বাঁধা আছে নাকি এরি মধ্যে এতখানি পথ এসে আমাদের ধরে ফেললেন।" আমাদের স্কাউট্ অমনি ফক্কোড়ি ক'রে বল্লে, "আজ্ঞে-এঁ-এঁ ঘোড়া টোড়া নয়, একে সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আপনাদের না দেখ্তে পেয়ে গপ্পিদাদার ব্যাঘ্রমশায় তাড়া দিতে দিতে আপনাদের নিকট এত শীঘ্র আমাদের এনে

হাজির ক'রে ফেলেছেন ; পিছনে ওই যে তিনি আস্‌ছেন।" স্কাউটের কথায় তাঁরা গপ্পিদাদার কল্পিত ব্যাঘ্র মহাশয়কে দেখবার জন্য হঠাৎ একবার অরণ্য মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায়, আমরা হো হো ক'রে হেসে ফেলে মুস্কিলে পড়ে গেলুম ; কারণ—তাঁরা একটু লজ্জিত হয়ে পড়লেন। যা'হোক, তাঁদের নিকট বিদায় নিয়ে নির্ব্বিঘ্নে নিমিয়াঘাট বাংলোয় যখন এসে পৌছলুম—তখন রাত সাতটা।

বাংলোয় পৌছে স্কাউট্ টিংচারআয়োডিন খোঁজ করতেই—তার পায়ের তলা দেখে বড়ই দুঃখ হ'ল। কারণ, তার ডান পায়ের বৃদ্ধঅঙ্গুলিতে নখ-কুনি হওয়ায়, সে বেচারা খালি পায়ে আমাদের সঙ্গে এতদূর পাল্লা দিয়েছে। আমি তার পায়ের ক্ষতস্থলে আয়োডিন লাগিয়ে দিয়ে ধৈর্য্যের প্রশংসা না ক'রে থাকতে পারলুম না। অতঃপর পথ-প্রদর্শকের নিকট এ বাংলো নিরাপদ নয় জেনে ক্যাপ্টেনের হুকুমে বিউগ্‌লার তার কৃত্রিম-বিউগ্‌লে ফুৎকার করতেই—ক্রমাগত সেই একই সুরে পোঁ পোঁ ক'রে সকলকে যাত্রা করবার জন্য জানিয়ে দিলে। অবসন্ন দেহে যাত্রার ইঙ্গিত শুনে ক্যাপ্টেনের উপর ভীষণ রাগ হ'ল ; কিন্তু কি করা যায়! ক্যাপ্টেনের হুকুম, বাধ্যহয়ে সকলে নিমিয়াঘাট পরিত্যাগ ক'রে, ইস্‌রিতে (২০১ মাইল) উপস্থিত হয়ে ধর্ম্মশালায় আশ্রয় নিলুম।

"আট্‌কার জঙ্গলে"

২৫ শে অক্টোবর:—সকাল সাতটা থেকে বেলা এগারটা পর্য্যন্ত সাইকেলের সঙ্গে কুস্তি করতে করতে 'বাগোদর' এ (২১৬ মাইল) বিশ্রাম নিয়ে, যখন বাগোদরকে পিছনে রেখে 'বর্হি'র দিকে রওনা হলুম তখন বেলা তিন্‌টে। বাগোদর ও বর্হির পথে 'আট্‌কা' এবং 'কাটুয়া' নামে বাঘ-ভালুকে ভরা পর পর দু-টি জঙ্গল প্রায় এগার মাইল ধরে পার হ'তে হয়। পথে নানা কারণে দেরী হওয়ায়, আমরা দিনের বেলায় জঙ্গল পার হ'তে পারলুম না। জঙ্গলে প্রবেশ করতেই আমাদের সাইকেলের আলো জ্বাল্‌তে হ'ল। দারুণ অন্ধকার! অন্ধকারে জঙ্গল অতি ভীষণ ভাব ধারণ করায়, পথ চলা ভার হ'য়ে উঠলো। আমরা সার বেঁধে দুই পঙ্‌ক্তিতে বিভক্ত হয়ে চারিদিকে টর্চের আলো নিক্ষেপ করতে করতে এগিয়ে চলেছি। এইভাবে টর্চের আলো মাইল-পাথরের উপর পড়্‌তেই হিসেব ক'রে দেখি যে, মাত্র দেড় মাইল পথ অতিক্রম করেছি—এখনও সাড়ে ন-মাইল! গা-টা শিউরে উঠলো। আমরা সাইকেলের গতি বাড়ালুম। কিন্তু যত চাই শীঘ্র যেতে—আর ভগবান ততই বাধা প্রদান করেন। অসময়ে সেই বাঁশী! বাঁশীর শব্দে এই ভয়াবহ স্থানে উৎসুক হয়ে সাইকেল চালান স্থগিত রেখে একত্র হ'তেই দেখা গেল, স্কাউটের গাড়ীর 'ফ্রীর স্প্রীং' কেটে গেছে। একে এই জঙ্গল—তা'তে আবার রাত। এবার বুঝি বা আমাদের হাঁট্‌তে হ'বে। কিন্তু আমাদের মাষ্টারমেকানিক কারুর কথার ভ্রুক্ষেপ না ক'রে গাড়ীর পিছনের চাকা তাড়াতাড়ি খুলে ফেললে। প্রায় সাত সের ভারি যন্ত্রপাতির থলেটা গাড়ী থেকে খুলে নিয়ে সে কাজ আরম্ভ করলে। কোয়ার্টার-মাষ্টার তা'কে সাহায্য করতে লাগলো। বিউগ্‌লারের গাড়ীর কার্ব্বাইডের আলোটি ধরে স্কাউট মহাশয় তা'র প্রাণাধিক গাড়ীর খোলা চাকাটার উপর আলো ফেলতে ফেলতে মধ্যে মধ্যে উৎসুক নেত্রে সামনে নিবিড়ারণ্য মধ্যে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করছিল; বোধহয় গল্পিদাদার কল্পিত ব্যাঘ্র-মহাশয় এ'বার বুঝি বা আকার ধরে আবির্ভূত হয়—সেই কথাই ভাবছিল। আমরা বাকি পাঁচজন তাদের চারিদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, যে যার পাউরুটি ও পেন্‌সিল কাটা ছুরি ছোরা গুলো বাগিয়ে ভাবী শত্রুর অপেক্ষা করতে লাগলুম।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধতায় পূর্ণ। অন্ধকারময় বিস্তৃত অরণ্য মধ্যে 'জোনাকি'র দল ক্ষণে ক্ষণে মৃদু-আলোকে আলোকিত ক'রে, অরণ্যের গভীরতা প্রকাশ করছে। ঠাণ্ডা বাতাস চলাচলের জন্য বৃক্ষ-লতা-গুল্মাদির মর্ম্মর শব্দ এবং কর্কশ স্বরে নিশাচর পক্ষিগণের রাগিনীর রাগ পঞ্চমে উঠে মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছে। মাঝে মাঝে তমোময়-বনমধ্য হ'তে বিলোড়িত শুষ্ক-পত্র ঘর্ষণের শব্দ লক্ষ্য ক'রে টর্চের আলো নিক্ষেপ করায়, ত্রাসিত হৃদয় শৃগাল ভায়ারা দ্রুতপদে নিবিড়-অরণ্যে লুকায়িত হচ্ছে। এইভাবে ক্ষণকাল অতিবাহিত হ'ল। সূচিভেদ্য অন্ধকার অরণ্য হ'তে সহসা অত্যাধিক নাসিকা-গর্জ্জনের ন্যায় বিকট শব্দ আসতে লাগলো। মেকানিকের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল—সে আর দেরী না ক'রে পাঁচ মিনিটের মধ্যে গাড়ীর চাকাটা ফ্রেমের ভিতর পরিয়ে ফেললে ও আমাদের সকলকে প্রস্তুত হ'বার জন্য জানিয়ে দিলে। ক্রমশঃই নাসিকা গর্জ্জন বিকট হ'তে বিকটতর হয়ে বনভূমি কাঁপাতে লাগলো। আমরা সেই শব্দ লক্ষ্য ক'রে যেমনি টর্চের আলো ফেলেছি—অমনি সেইদিকের ঝোপ্‌-জঙ্গল প্রবল বেগে নড়ে উঠলো। এই অবস্থায় সকলে তাড়াতাড়ি ক'রে সাইকেলে উঠ্‌তে গিয়ে—'পপাত ধরণী তলে।' এক সেকেণ্ড বিলম্ব না ক'রে যে যার গাড়ীগুলো উঠিয়ে চাপ্‌তে গিয়ে পুনরায় কয়েকবার আপোষে ধাকা লাগতে লাগতে অতিকষ্টে যখন একবার চেপে বসলুম, তখন ঝোপের ভিতর বাঘই থাক্‌ বা শৃগালই থাক্‌—আমরা সে দিকে লক্ষ্য না ক'রে দ্রুতগতিতে সে স্থান পরিত্যাগ

করলুম। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখি যে আমাদের স্কাউট্ একটু পিছিয়ে পড়েছে। আমরা ধীরে ধীরে গাড়ী চালিয়ে স্কাউট্ একত্র হতে'ই, গপ্পিদাদার কল্পিত বাঘ দেখবার জন্য পিছিয়ে পড়েছিল কিনা জিজ্ঞাসা করায়, সে অতি বিমর্ষভাবে উত্তর দিল—"যাঃ! এখন আর ঠাট্টার সময় নয়, তাড়াতাড়ি ক'রে এগিয়ে চল।"

আমাদের গাড়ীগুলো কির্ কির্ শব্দে পথের কাঁকোর সরাতে সরাতে এগিয়ে চলেছে, এমন সময়, সামনে একটি মোটর গাড়ী তার প্রচণ্ড 'হেড্-লাইটে'র আলোয় আমাদের একেবারে কানা ক'রে দিলে। এরূপ অবস্থায় পথ চলা ভার হ'ল। তৎক্ষণাৎ বিউগ্লার তার 'একসুরো' বিউগলটা নিয়ে কায়েদা ক'রে বাজাতেই, আগন্তুক মোটরের তীব্র আলোটি নিভিয়ে দিয়ে গাড়ীটি একপাশে দাঁড় করালেন। মোটরের নিকটস্থ হয়ে দেখি, একটি Baby Austin car এ কয়েকজন বাঙ্গালী। পরিচয়ে জানতে পারলুম, তাঁরা 'হাজারিবাগ' থেকে মোটরে কলকাতায় যাচ্ছেন। তাঁদের মধ্যে কলকাতার মিউনিসিপাল-কর্পোরেশনের কাউন্সিলার শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের এরূপ বিনা অস্ত্রে রাত্রে আটকার জঙ্গলে প্রবেশ করা বিশেষ অন্যায় হয়েছে বলে, তাঁদের দুটি গুলিভরা বন্দুক দেখিয়ে দিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর আমাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে, তাঁরা আমাদের নিকট হ'তে বিদায় নিলেন এবং আমরা কলকাতায় যেন ফিরে, একদিন তাঁর বাড়ীতে গিয়ে 'ভ্রমণের গল্প' করি—সেজন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন।

আমরা কলকাতায় ফিরে নলিনী বাবুর সঙ্গে দেখা করায়, তাঁ'র নিকট হ'তে যে কথাটি শুনেছিলুম, সেইটি উল্লেখ না ক'রে থাক্তে পারলুম না। আট্কার জঙ্গলের মধ্যে নলিনীবাবু আমাদের নিকট হ'তে বিদায় নিয়ে প্রায় দু-মাইল পথ অতিক্রম করতেই, হঠাৎ দেখতে পেলেন প্রকাণ্ড একটি 'রয়েল টাইগার' পথ জুড়ে শুয়ে নাসিকা গর্জ্জনে

উঠল। এই অবস্থায় তাঁরা যে কি করবেন কিছুই ঠিক্ করতে না পেরে মোটরের হেড্‌লাইটটি বারে বারে জ্বালাতে ব্যাঘ্র মহাশয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও গর্জ্জনের সহিত প্রকাণ্ড একটি হাই তুলে যেন দয়া ক'রে গদ-গদ-চালে হেল্‌তে দুল্‌তে পথপার্শ্বে একটি বৃক্ষমূলে চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়লেন। মোটরে এতগুলি মনুষ্য-মূর্ত্তি দেখেও যখন বাঘটি তাঁদের আক্রমণ না ক'রে পথ হ'তে সরে গেল, তখন বাঘটি 'নর-খাদক' নয়, বুঝতে পেরে, নলিনীবাবু ঊর্দ্ধশ্বাসে বাঘের পাশ কাটিয়েই বেরিয়ে গেলেন; পথে আর কোন বিপদে পড়েন নাই। আমার মনে হয়, যেখানে আমাদের স্কাউটের গাড়ীর 'স্প্রীং' মেরামতের সময় বন-মধ্য হ'তে নাসিকা গর্জ্জনের শব্দ শুনে টর্চের আলো নিক্ষেপ করতেই ঝোপ-জঙ্গল নড়ে ওঠে, সেই স্থানেই এই দয়ালু ব্যাঘ্রটি অবস্থান করছিল। টর্চের আলো নিক্ষেপ করায় পথে বেরিয়ে পড়ে, কারণ গাড়ী মেরামতের স্থান হ'তে দু-মাইল অতিক্রম করার পরই নলিনী বাবুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যা'হোক, আমরা তার প্রচণ্ড নাসিকা গর্জ্জন শুনেই অস্থির হ'য়ে পড়েছিলুম, না জানি, নলিনীবাবুদের মত যদি ব্যাঘ্রটি পথরোধ ক'রে পড়ে থাকতো, তাহ'লে কি হ'ত!—একেই বলে বরাত।

নলিনী বাবুদের নিকট বিদায় নিয়ে অতি সাবধানে এগিয়ে চলেছি। ক্রমশঃই অরণ্য অতি ভীষণাকার ধারণ করতে লাগলো। এরূপে আট্‌কা পার হয়ে 'কাটুয়া' জঙ্গলে প্রবেশ করলুম। কাটুয়া আট্‌কার মত ভয়ঙ্কর বলে মনে হ'ল না। এখানে জঙ্গল ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়েছে। হঠাৎ বাঁ-দিকে ২৩৮ মাইল পাথরের নিকট একটি ইনেস্‌পেক্সন বাংলো দেখতে পেয়ে আর আমার এগুলুম না। এই বাংলোর নাম—'সঙ্ক্রেজ'। দু-জন ক'রে জেগে জেগে পাহারা দিয়ে অনশনে রাত্রি ভোর হয়ে গেল।

"কর্ম্মনাশ !"

২৬ শে অক্টোবর :—'সক্করেজ' থেকে বেরিয়ে যখন 'বর্হি' (২৪৮ মাইল) পৌছলুম—তখন বেলা আটটা। এখানে আসতেই 'পি, ডব্লুউ, ডি'র সাব্ডিভিসনাল অফিসারের বাড়ীতে অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে বেলা এগারটায় 'চোরপরাণ' এ (২৫৯ মাইল) উপস্থিত হয়ে রামগড় জমিদারের তহশীলদার মহাশয়ের অতিথি হলুম। আমরা আসবার প্রায় মিনিট দশ পূর্ব্বে তহশীলদার মহাশয় তাঁর দেশ থেকে ফিরেছেন। ইনি পশ্চিম দেশীয় হিন্দু। আমরা যখন তাঁর বাড়ীর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিলুম, তখন তিনি আশ্চর্য্য হয়ে আমাদের ডেকে, কি কারণে এইভাবে সাইকেলে চলেছি, তা' অবগত হয়ে আনন্দের সহিত মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্ত নিমন্ত্রণ ক'রে বসেছিলেন। যা'হোক, আমাদের বরাত ভাল; স্নান করার পর তহশীলদার মহাশয়কে একটু ম্যাজিকের খেলা দেখিয়ে আমিও তাঁকে একটু আমোদ দিলুম। চোরপরাণ জায়গাটা মন্দ নয়; কিন্তু দোকান পাট সেরূপ নাই। সবে মাত্র দেশ থেকে ফিরে তহশীলদার মহাশয় আমাদের তাড়াতাড়ি দেখে আহারাদির বিশেষ কোন জোগাড় না করতে পারলেও তাঁর নানাবিষয়ে অতিথি পরায়ণতা দেখে যথেষ্ট আনন্দোপভোগ করলুম। 'ভিনিগারে'-ভেজান পেঁয়াজ, একটু ডাল ও ভাত আরামের সহিত উদরস্থ ক'রে বেলা প্রায় দেড়টার সময় যাত্রা করলুম।

২৬০ মাইল পাথরের কাছ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রায় ২৩ মাইল ধরে এবার একটি জঙ্গল পথে পড়লো। পাহাড়ের মধ্যে এই জঙ্গলের পথটি 'চোরপরাণ-পাস্' নামে অভিহিত। কিংবদন্তি আছে, বহুকাল পূর্ব্বে ধানোয়া এবং ভুলুয়া নামে দুই ভাই এই প্রসারিত কানন-মধ্যে অতি গুপ্তস্থানে লুকিয়ে থেকে দস্যুবৃত্তি করতো। এই ভীষণ দস্যু-দ্বয়ের দৌরাত্ম্যের জন্ত সরকার কর্ত্তৃক নিয়োজিত সিপাইগণের সাহায্যে বেলা

ন-টা থেকে তিন-টা অবধি পথিকগণ জঙ্গলের পথে গমনাগমন করতো। সরকারের বহু চেষ্টায় অনেকদিন পরে দস্যু ভ্রাতৃদ্বয় একদিন ফৌজ কর্ত্তৃক ঘনসন্নিবিষ্ট পর্ব্বত-মালা সমন্বিত তরুলতাচ্ছাদিত গহ্বর অভ্যন্তরে খণ্ড যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অবশেষে ধৃত হওয়ায়, স্থানীয় অধিবাসী এবং পথিকগণের আশঙ্কা দূরীভূত হয়। তাদের নামেই কাননটি আজ "ধানোয়া-ভুলুয়া" নামে খ্যাত। অবশ্য এখনও কানন মধ্যে লক্ষ লক্ষ হিংস্র পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ বাস করায়, বেলা আট্‌টার পূর্ব্বে ও পাঁচটার পরে কেউ ঐ পথে যাতায়াত করতে সাহস ক'রে না। আমরা বনের মধ্যে প্রবেশ ক'রে ঢালু রাস্তা পেয়ে হু হু ক'রে প্রায় ছ-মাইল পথ অতিক্রম করলুম। এক স্থানে বিস্তর 'আমলকি'র' ঝাড় দেখতে পেয়ে



ধানোয়ার জঙ্গলে আমলকি সংগ্রহ

কিছু আম্‌লকি সংগ্রহ করা হ'ল বটে; কিন্তু এত কষায় যে থু থু করতে করতেই অস্থির। প্রায় ২৬৭ মা'ইলের নিকট ধান্নুয়া ইনেস্‌পেক্সন-বাংলো দেখতে পেলুম। পথটি ৭০০ ফিট্‌ নেমে এসে প্রায় ২৬৮ মাইলে খর-স্রোতা 'মোহনা' নদীর সেতু অতিক্রম ক'রে গয়া জিলায় পদার্পণ করতেই, জঙ্গলটি 'ভুলুয়া' নামে অভিহিত হ'ল। তার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ধানোয়া নামে

খ্যাত ছিল। এই জঙ্গলটি টিকারীর রাজার জন্য সংরক্ষিত করা হয়েছে। কারণ, তিনি প্রতি বৎসরে এস্থানে বাঘ, ভালুক, শম্বর ইত্যাদি শিকার ক'রে থাকেন। ২৭৬ মাইল পাথরের নিকট বনমধ্যে 'কাউডগা' ইনেস্‌পেক্সন বাংলো অবস্থিত। এস্থানে কয়েকটি লোকালয় দেখা গেল। তারপরেই জঙ্গল প্রায় হ্রাস প্রাপ্ত হয়েছে। জঙ্গল শেষে কিছু দূরেই প্রায় ২৮৫ মাইলে 'ধোবি' ইনেস্‌পেক্সন বাংলো। নির্ব্বিঘ্নে এই বনভূমি অতিক্রম ক'রে ধোবিতে ক্ষণ কাল বিশ্রামের পর ২১ মাইল পথ 'গয়া'র রাস্তা, ডান দিকে রেখে সেরঘাটি (২৯২ মাইল) এসে পৌছলুম। দুই পাশে দুটি নদীর মাঝখানে সেরঘাটি সহরটি অতি সুন্দর। ট্রাঙ্করোডের ডান দিক দিয়ে সহরে প্রবেশ করতে হয়। এখানে অনেক মুসলমানের বাস। পূর্ব্বে এই স্থানে নাকি সম্রাট সের্‌শাহের সৈনিকদিগের ঘাটি অবস্থিত ছিল; সেই কারণে এই সহরটির নাম সেরঘাটি হয়েছে। এখানে তিন-চারঘর বাঙ্গালী ভদ্রলোক অনেক দিন থেকে বসবাস করছেন। তাঁ'রা আমাদের বিশেষ খাতির ক'রে আশ্রয় দিলেন।

২৭শে অক্টোবর:—ভোরের ঠাণ্ডা কন্‌কনে বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়া গেল। ট্রাঙ্ক-রোডে উঠ্‌তে যাব, এমন সময়—পুলিস ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়ের ডাক পড়্‌তেই থামতে হ'ল। ঠাণ্ডায় জমে যাবার উপক্রম হওয়ায় চা পানের প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল, তাই ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়ের ডাক পড়তেই মনে হ'ল, বুঝি বা তিনি আমাদের মনের কথা জানতে পেরেছেন। কিন্তু, তিনি 'সে গুড়ে বালি দিয়ে' দুটো মিষ্টি ভাষায় নাম ধাম লিখে যখন বিদায়ের সেলাম ঠুকে বসলেন, তখন অমাদের স্কাউট্ আর থাকতে না পেরে বিনা দ্বিধায় বিহারী ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়কে বাঙ্গালা মিশ্রিত হিন্দী ভাষায় বলে বসলো, "আব্ খালি নাম লেনেকো বাস্‌তে হাম লোককো ডাকা হ্যায়? হাম্ সম্‌ঝা এৎনা জাড়ামে হামলোক কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে যাতা বোল্‌কে—আব্ হামলোককো চা পিলায়

দেগা।" তিনি স্কাউটের কথায় খুব একচোট্ হাসতে হাসতে আমাদের একটু বসতে বললেন—বাধ্য হয়ে চা পান করাবার অভিপ্রায়। কিন্তু ক্যাপ্টেন আবার ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়ে, অনেক দেরী হয়ে যাবে বলে বিদায় চেয়ে বসলো। অগত্যা একসুরো বিউগ্‌ল পোঁ পোঁ করতেই আমরা সকলেই সারি দিয়ে দাঁড়ালুম। ক্যাপ্টেন যাত্রার ইঙ্গিত করতেই আমরা গাড়ীতে সবে মাত্র উঠেছি, হঠাৎ, স্কাউটের গাড়ীর সামনের চাকার সঙ্গে আমার গাড়ীর সংঘর্ষণ হওয়ায়, ধপাৎ ক'রে সে পড়ে গেল। অবশেষে তা'র এরূপ অমনযোগের সহিত গাড়ী চালানোর কারণ জানতে পারলুম যে, গাড়ীতে উঠেই সে পিছন দিকে দালানের এককোনে রক্ষিত চায়ের 'কেট্‌ল্'টার প্রতি ছল্ ছল্ নেত্রে অবলোকন করছিল।



'মদনপুর, রাজপুত ইনেস্‌পেক্টর সহ হুইলারস গণ

যা'হোক, পুনরায় সাইকেলে চেপে যেতে যেতে কয়েকবার 'টিউবলিক্' হওয়ায় থামতে হ'ল। বেলা সাড়ে দশটার সময় পাহাড়ের কোলে অবস্থিত 'মদনপুর' (৩১৬ মাইল) নামক গ্রামে হাজির হয়ে থানার

রাজপুত ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়ের বাড়ীর নিকট একটি ইন্দারায় জলের বোতলে জল পূর্ণ করতে গিয়ে, তাঁ'র বাড়ীতে 'বর্‌বটি' চচ্চড়ি, লেবুর রস মিশ্রিত পেঁয়াজ দেওয়া ওল-ভাতে অড়হর-ডাল এবং ভাত জুটে গেল। বেলা দুটো নাগাদ এখান থেকে যাত্রা ক'রে কিছুদূর যেতে না যেতেই ভীষণ মনুষ্য চীৎকার শুনতে পেয়ে বাঁ-দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায় দেখতে পেলুম—কতকগুলি রাখাল প্রায় পাঁচ-ছটা শৃগালের পিছুতে নানারূপ হৈ চৈ করতে করতে ছুটে যাচ্ছে। একটি গাছতলায় গরুর পিঠে বোঝা চাপিয়ে দুইটি লোককে বসে থাকতে দেখে, এরূপ ভাবে শৃগালের পিছনে তেড়ে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তারা বললে, "আরে বাবু উ তো সিয়ার নেহি হ্যায়—উ তো 'ভেড়িয়া' (নেক্‌ড়ে), বাছোয়া পাক্‌ড়েক্ আয়া থা, ইহমা তো বহুত ভেড়িয়া হ্যায়।" হাজারিবাগ জিলার অত ভীষণ বনে বাঘ দেখিনি, সেখানে বাঘ না দেখাই আশ্চর্য্য; কিন্তু গয়া জিলার এই সামান্য আগাছার মধ্যে এতগুলি নেকৃড়ে বাঘ দেখে অবাক হয়ে গেলুম।

রাস্তা এবার বেশ সমতল। রাস্তা ভাল পেয়ে বেগে সাইকেল চালাতে চালাতে একেবারে সন্ধ্যা সাতটার সময় 'শোন' নদের উপকূলে এসে হাজির। এই শোন নদ ব্যতীত এ পর্য্যন্ত সকল নদ-নদীর উপর সেতু পেয়েছিলুম। নদের পরপারে যাবার জন্য মাঝে মাঝে নৌকা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু আমরা তা' না পাওয়ায় ডানদিকে প্রায় মাইল খানেক পথ অতিক্রম ক'রে 'শোন-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক' রেলওয়ে ষ্টেসনে (৩৩৫ মাইল) উপস্থিত হলুম। সাইকেল সমেত রাত সাড়ে আটটায় ট্রেনে চেপে সেতুটি অতিক্রম ক'রে 'ডেরি'তে পৌছলুম।

২৮ শে আক্টোবর:—অতি জঘন্য পথ দিয়ে প্রচণ্ড ধূলার সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে বেলা সাড়ে আটটার সময়ে 'সাসারামে' (৩৫০ মাইল) শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত। বিহার প্রদেশের

অতি পুরাতন সহর সাসারাম। যাঁ'র তৈরী রাস্তা দিয়ে আজ এতটা পথ আতিক্রম করেছি, সেই সম্রাট্ শেরসাহের সমাধিস্থান দেখবার জন্য সমাধি স্থলে এসে হাজির হলুম। চারিদিকে জলাশয় বেষ্টিত সমাধি-মন্দিরটি বড়ই সুন্দর!



সাসারামে শেরসাহের সমাধি মন্দির

বেলা আড়াইটের সময় সাসারাম থেকে রওনা হলুম। গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে হু হু ক'রে চলেছি; ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এল—সন্ধ্যার পর রাত হয়ে গেল—তবুও বিশ্রাম নাই। সেই একঘেয়ে ভাবেই চলেছি। রাত্রি অতিশয় অন্ধকার! সঙ্গে একটি কার্ব্বাইডের আলো পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু কার্ব্বাইড ফুরিয়ে যাওয়ায় আস্তে আস্তে নিভে গিয়ে আমাদের কাণা ক'রে দিলে। আবার কিছুদূর যেতে যেতে তেলের আলো গুলোয় তেল ফুরিয়ে গিয়ে ক্রমে ক্রমে এক একটি ক'রে প্রত্যেক আলোটি জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে টুপ্ ক'রে নিভে একেবারে অন্ধ। কারণ টার্চের ব্যাটারীগুলো পূর্ব্বেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। অন্ধকারে পথ চলা একরকম অসম্ভব হয়ে উঠলো। সর্ব্বদাই মনে হচ্ছে সামনে যেন কি সব তাল গোল পাকিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—এই বুঝি লাগলো ধাক্কা।

এমন সময়, সত্যি সত্যিই হ'লও তাই,—বিউগ্‌লার "আরে আরে থামো থামো" বলে চীৎকার করতে না করতেই পর পর এ ওর ঘাড়ে ধুপ্‌ ধাপ্‌ ক'রে পড়তে লাগলুম। উঠে দেখি যে, প্রকাণ্ড শাখা-প্রশাখা নিয়ে বাব্‌লা গাছের ডাল রাস্তা জুড়ে পড়ে রয়েছে! কোন গ্রামের কাছ দিয়ে তখন যাচ্ছিলুম তা জানি না। রাস্তা মেরামতের দরুণ বাব্‌লা গাছের ডাল ফেলে পথ বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে লালই হোক্‌ বা হল্‌দেই হোক্‌ অন্ততঃ একটি আলো রাখা যে উচিত ছিল, সে বিষয় পি-ডব্লিউ-ডির কর্ত্তাদের মাঝে মাঝে একটু নজর করা কর্ত্তব্য নয় কি?

রাস্তা খোঁড়ার দরুণ অনেকটা পথ হাঁটতে হ'ল।' রাস্তা ভাল পেয়ে পুনরায় সাইকেলে উঠে কিছুদূর যেতে না যেতেই, অসময়ের সেই বাঁশী। সকলে থামতে দেখলুম যে, বিউগ্‌লারের ঘাড়ের উপর তখন সকলে পড়ে বেচারার হাঁটুতে বিশেষ আঘাত লাগায়, তার গাড়ী চালাতে কষ্ট হচ্ছে। কি করা যায়! এই ভীষণ অন্ধকার রাত্রে মাঠের মাঝখানে কোথায় থাক্‌বো—এ এক মহা ভাবনা উপস্থিত। অল্পদূরেই ডান দিকে একটি ঝোপের ফাঁক্‌ দিয়ে অস্ফূট আলোক-রশ্মি দেখা গেল। ঐ আলো লক্ষ্য ক'রে ধীর পদে অগ্রসর হয়ে একটা রেলওয়ে ষ্টেসন দেখ্‌তে পেলুম। আজ আমাদের ইচ্ছা ছিল মোগলসরাই পর্য্যন্ত যাব, কিন্তু এরূপ অবস্থায় এই ষ্টেসনেই রাত কাটানো ঠিক্‌ হ'ল। ষ্টেসনের বাইরে কয়েকটি চালা ঘর দুয়ারবন্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও জন প্রাণী নাই—সব খাঁ খাঁ করছে। এ যেন "ঠাকুরমার ঝুলির" ঘুমন্ত-পুরী। হঠাৎ দেখি এক ব্যক্তি একটি চালা ঘরের বন্ধ দুয়ারের সামনে আধভাঙ্গা এক চৌকির উপর আলোয়ানে আপাদ মস্তক আবৃত ক'রে নাসিকা গর্জ্জনে উন্মত্ত। তা'র নিকটস্থ হয়ে অনেক ঠেলা ঠেলির পর ঘুম ভাঙ্গাতেই, সে ত প্রথমটা ভোড়্‌কে গিয়ে হাঁ ক'রে আমাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগ্‌লো। পরক্ষণেই এক সেলাম ঠুকে তা'র আধ ভাঙ্গা

চৌকিটা এগিয়ে দিয়ে খাতির করলে। এখানে কোন খাবারের দোকান আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায়, সে বললে, তারই দোকান ব্যতীত আর কোন দোকান এস্থানে নাই। কৃষ্ণবর্ণ শক্ত চিড়া ও ভেলিগুড় ছাড়া দোকানে আর কিছুই পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে তদ্দ্বারা রাত্রি-ভোজন অতি কষ্টে সমাধান করতে হ'ল। ঘড়িতে দেখি রাত্রি প্রায় দেড়টা বাজে। আমরা বিশ্রামলাভের জন্য ষ্টেসনের দিকে যেতে লাগলুম। অল্পদূরেই শৃগালভায়ারা আর্ত্তনাদ করতে সুরু করেছে। ষ্টেসন-বাড়ীর নিকটস্থ হয়ে স্থানের নামটি দেখে একটু চম্‌কে উঠলুম, কারণ নাম হচ্ছে—'কর্ম্মনাশা' (৩৯২ মাইল)। কর্ম্মনাশায় আসতে হ'বে বলে, বোধহয় আমাদেরও আজ হ'ল সকল বিষয়েই—কর্ম্মনাশ!



"গন্তব্য স্থান"

২৯শে অক্টোবর :—দিনমণির আবির্ভাবে পূর্ব্ব গগন তাম্বুলরাগে রঞ্জিত হওয়ায়, নক্ষত্রভূষিতা নিশার অবসান হ'ল। আনন্দে আত্মহারা বিহঙ্গমদলের নৃত্য-গীতে নিদ্রাতুর অবসন্ন 'হুইলার্স'গণের চক্ষু উন্মিলিত হওয়ায়, বিমলাকাশপটে অবতীর্ণ আদিত্যদেবের ক্ষীণরশ্মি নিকটস্থ বৃক্ষরাজির তিমিরাবৃত শাখা-প্রশাখা বিদারিয়া উন্মোচিত গৃহ-দ্বার দিয়ে, ঝলকে বদন-মণ্ডলের উপর আভা বিস্তার ক'রে যেন জানিয়ে দিল—ওরে ওরে তোরা জড়তা দূর করে উঠে পড়, আজ যে তোদের বাবা বিশ্বনাথ দর্শনের দিন !

প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোক দর্শন-মাত্র অবিলম্বে শয্যাত্যাগ করলুম। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর ষ্টেসন-গৃহ হ'তে সাইকেলাদি বাইরে এনে কর্ম্মনাশা ত্যাগ করলুম। ঠাণ্ডা শীতল বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে যেতে মহা আনন্দে প্রভাতী সুরে একটি সঙ্গীত ধরা গেল :—

"প্রভাত হইল ভানু প্রকাশিল
মনোহর শোভা ধরণী ধরিল।
যাঁহার কৃপায় জীব সমুদয়
নিশা অবসানে জাগিয়া উঠিল॥
আলোক দেখিয়া পুলকে মাতিয়া
কাননেতে পাখী গাহিছে গান।
এই উষাকালে এস সবে মিলে
গাহিব তাঁরি জয় গুণগান॥"

পৌনে নটার সময় একেবারে মোগলসরাই (৪১২ মাইল) উপস্থিত। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে একটি দোকান থেকে প্রত্যেকে প্রায় আধ-সের ক'রে 'পুরি' ভক্ষণ করছি দেখে, এক ব্যক্তি অবাক্ হয়ে আমাদের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলো ! আমাদের স্কাউট্ একটু ভ্রূকুটি

ক'রে ঐ ব্যক্তিটিকে বলে বসলো, "আব্ তো নেই জান্‌তে হো—হাম্‌লোক সব 'ক্ষীণক্ষুধার দল' হ্যায়।" তার প্রতি দৃষ্টি রেখে স্কাউট্ যেমনি এই কথা বলেছে, আর অম্‌নি একটি চিল্ উড়্‌তে উড়্‌তে স্কাউটের গায় ডানার ঝাপ্‌টা মেরে পালিয়ে গেল। তখন তাড়াতাড়ি সে পুরি চর্ব্বণ করতে করতে চিলের প্রতি বাহুদ্বয় প্রসারিত ক'রে দু-চারবার হুস্ হুস্ ক'রেই ঠোঙ্গা থেকে খাবার নিতে গিয়ে দেখে—O ! স্কাউটের এই অবস্থা দেখে স্থানীয় কয়েকজন বালক মহা আহ্লাদে হাততালি দিয়ে নেচে উঠলো। বড়ই অপ্রস্তুতে পড়ে সে বেচারা কোয়াটার-মাষ্টারের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকাতে, অগত্যা কোয়ার্টারমাষ্টার পুনরায় তার ক্ষীণ ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য পোয়া খানেক পুরি এনে দিল।

মোগলসরাইয়ে ক্ষণকাল বিশ্রাম নিয়ে, বাঁদিকে রেলপথের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেতে যেতে দেখা গেল,—'বেণীমাধবে'র ধ্বজা। তখন স্ফূর্ত্তির সহিত গানে মত্ত হয়ে, চতুর্দ্দিকে ধূলা ছড়াতে ছড়াতে, পথের পথিককে দাঁড় করিয়ে—সাঁই সাঁই শব্দে আমরা 'ক্যালকাটা হুইলার্স'এর আটজন সভ্য মা'গঙ্গার উপর 'ডাফ্‌রিণ' সেতু অতিক্রম ক'রে—বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় আমাদের গন্তব্য স্থান ৺কাশীধামে উপস্থিত হয়ে এ বৎসরের মত ভ্রমণে ক্ষান্ত দিলুম।

দ্বিচক্রে "ক্যালকাটা হুইলার্স"

দ্বিতীয় বারের ভ্রমণ-কাহিনী

দ্বিচক্রে "ক্যাল্‌কাটা হুইলার্স"

"ক্লাবের সংস্কার"

১৯২৬ সালে ২৬ শে অক্টোবর বারাণসী ভ্রমণ নির্ব্বিঘ্নে সমাপনের পর, আমরা চার বন্ধুতে মিলে ক্লাবটিকে সাধ্যমত উত্তমরূপে গঠন ক'রে তোলবার চেষ্টা করতে লাগলুম। নিম্নলিখিত কয়েক ব্যক্তিকে কার্য্যকারী সমিতির স্থায়ী-সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত করা হ'ল :—

শ্রীযুক্ত গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য—সভাপতি
শ্রীযুক্ত অতুল্য চরণ ঘোষ—সহকারী ঐ
শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র নাথ মুস্তোফী—সম্পাদক
শ্রীযুক্ত জহরলাল দত্ত—কোষাধক্ষ্য
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মুস্তোফী
শ্রীযুক্ত লাবণ্য কুমার সরকার
শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ

এ ছাড়া ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকরূপে,—রায় জলধর সেন বাহাদুর; লেফ্‌টন্যাণ্ট্‌ কর্ণেল—এইচ্‌, ডব্লিউ, ষ্টোভল্ড ও, বি, ই—আর, ই; পুলিশের ডেপুটি কমিশনার—মিঃ এ, ডি, গর্ডন; এসিস্‌টেণ্ট্‌ কমিশনারদ্বয়—স্বর্গীয় নলিনী নাথ সেন ও শ্রীযুক্ত শক্তিপদ চক্রবর্ত্তী; শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু, ম্যানেজার—বি, সি, পি, ডব্লিউ; ডাক্তার গিরীন্দ্রশেখর বসু ডি, এস, সি—এম্‌, বি; ক্যাপ্টেন এস্‌, সি, মিত্র এম্‌, ডি......; কনট্রাক্টর মিঃ জে, সি, ব্যানার্জ্জি; স্বর্গীয় অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ ত্রৈলক্ষ্য নাথ গোস্বামী; ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ মিঃ জে, পি, দাস; জমিদার শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়; শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ বসু, প্রোঃ ক্যালকাটা হোটেল; ডাক্তার যতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়; চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র কুমার সেন; রায় দেবপতি দত্ত বাহাদুর এসিস্‌টেণ্ট্‌ সেক্রেটারী,

লেজিসলেটিভ এসেমব্লি; ইত্যাদি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যথাযথ ভাবে সাহায্য করায়, আমাদের ক্লাবটি ক্রমশঃই গড়ে উঠ্‌তে লাগলো। উপরি উক্ত মহামান্য মহোদয়গণের আন্তরিক চেষ্টায় ক্লাবের সংস্কার হয়, সেজন্য আমরা তাঁদের কাছে চির কৃতজ্ঞ।

ইংরেজী ১৯২৭ সাল; এবার আমরা চিল্‌কা হ্রদ হয়ে ৺পুরীধাম পর্য্যন্ত পাড়ি দেব, ঠিক্ হ'ল। পুরী যাবার সহজ রাস্তা জগন্নাথ রোড্ দিয়ে প্রথমে যাওয়া স্থির হয়েছিল, এই পথটি পুরী পর্য্যন্ত ৩১২ মাইল; কিন্তু উড়িষ্যায় এবার প্রচণ্ড বন্যায় এই পথটি অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, আমরা কলকাতা থেকে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড্ ধরে বরাকরে'র বাঁ-দিকের পথটি দিয়ে পুরুলিয়া, রাচী, চাঁইবাসা, টাটানগর, কিয়নঝড়রাজ্য, কটক, ভুবনেশ্বর এবং চিল্‌কা হ্রদ দেখে ৺পুরীধামে পাড়ি দেবার উদ্যোগ করলুম। এই পথে আমাদের ছোটনাগপুরের বিখ্যাত জঙ্গল ও 'সারান্দার সাত শত পাহাড়' অতিক্রম ক'রে গন্তব্য-স্থানে পৌছুতে হবে। ছোটনাগপুরের সেই অভাবনীয় নিবিড় তমোময় অরণ্য পথে 'হুইলার্স'গণকে ভ্রমণচক্রে পড়ে দ্বিচক্রযানে কত লোমহর্ষণ ঘটনায়ই না পড়তে হচ্ছে; পাঠক পাঠিকাগণ—আপনারাও একবার পাঠ-চক্রে পড়ে একটু এগিয়ে চলুন, তাহ'লেই সব বুঝতে পারবেন।

"পুরুলিয়া-অভিমুখে"

কার্য্যকারী সমিতির দ্বারা দ্বিতীয়বার পর্য্যটনের জন্য নিম্নলিখিত সাতজন সভ্য নির্ব্বাচিত হ'ল :—দেবেন্দ্র নাথ মুস্তোফী (ক্যাপ্টেন), গণীন্দ্রনাথ মুস্তোফী (কায়ার্টার মাষ্টার), রাধারমণ দত্ত (মাষ্টার-মেকানিক), জহরলাল দত্ত (ফটোগ্রাফার), অজিতকুমার বসু (কর্পোরাল), লক্ষীনারায়ণ দত্ত (রির্পোর্টার), এবং মণিলাল গুঁই (বিউগ্‌লার)। এবার আমাদের নিয়মানুযায়ী সকল আবশ্যকীয় দ্রব্য সামগ্রী সঙ্গে নেওয়া হ'ল। পরণের পোষাকাদি এবার সব একরকমের :—খাকী সার্ট ও হাফ্‌প্যাণ্ট, কোমরে সাদা বেল্ট ও বড় ছুরী, পায়ে খাকী পশমের ব্রাউন 'অক্সফোর্ড' জুতো, মাথায় খাকী 'পোলো হ্যাট্' এবং সার্টের উপরের পকেটে ও হ্যাটে ক্লাবের 'ব্যাজ্' আট্‌কান। এ ছাড়া বন্দুক, ক্যামেরা, বিউগ্‌ল (গত-বৎসরের ন্যায় এবার আর একসুরো নয়), প্রত্যেকের কাছে হুইসিল... ইত্যাদি। দ্রব্যাদি সমেত এক একটি সাইকেলের ওজন প্রায় পঁয়ত্রিশ সেরে দাঁড়ালো।

১লা অক্টোবর :—বেলা দেড়টার সময় ক্লাবে সকলে মিলিত হয়ে মির্জাপুর ষ্ট্রীটস্থ 'ক্যাল্‌কাটা হোটেলে' উপস্থিত হলুম। এখানে আমাদের বিদায় সম্ভাষণের জন্য ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক-গণ এল্-টি, কর্ণেল, ষ্টৌভল্ড এর সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করেন। পরম পূজনীয় সুবিখ্যাত পরিব্রাজক জলধর দাদামহাশয়ের সুন্দর বক্তৃতায় আমাদের সাহস দ্বিগুণ হয়ে উঠ্‌লো। বেলা তিনটে দশ মিনিটের সময় বিউগ্‌লের শব্দে চতুর্দ্দিক মুখরিত হয়ে উঠ্‌লো—সঙ্গে সঙ্গে আমরাও সকলের নিকট বিদায় নিয়ে চিল্‌কা ও ৺পুরীধামের উদ্দেশ্যে সাইকেলে চেপে যাত্রা করলুম। অনেকেই আমাদের সঙ্গে শ্রীরামপুর ও চন্দননগর অবধি পৌঁছে দিয়ে বিদায় নিলেন। আমরা চন্দননগরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র

দাস মহাশয়ের বাড়ীতে পূর্ব্ব বন্দোবস্তমত রাত্রি যাপন ক'রে, সেই এক ঘেয়ে রাস্তা ধরে ৪ঠা অক্টোবর বৈকাল প্রায় সাড়ে পাঁচটায় 'বরাকর' এ (১৪৮ মাইল) উপস্থিত হলুম। এবার আমরা গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক-রোড্‌কে বিদায় দিয়ে বাঁ-দিকে পুরুলিয়া যাবার পথটি ধরে নূতন উদ্যমে এগিয়ে যেতে লাগলুম। বরাকর থেকে পুরুলিয়া মোট ৪৬ মাইল।

কিছুদূর এসেই 'শাকটুরিয়া' নামে একটি গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলুম। রাস্তার ধারেই বাজারে পাউরুটির দোকান। কিছু পাউরুটি সংগ্রহ করবার জন্য বাঁশী বাজাতেই সকলে গাড়ী চালান স্থগিত করলে; কিন্তু আমাদের দেখবার জন্য এত লোক চারিপাশে ভীড় ক'রে দাঁড়িয়ে গেল যে, রুটির দোকান পর্য্যন্ত পৌছান দায়। এমন সময় একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হওয়ায়, তাঁর নিকট হ'তে এখানকার রাস্তার সম্বন্ধে অনেক খোঁজ-খবর পাওয়া গেল। পাউরুটি ক্রয় করার পর শাকটুরিয়াকে পিছনে রেখে ছ-মাইল পথ অতিক্রম ক'রে 'দামোদর' নদের ধারে উপস্থিত। এ স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর। অল্পদূরেই খরস্রোতা 'বরাকর' নদী দামোদরে এসে সংযুক্ত হয়েছে। সামনে ও দূরে পাহাড়। সামনে ঐ যে প্রকাণ্ড একটা পাহাড় দৈত্যের মত দাঁড়িয়ে আছে—তারই পাশদিয়ে অস্তমান সূর্য্যদেব পশ্চিমাকাশে সোণার ফাগ্‌ ছড়িয়ে দিয়েছেন। নদীতে সেতু না থাকায়, আমরা পারাপারের জন্য একটি নৌকাতে গিয়ে উঠ্‌লুম। মাঝিও নৌকার কোল ভর্ত্তি ক'রে পরপারে পাড়ি দিলে। বৈকালের স্নিগ্ধ-সমীরণে আমাদের মন নেচে উঠলো; ক্যাপ্টেন একটি গান ধরলে,—

সম্মুখে রাঙা মেঘ ক'রে খেলা,
ওগো তরুণী, বেয়ে চল তরণী নাহি বেলা।...

আমিও না থাকতে পেরে কাঠের বাঁশীটা নিয়ে সুরে সুর মিলিয়ে বাজাতে লাগলুম। গান-বাজনার আসরটা বেশ জমকালো হয়ে উঠেছে, এমন

সময় নীরস প্রাণ বিউগ্‌লার চড়্-চড়িয়ে বিউগ্‌লে 'ফল-ইন্' বাজিয়ে দেওয়ায়, আমাদের কোমল-সুরের আসরটা বিউগ্‌লের কর্কশ-শব্দে যেন আছ্‌ড়ে ভেঙ্গে দামোদরের অতল তলে তলিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম আমরা পারে এসে পড়েছি। বাধ্য হয়ে তরীর স্নেহের বাঁধন ছিঁড়ে তীরে নাগবার জন্ম প্রস্তুত হলুম। নৌকায় পনেরো মিনিট ধরে খুব স্ফূর্ত্তিতে কাটিয়ে এখন দারুণ বালির চড়ায় সাইকেল ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে কতবার যে সব বালিতে গড়াগড়ি দিতে লাগলুম, সে কথা আর বিশেষরূপে উল্লেখ না করাই ভাল। প্রায় এক পোয়া পথ বালির চড়া ভেঙ্গে রাস্তায় এসে উঠ্‌লুম।

এখন আমরা দামোদরের ওপারে বর্দ্ধমান জিলা ফেলে রেখে 'মানভূম' জিলায় উপস্থিত। রাতের অন্ধকার ক্রমশঃ ঘনীভূত হওয়ায়, গাড়ীর আলো জ্বালা হ'ল। দৈত্যমূর্ত্তি পাহাড়টাকে ঘুরে ঘুরে পথের যেন আর ক্লান্তি নাই। ক্রমশঃই নানারূপ বৃক্ষরাজি ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে পথের দু-পাশে জঙ্গল সৃষ্টি করেছে। অন্ধকার জঙ্গলাকীর্ণ পথে পথিকের মনে সান্ত্বনা দিতে কেবলমাত্র উপরের আকাশটায় কয়েকটি তারা ঝক্ ঝক্ ক'রে জ্বলছিল, কিন্তু কয়েকখানা শুভ্র মেঘ কুণ্ডলি পাকিয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে তারকারাশিকে ছেয়ে ফেললে। আমরাও বৃষ্টির সম্ভাবনা বুঝতে পেরে দ্রুতগতিতে গাড়ী চালাতে লাগলুম। ক্রমে ক্রমে সমস্ত আকাশটা মেঘে ভর্ত্তি হয়ে গেল। বিদ্যুতের ক্ষণস্থায়ী তীব্র আলোক এক একবার চোখ গুলিকে ঝল্‌সে কাণা ক'রে দিতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে বজ্রের কড়্‌কড়ানির শব্দ পাহাড়ের উপর হুম্‌ড়ে পড়ে প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো।

এভাবে কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই ঝড়-বৃষ্টি-তুমুল বিক্রমে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গাঢ় মসীময় অন্ধকার রাত্রে এই ভীষণ দুর্য্যোগে নিকটে কোন আশ্রয় না পাওয়ায় ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে জোরে

অথচ সাবধানে এগিয়ে চলেছি, এমন সময়—কর্কশ বাঁশীর স্বর সকলকে থামাতে বাধ্য করলে। থামতেই বিউগ্‌লার বলে উঠলো, "ঐ দেখ দূরে একটা আলো! নিশ্চয় কোন বাড়ী আছে, চল দেখা যাক্।" বাঁ-দিকে আলো লক্ষ্য ক'রে কাছে গিয়ে দেখি একটি 'বাংলো'। একবার ডাকৃতেই একটি ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ইংরেজীতে আমাদের সহিত আলাপ জুড়ে দিলেন। যখন তিনি দেখলেন আমরা বাঙ্গালী, তখন আর না থাকতে পেরে বাইরে এসে তাঁরও মাতৃভাষা বাঙ্গলায় কথা বলে তৃপ্তি লাভ করলেন। তাঁ'র সঙ্গে আলাপ হওয়ায় জানতে পারলুম এ গ্রামের নাম রঘুনাথপুর। ইনি এখানকার 'সব্-রেজিষ্ট্রারার,' এঁর নাম শ্রীযুক্ত শরৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আজ আর আমাদের পুরুলিয়া যাওয়া হ'ল না। রাতটা এখানেই কাটাবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল।

৫ই অক্টোবর :—সকালে আকাশ মেঘে ভর্ত্তি। বেশ বৃষ্টিও পড়ছে। অবিশ্রাম ঠাণ্ডা ভিজে-বাতাস বয়ে চলেছে। বেলা আট্টায় বৃষ্টি একটু কমে আসাতে, আমরা রঘুনাথপুর পরিত্যাগ করলুম। কিছুদূর আসতেই বাঁ-দিকের কালো ছোট পাহাড়টার গা-ঘেঁসে এক ঝাঁক 'বাদ্‌লা' হাঁস ঠিক্ আমাদেরই মত সারি দিয়ে আনন্দের সহিত এই মেঘ্‌লা বেলায় ভাবুকের ভাব জাগিয়ে তুলে, কি সুন্দর ভাবে উড়ে যাচ্ছে! আমাদের নির্দ্দয় প্রাণ কর্পোরালের আর সহ্য হ'ল না। কথা নাই, বার্ত্তা নাই— বাঁশী বাজিয়ে আমাদের গাড়ী চলা স্থগিত ক'রেই, হাঁসগুলার প্রতি বন্দুক উঁচিয়ে গুড়ুম্...ক'রে এক শব্দ ক'রলে। হায়রে, প্রাণীগণের বেঁচে থাকাই আশ্চর্য্য! কর্পোরালের গুলির আঘাতে নিরীহ হাঁসের দল তিনটী সঙ্গীকে ইহজনমের মত বিদায় দিয়ে দিগ্বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত, হ'য়ে দূরে—বহুদূরে উড়ে পালালো। যুদ্ধজয়ী কর্পোরাল আহ্লাদে আটখানা হয়ে লাফাতে লাফাতে পাখী তিনটি সংগ্রহ

ক'রে গাড়ীর হাতলে উত্তমরূপে বেঁধে রাখলে—আবার যাত্রা সুরু হ'ল। পুনরায় কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই দেখা গেল, প্রস্ফুট ফুল ভরা একটি ক্ষুদ্র জলাশয়ের ধারে কতকগুলি পারাবত আপন মনে ক্রীড়াচ্ছলে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। কর্পোরাল এদেরও প্রাণ নাশ করতে দ্বিধা বোধ করলে না। এরূপে যেতে যেতে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নিকট খাবারের দোকান পেয়ে, থামা হ'ল। দোকানে তৈরী জিনিষ কিছুই নাই। সে আমাদের কথামত 'পুরি' বানাতে আরম্ভ করলে এবং কোয়ার্টার মাষ্টার, অর্থাৎ আমি বাধ্য হয়ে তার দোকানের সামনেই—তেল, নুণ, কারী-পাউডার, ছোরা-ছুরি, ডেক্‌চি, চুল্লী প্রভৃতির দ্বারা, সেই—যারা এক সময়ে প্রকৃতির অঙ্গে হাসি ফুটিয়ে তুলতো,—সেই নিরীহ পাখীগুলার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধান করলুম, অবশ্য ক্ষীণ-ক্ষুধা নিবৃত্তির উত্তম উপকরণের জন্য কর্পোরালকে ধন্যবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হইনি।

দু-ঘণ্টা পরে যাত্রা সুরু হ'ল। পথের মাঝে আবার প্রবলবেগে বারি-পতন। নিকটে একটি রেলওয়ে ষ্টেসন দেখতে পেয়ে, তথায় আশ্রয় নেওয়া গেল। ষ্টেসনের নাম 'কুষ্ট্‌নার'। টিকিট ঘরের কাছে ভিজে 'ঢোল' হয়ে একটি বেঞ্চির উপর বসে রবিবাবুর "আজি শ্রাবণ ঘন গহন মোহে" গান ধরেছি এবং গানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কর্পোরাল একটি টুলের উপর বসে বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করেছে, এমন সময়—এক ঝলক বিদ্যুৎ, তার উৎকট আলোয় চারিদিক ঝল্‌সে দিয়ে কড়্‌কড়ানি শব্দের সঙ্গে সঙ্গে কর্পোরালকে টুলের উপর থেকে সজোরে ভূতলে নিক্ষেপ করলে। কি ভীষণ! কর্পোরালের অবস্থা দেখে আমাদের বড়ই ভয় হ'ল; কিন্তু ভগবানের কৃপায় বৈদ্যুতিক আঘাতের প্রাথমিক চিকিৎসার গুণে অল্পক্ষণ পরেই সে টল্‌তে টল্‌তে উঠে বসলো। তার পা থর থর ক'রে কাঁপছে—দাঁড়াবার শক্তি নাই। প্রায় আধঘণ্টা পরে একটু গরম চা পান করাতে সে বেশ সুস্থ হ'ল। ব্যাপারটা পরে বোঝা গেল যে,

কর্পোরাল যেখানে বসে দেওয়ালে ঠেস্ দিয়েছিল, ঠিক্ সেখান দিয়ে 'লাইট্নিং এ্যারেষ্টার' এর তার ভূগর্ভে প্রবেশ করায়, আজ আমাদের কর্পোরালের এরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল।

বৃষ্টি কমে আসতে আবার আমাদের দৌড় আরম্ভ হ'ল। কিন্তু—কি জ্বালা! পুনরায় প্রচণ্ড বেগে বৃষ্টি আমাদের আক্রমণ করলে। উপায়



সাঁওতাল চাষাদের কুটীরে

না দেখে সামনেই এক সাঁওতাল চাষাদের কুটীরে ঢুকে পড়লুম। এরূপ সদল বলে তাদের কুটীরে বিনানুমতিতে প্রবেশ করায়, তারা ত ভয়ে চম্‌কে উঠলো। কিন্তু তাদের কাছে আমাদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করায়, খুসী হয়ে তারা কুটীরের দাবার চাটাই বিছিয়ে বসবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করলে এবং একটি বৃদ্ধা একধামা 'মুড়ি' ও 'ভেলীগুড়' সম্মুখে রেখে তাদের আন্তরিক অতিথি সেবায় আমাদের সত্যই একেবারে মুগ্ধ ক'রে দিলে। আমরা আশ্চর্য্য হলুম বটে; কিন্তু, বিনাবাক্যব্যয়ে তাদের এই আতিথেয়তাকে মাথায় ক'রে নিয়ে, বিদায় কালে কিছু বখ্‌সিস দিয়ে গেলুম। যখন 'পুরুলিয়া' (১৯৪ মাইল) এসে শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ

চট্টোপাধ্যায় এম-এল-সি মহোদয়ের বাড়ীতে উপস্থিত, তখন বৈকাল সাড়ে পাঁচটা। আজ ৺দুর্গাপূজার নবমী—নীলকণ্ঠবাবুর বাড়ীতে যে কি রকম সমাদৃত হলুম, সে কথা বলাই বাহুল্য।

"ফটোগ্রাফারের নব জীবন লাভ"

৬ই অক্টোবর :—আজ বিজয়া দশমী। উৎসবের শেষ দিনে সহরের কয়েকটি স্থানে বাদ্যকরদের প্রাতঃকালীন বাদ্য গুরু-গম্ভীর নাদে নিনাদিত হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে হুইলার্সগণের নিদ্রাভঙ্গ হ'ল। মা আনন্দময়ীকে একবার স্মরণ ক'রে তাড়াতাড়ি অনেক প্রকার গোলযোগের মাঝেও নির্ব্বিঘ্নে জলযোগ সমাপ্ত ক'রে নিলুম। অবশ্য আমাদের মত 'ক্ষীণক্ষুধার' দল এরূপভাবে ভদ্রলোকের অতিথি হওয়া মানে একপ্রকার গোলযোগই বটে। যা'হোক, অনেকের নিকট এ ব্যাপার গোলযোগ —গোলযোগ কেন মহাগলোযোগ; কিন্তু আমাদের নীলকণ্ঠবাবুর নিকট এ যেন মহাযোগ। বেলা আটটার সময় 'রাঁচী'র পথে যাবার জন্য সকলে যখন প্রস্তুত হলুম, তখন নীলকণ্ঠ বাবু আমাদের বললেন, "কখন যদি কোন সাইকেল ভ্রমণকারী এই পথে আসেন—তা'হলে আমার এখানে তাঁদের নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন।"

পুরুলিয়া থেকে রাঁচী ৭৬ মাইল। দুর্গাপুর জঙ্গল থেকে ক্রমাগত উঁচু-নীচু রাস্তা পেয়ে আসছি; কিন্তু এই রাঁচীর পথে রাস্তাটি বেশীর ভাগই চড়াই। পুরুলিয়া থেকে কয়েক মাইল আসতেই পাহাড়ের সারি যেন পরামর্শ ক'রে আমাদের সঙ্গে অগ্রসর হতে লাগলো। সুনীল গগনে সহসা মেঘের আবির্ভাবে সূর্য্যদেব মধ্যে মধ্যে লুক্কায়িত হয়ে আমাদের বারি-ধারায় সিক্ত ক'রে, যেন কৌতুক দর্শন করতে লাগলেন। এরূপ অবস্থায় প্রায় ১৬ মাইল অতিক্রম ক'রে 'গড়জয়পুরে'র গড় দেখবার অভিপ্রায়ে ওভারসিঁয়ার শ্রীযুক্ত তিলকরাম তান্তি মহাশয়ের অনুরোধে তাঁর বাড়ীতেই আশ্রয় নিলুম; তখন বেলা দশটা। তিলকরাম বাবুর বাড়ীতে সাইকেল রেখে জুতো মোজা খুলে গড় দেখতে বেরিয়ে পড়লুম। গড়ের মধ্যে জুতো পায়ে প্রবেশ নিষেধ।

এ স্থানের নাম পূর্ব্বে 'জয়পুর' ছিল, এই গড়টি হয়ে নাম গড়জয়পুর হয়েছে। গড়টি প্রকাণ্ড, পাথরের তৈরী ও নানারূপ বিচিত্র চিত্রে পূর্ণ। তিনশ' বৎসর পূর্ব্বে রাণী বিদ্যাধরী এই গড় নির্ম্মাণ করেন। এখন





গড়জয়পুর, রাজা বিদ্যাসুন্দর সিংহের সহিত হুইলার্সগণ

গড়জয়পুরে, মা' দুর্গা ছেলেপুলে নিয়ে শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছেন

গড়ের অবস্থা দেখলে সত্যই বড় দুঃখ হয়। কোন কোন অংশ মেরামতের

অভাবে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। রাণী বিদ্যাধরীর আমলে এ রাজ্য স্বাধীন ছিল। রাজা ভিক্ষাম্বর সিংহ এখানকার শেষ রাজা ছিলেন। তিনি ৮০ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই রাজার দুই রাণীর ভিতর ছোট রাণী চন্দ্রাবলী এখনও জীবিতা ও তাঁর একমাত্র কন্যার সহিত সিংভূম জিলার 'সরাইকিলা'র রাজবংশের মহেশ্বর সিংহদেবের পুত্র শ্রীযুক্ত বিদ্যাসুন্দর সিংহ দেবের বিবাহ হয়। এখন এখানকার জমিদারী জামাতা বিদ্যাসুন্দর সিংহদেব পরিচালন করেন। আমরা বিদ্যাসুন্দর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে গড় দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তিনি আমাদের এই অদ্ভুত ভ্রমণ-কাহিনী শুনে নিজে সঙ্গে ক'রে গড়ের প্রত্যেকাংশ দেখিয়ে দিলেন। গড়ের মধ্যে ৺মুরলীধর ঠাকুরের মন্দির অবস্থিত। নিত্য তাঁর সেবা হয়ে থাকে।

গড় দেখা সঙ্গে ক'রে 'রাণীবাঁধ' নামে একটি বড় দীঘীতে প্রাণ ভরে একচোট সাঁতার কাটা হ'ল। তিলকরাম বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে দেখি, তিনি অতিথি সেবার জন্য নানারূপ আয়োজন করেছেন। বৈকাল সাড়ে চারটের সময় এখান থেকে যাত্রা করবো, এমন সময় দেখি— দমাদম্, দম্ দমা দম্, দদম্ দদম্ ক'রে এ বৎসরের মত সকলকে কাঁদিয়ে মা'দুর্গা ছেলে পুলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছেন। আমরা মাকে ভক্তিভরে প্রণাম জানিয়ে একটি ফটো তুলে নিলুম। এখানেই আমরা ৺বিজয়ার আলিঙ্গন সাঙ্গ ক'রে বেলা পাঁচটায় রওনা হলুম।

যখন দিনের আলো ক্রমশঃই ম্লান হয়ে এল, তখন 'ঝাল্দা' (২২২ মাইল) পৌঁছলুম। আজ আমাদের 'তুলিন' পর্য্যন্ত যাবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখানকার একজন পশ্চিমদেশীয় হিন্দু লাক্ষা-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত শিব শঙ্কর লালা মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে তাঁ'র বাড়ীতে আমোদে রাত্রি যাপন ক'রে পরদিন বেলা দশটায় দৌড় আরম্ভ করলুম।

৭ই অক্টোবর :—আজ আকাশে মেঘের লেশ মাত্র নাই। বেশ রোদ

উঠেছে। তুলিন পার হয়ে কিছুদূর আসতেই দেখি, 'সুবর্ণরেখা' নদী বিপুল দেহ নিয়ে মন্থর গতিতে ব'য়ে চলেছে। নদীর উপর সেতু থাকায় অনায়াসে পরপারে উপস্থিত হলুম। ওপারে মানভূম জিলা শেষ হয়েছে, এপারে রাঁচী জিলা আরম্ভ। পুরুলিয়া থেকে ৫৩ মাইলে 'জনা'র গভীর জঙ্গল। এবার যতই অগ্রসর হচ্ছি, ততই দেখি যে সুউচ্চ বৃক্ষলতাদি শোভিত পাহাড়গুলি চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান। যেদিকে দৃষ্টি যায়, সে দিকেই প্রকৃতির মনোহর দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে আসে। পাহাড়ের উপর দিয়ে রাস্তা ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে খাড়াই পথে উঠেছে। সতর্ক ভাবে গাড়ীর হাণ্ডল ঠিক্ না রাখলে, একেবারে দুশো-পাঁচশো ফিট্ নীচে গিয়ে পড়তে হবে—কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না। একস্থানে দু-মাইল এত খাড়াই



'জনা'র জঙ্গল, গাড়ীটা পিছু হেঁটে আমাদের নিকট উপস্থিত

যে, শেষ বরাবর গিয়ে সাইকেল থেকে নেমে হাঁট্‌তে হ'ল। এ ভাবে জনার জঙ্গল প্রায় পার হয়ে এসেছি, এমন সময় একটি মোটর গাড়ী পাশ দিয়ে হুস ক'রে বেরিয়ে গিয়ে কিছুদূরে থেমে গেল। তারপর গাড়ীটা পিছু হেঁটে আমাদের নিকট উপস্থিত হ'তেই দেখি, ভিতরে

কয়েকজন কলকাতার সৌখীন বাবু। এঁদের মধ্যে একজন আমার বিশেষ পরিচিত। এঁর নাম শ্রীমান সমরেন্দ্র মোহন ঘোষ। যা'হোক্ এ রকম অপ্রত্যাশিত মিলনে উভয়ে উভয়ের কিছুক্ষণ মুখ চাওয়া-চাওয়ির পর আমাদের ভ্রমণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলতে লাগলো। পরে জানা গেল, তাঁরা 'হুড্রু' জল-প্রপাত দেখবার জন্য রাঁচী থেকে বেরিয়ে ভুল ক'রে হুড্রুর রাস্তা ছেড়ে এই জঙ্গলে হাজির হয়েছেন। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, তাঁদের এই ভুলই আমাদের সাক্ষাতের মূল। আমরা রাস্তার ম্যাপ্ খুলে পথহারাদের পথ বুঝিয়ে দিলে, তাঁরা প্রত্যুপকার স্বরূপ পথ সম্বল কয়েকখানি পাউরুটি উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন।

যখন 'এঙ্গোরা' (২৫৫ মাইল) এসে থানার ইনেস্‌পেক্টর মিঃ প্রেম-প্রকাশ কচ্ছপ মহাশয়ের অতিথি হলুম, তখন বেলা চার-টে। এখান থেকেই হুড্রু জলপ্রপাতে যাবার রাস্তা। এই পথটি ১৪ মাইল। বেলা শেষ, হুড্রুর পথে বড় বন জঙ্গল ; কাজেই বাধ্য হয়ে আজ জলপ্রপাত দেখবার আশা ত্যাগ করতে হ'ল।

৮ই অক্টোবর :—সকাল সাড়ে ছ-টায় হুড্রু দেখতে বেরুলুম। 'ডিসষ্ট্রিক্ট বোর্ডে'র রাস্তা ; গরুর গাড়ী চলে চলে অতি কদর্য্য হয়ে গেছে। যে রাস্তা দিয়ে প্রত্যহ কত শত পথিকের যাতায়াত, আর সেই পথের উপর এখানকার কর্ত্তাদের একেবারেই নজর নেই, এটা বড়ই আশ্চর্য্য। কতবার যে আমরা "পপাত ধরনী তলে' হলুম—তা' বলা বাহুল্য। এ ভাবে অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রে জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করলুম। দু-পাশে দারুণ জঙ্গল—মধ্যে রাস্তা। বেশ যাচ্ছিলুম, হঠাৎ—পথের গতি বক্র-স্থানে পৌঁছে বিউগ্লার অজানিতভাবে গাড়ী হ'তে অবতরণ ক'রেই প্রচণ্ড শব্দে বিউগ্লে 'এলার্ম' বাজিয়ে দেওয়ায়, দু-টি ঘটনা সঙ্গে সঙ্গে ঘট্‌লো। একটি ভীষণ গর্জ্জন! আর দ্বিতীয়টি হুইলার্সগণের পরষ্পর সংঘর্ষণে ভূতলে গড়াগড়ি! ঘটনাটি পরে বোঝা গেল যে, রাস্তার

বক্রস্থানে পৌঁছেই বিউগ্‌লার দেখতে পেলে—তার গাড়ীর প্রায় সাত হাত দূরেই একটি প্রকাণ্ড 'হায়না' (নেকড়ে জাতীয় জন্তু বিশেষ) নির্ব্বিঘ্নে পথের উপর বসে আছে। উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বিউগ্‌লারের বিউগ্‌লের চড়্‌চড়ানি শব্দে, চকিতে ভীষণ এক গর্জ্জনের সহিত ত্রাসিত হায়না এক লম্ফে জঙ্গলের অন্তরালে মিশিয়ে গেল।

এবার আমরা খুব সাবধানে গাড়ীর ব্রেকের প্রতি নজর রেখে, ভয়ে ভয়ে চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে এগিয়ে চললুম। ১২ মাইল অতিক্রম করার পর আর রাস্তা নাই দেখে, গাড়ী হ'তে অবতরণ করলুম এস্থানে কতকগুলি জংলীদের কুটীর অবস্থিত। নিকটবর্ত্তী এক কুটীর হ'তে একটি জংলী আমাদের কাছে এসে লম্বা সেলাম ঠুকে অনেকটা এ ভাবে বলতে লাগলো, "বাবুরো ঝর্‌না যাবি; এনে তোদের গাড়ী রাখ্‌। এ সড়ক্‌ নিয়ে আট্‌পো রাস্তা চল্‌তি হোবেক্‌—আহ্‌মী তোদের সাথে চল্‌বো......।" জংলীর কথায় গাড়ীগুলো কুটীরের মধ্যে রেখে, তার সঙ্গে আমরা পদব্রজে যেতে লাগলুম। সরু ফালির মত হাঁটা পথ জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলেছে। প্রায় এক মাইল পরে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ে নদী কুল কুল ধ্বনিতে প্রবাহিত দেখা গেল। নদীতে কোনরূপ সেতু না থাকায় তথায় উপস্থিত কয়েকজন জংলীর কোলে চ'ড়ে পার হয়ে গেলুম। কোলে ক'রে নদী পারাপার করবার জন্য সর্ব্বদাই এস্থানে জংলীরা হাজির থাকে।

কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় হুড়্‌ হুড়্‌ জলপ্রপাতের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। পৌঁছে দেখি—কি এক চমৎকার দৃশ্য! সুবর্ণ-রেখার বিপুল জলরাশি বিশাল পাহাড়গুলি অতিক্রম ক'রে ভৈরব নাদে নিনাদিত হয়ে প্রায় তিনশ' ফিট্‌ নিম্নে সুবৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের উপর ক্রমান্বয় আছ্‌ড়ে পড়ছে। আহা! তার রূপার মত সাদা ফেনরাশি উচ্চে—বহু উচ্চে বিক্ষিপ্ত হওয়ায়, মনে হয়—পর্ব্বত-ক্রোড় মেঘজালে

আবৃত। বিক্ষিপ্ত বারিকণা সূর্য্যরশ্মি সম্প্রাপ্তে নানাবর্ণে ভূষিত 'রামধনু'র ন্যায় কি এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেছে। আমরা একটি পাথরের উপর অবস্থান ক'রে এই প্রাকৃতিক মনমুগ্ধকর দৃশ্য মনে প্রাণে সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে পান করতে লাগলুম। অনন্তর ঝরণার নীচে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, আমাদের পথপ্রদর্শক বাধা প্রদান করলে। কারণ বৃষ্টির দরুণ পিছল হওয়ায়, দু-দিন পূর্ব্বে এক ইংরেজ এ পথে নাকি নামতে গিয়ে পিছ্‌লে পড়ে এজনমের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনদিন অবিশ্রান্ত বারি পতনে পথটি পূর্ব্বাপেক্ষা পিছল হয়েছে; অগত্যা এই ঘটনা শুনে আমরা নীচে নামবার ইচ্ছা ত্যাগ করলুম। এরূপ বিস্ময়কর বিচিত্র সৌন্দর্য্য উপর হ'তেই দেখে আশা মেটাতে লাগলুম।

ক্রমে কুড়ের বাদশার মত বসে বসে চা'য়ের নেশা চাপলো। অদূরে একটি শাল-বৃক্ষমূলে আমাদের ফটোগ্রাফার শিলাখণ্ডের উপর নতজানু হয়ে নিবিষ্টচিত্তে ছোরার-দ্বারা দুগ্ধ টীনের উপরিস্থ পাত্‌লা টীনের আবরণটি পৃথক করবার চেষ্টা করছে, অকস্মাৎ পথপ্রদর্শক চিত্ত বিভ্রান্তের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে তার প্রতি বলে উঠলো, "বাবো, বাবো, বুঝি 'অজা' তোরে কাট্‌লো রে—'অজা' তোরে কাট্‌লো !" মুহূর্ত্তমধ্যে ফটোগ্রাফার উর্দ্ধে একবার দৃষ্টিপাত ক'রেই বিদ্যুৎবেগে গুঁড়ি মেরে আমাদের নিকট উপস্থিত হ'ল। পথপ্রদর্শকের চীৎকারে ফটোগ্রাফারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ হওয়ায়, কি যে এক ভীষণ দৃশ্য দেখলুন, সে কথা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য !

আমাদের কর্পোরাল নিয়মানুযায়ী এই বিপদ-সঙ্কুল স্থানে পাহারায় নিযুক্ত হ'য়ে নিবিড় বনমধ্যে নিরক্ষণ করতে করতে বোধ হয়—বাঘ, ভালুক ইত্যাদি হিংস্র পশুদের কথাই ভাবছিল; কারণ, সে প্রায়ই আমাদের উপদেশ দিত, যদি কখন ভালুক এসে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে

উপায়ান্তরে ভালুকভায়ার সহিত সে দ্বন্দ্বযুদ্ধে রত হ'বে ও আমরা যেন এরূপ মূল্যবান সময় বৃথা নষ্ট না ক'রে তাদের এই অভাবনীয় দৃশ্যের ফটো তুলতে ব্যস্ত থাকি। যা'হোক্, বাঘ-ভালুক ব্যতীত অনেক প্রকার হিংস্র প্রাণী যে এই বনমধ্য হ'তে আবির্ভাব হ'তে পারে, সে কথা আজ আমাদের কর্পোরাল ঘটনাচক্রে উত্তমরূপে বুঝতে পারলে। 'অজগর' জাতীয় এক বৃহৎ সর্প তার দেহের কিয়দংশ শালবৃক্ষের নিম্নশাখায় কুণ্ডলী পাকিয়ে সম্মুখের দিক প্রায় চার পাঁচ হাত বাড়িয়ে দিয়ে, ফটো-গ্রাফারের মাথার উপর দু-তিন হাত উঁচে ঘড়ির 'পেণ্ডুলামে'র মত দুলছিল—কি সাংঘাতিক! কিন্তু কর্পোরালের গুলির আঘাতে বাছাধন কয়েকটি টুক্‌রায় পরিণত হ'ল।

এরূপ ঘটনার পর আমরা এস্থান পরিত্যাগ ক'রে নাতিদূরে আড্ডা গাড়লুম। প্রায় দশ মিনিটকাল অতিবাহিত হ'বার পর, এবার মনোযোগী কর্পোরাল চমকিত হয়ে আর এক দৃশ্য দেখালে। যে স্থানে ঐ সর্পটিকে ভবপারে পাঠান হয়েছে, তথায় প্রায় ইঞ্চি খানেক চওড়া এবং তিরিশ হাত লম্বা অপর একটি অদ্ভুত কাল রংএর সর্পবিশেষ বন হ'তে বক্রাকারে অনবরতঃ নির্গত হচ্ছে—যেন তার শেষ নাই! কর্পোরাল টোটা ভরা বন্দুক উঁচু ক'রে এই অদ্ভূত সাপটিকে পৃথিবী ছাড়া করবার জন্য যেমনি বন্দুকের ঘোড়ায় অঙ্গুলি স্পর্শ করতে যাবে, আর তখুনি আমাদের ফটোগ্রাফার একটু অগ্রসর হয়ে উচ্চৈঃস্বরে—"ওরে বাবারে" বলেই একটি শ্লোক আওড়ে ফেললে ;—

"কে তুই ভেয়ে ল্যাজ উঁচিয়ে
বেড়াস ঘুরে ফিরে
বড় এলাচের দানা যেমন
তোর তেমনি ল্যাজার গঠন
খেলেও বুঝি ক্যাঁচর ম্যাচর করে।"

আর এই ছড়া শুনে আমরাও আশ্চর্য্য হয়ে নিকটে গিয়ে দেখি—সত্যই, বড় এলাচের দানার মতই ল্যাজগুলো উঁচু ক'রে কালো ডেওপিঁপড়ের দল তিন চার পঙ্‌ক্তিতে বন থেকে অনবরত নির্গত হচ্ছে। কারণ, আমাদের কর্পোরালের কৃপায় তাদের আজ বিরাট সর্প-ভোজ উপস্থিত। নিমিষের মধ্যে এরূপ অদ্ভুত সর্প ডেওপিঁপড়েতে পরিণত হওয়ায়, কর্পোরাল বড়ই ক্ষুণ্ণ হ'ল।

যা'হোক, আমরা এখানে আর বিলম্ব না ক'রে পুনরায় সেই দু-মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম ক'রে জংলীর কুটীর হ'তে সাইকেলগুলি বের করলুম। আজ আমাদের ফটোগ্রাফার জংলী-পথ-প্রদর্শকের সতর্কতায়ই নব জীবন লাভ করলে, তাই জংলীকে সাধ্যমত পুরস্কার দিয়ে বিদায় নিলুম।

"রণচণ্ডী মূর্ত্তি !"

বৈকাল পাঁচটায় রাঁচী (২৯৮ মাইল) পৌঁছে সার্কুলার রোডের উপর দিয়ে স্ফূর্ত্তির সহিত বিউগ্‌লের শব্দে আমরা মাতিয়ে চলেছি। আমাদের দেখে বালক-বালিকা-বৃদ্ধ পর্য্যন্ত বাড়ীর বাইরে এসে উপস্থিত হ'তে লাগলো। হঠাৎ ডান পাশের একটি ক্ষুদ্র বাংলো হ'তে একজন ভদ্রলোক উচ্চৈঃস্বরে আমাদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে পথে আসতেই দেখি—আমার এক ভগ্নীপতি শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়। তিনি যে সপরিবারে এখানে বায়ু পরিবর্ত্তনে এসেছেন, তা' আমরা জানতুম না। শরৎবাবুর সহিত এই আকস্মিক সাক্ষাতে আমাদের যে কিরূপ সুবিধা হ'ল, তাহা বলাই বাহুল্য। এখানে দু-রাত্রি যাপনের জন্য শরৎবাবু বিশেষ অনুরোধ করায়, তাঁর কথা রাখতে আমরা বাধ্য হলুম।

৯ই অক্টোবর :—প্রত্যুষে বিউগ্‌লের শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর সকলে রাঁচী সহরটি পর্য্যবেক্ষণ করতে বেরুলুম। এই সহরটি সমুদ্র-বক্ষ হ'তে দু-হাজার ফিট্ উচ্চে মালভূমির উপর অবস্থিত। অতি সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন। নানারূপ বৃক্ষের সারি প্রশস্ত পথ সমূহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। উদ্যান পরিবেষ্টিত গৃহগুলি বেশীর ভাগই বাংলো ধরণের। এস্থানের আবহাওয়া এত সুন্দর যে, সহরটি এদেশের ছোটলাট বাহাদুরের গ্রীষ্মাবাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। এখানকার 'মোরাবাদী পাহাড়' (Temple Hill) এবং 'পাগলদের হাঁসপাতাল' (Mental Hospital) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহোদয়ের একটি সুন্দর উপাসনা মন্দির ঐ মোরাবাদী পাহাড়ে অবস্থিত ; এই কারণে উহা 'ঠাকুর পাহাড়' নামেও অভিহিত।

পাগলদের হাঁসপাতাল উক্ত পাহাড় হ'তে কিছু দূরেই ও রাঁচী

সহর হ'তে প্রায় ছ-মাইল দূরে 'কাঁকে' নামক স্থানে অবস্থিত। হাঁসপাতালটি ছু-ভাগে বিভক্ত; একটি ভাগে সাহেব পাগল ও অপরটিতে দেশীয় পাগলদের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। সাহেব ও মেম পাগলদের সংখ্যা মোট প্রায় আড়াই-শ' হ'বে, কিন্তু দেশীয় পাগল ও পাগ্‌লীদের সংখ্যাই বেশী—প্রায় দেড় হাজারের উপর। তথায় ডাক্তারের নিকট শুনলুম, প্রত্যেক মাসে না কি ৮।১০টি পাগল চিকিৎসার গুণে ভাল হয়ে যায়। তাদের মধ্যে যারা একটু ভাল হ'তে থাকে, তাদের কোন কোন কাজে নিযুক্ত করা হয়; যেমন—কাপড় বোনা, জুতো সেলাই, গান-বাজনা, লাইব্রেরীতে পড়াশুনা ইত্যাদি। প্রত্যহ বৈকালে হাঁসপাতাল কম্পাউণ্ডে'র ভিতর স্নিগ্ধ বায়ু সেবনের জন্য তাদের ছাড়া হয়। কম্পাউণ্ডের চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত; কারণ কোন কোন দুরন্ত পাগল সুবিধা পেলেই পালাবার চেষ্টা করে। এখানকার প্রত্যেক 'ওয়ার্ড' পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। আজকাল ইহাদের চিকিৎসা নূতন ও আধুনিক উপায়ে হয়ে থাকে। পূর্ব্বের মত বেঁধে রাখা, কিংবা কোনরূপ জোর জবরদস্তিতে শাসন ক'রে চিকিৎসা করা বন্ধ হয়ে গেছে। বাস্তবিক, এখানকার কর্ত্তারা অর্থাৎ চিকিৎসকেরা যে কি ক'রে এতগুলা পাগলের সঙ্গে চিরকাল বাস করছেন, তাই ভেবে আশ্চর্য্য হতে হয়। এই পাগলদের সঙ্গে থেকে 'পাগলে'র চিকিৎসা করা মানে নিজেদেরও পাগল ক'রে তোলা। এরূপে রাঁচী সহর দেখা সাঙ্গ ক'রে শরৎবাবুর বাসায় ফিরে এলুম।

১০ই অক্টোবর:—রাঁচী থেকে রামগড় হয়ে হাজারিবাগ (৫৮ মাইল), লোহার ডাগা (৪৭ মাইল), পুরুলিয়া (৭৬ মাইল), চক্রধরপুর (৭৫ মাইল) ইত্যাদি কয়েকটি স্থানে বিস্তৃত বনভূমি ভেদ ক'রে উত্তম পথ সমূহ প্রসারিত। প্রায় সকল পথেই আজ-কাল 'মোটর-বাস্' যাতায়াত করে। এই সকল অঞ্চল কেবল পাহাড় ও জঙ্গলে পূর্ণ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই

মন-মুগ্ধকর। যে দিকে দৃষ্টি যায়, কেবল ক্রোশের পর ক্রোশ অরণ্য-শ্যামল পাহাড় শ্রেণী। ইহাই আজ সাধারণের নিকট 'ছোটনাগপুরের জঙ্গল' এবং 'সারান্দার সাতশত পাহাড়' নামে অভিহিত। এই সকল দুর্ভেদ্য বিস্তীর্ণ অরণ্য মধ্যে নরমাংস-লোলুপ ব্যাঘ্র, হস্তী, বাইসন, শম্বুর, ভল্লুক, চিতল, হায়না, নীলগাই, হরিণ, ময়ূর, কুক্কুট, প্রভৃতি বন্য-পশুপক্ষীর বাস ব্যতীত সাঁওতাল, কোল, হো এবং ওঁরাও জাতীয় আদিম অধিবাসীগণ এখনও পর্য্যন্ত বন মধ্যে প্রতিপালিত হয়ে জীবন যাপন করছে। এই পাহাড়ী অঞ্চলে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করদরাজ্য বর্ত্তমান। অরণ্য হ'তেই ইঁহাদের আয় অধিক; অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে শাল কাঠ্ এবং অন্যান্য প্রকার কাঠের দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রে থাকেন।

প্রত্যুষে উচ্চ নিনাদে বিউগ্‌লের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হুইলার্সগণ রাঁচী পরিত্যাগ ক'রে 'চক্রধরপুর' অভিমুখে ধাবিত হ'ল।

রাঁচীর ক্ষুদ্র উপত্যকা পার হয়ে পুনরায় অসংখ্য পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে এসে পড়লুম। রাস্তা কিছুদূর পর্য্যন্ত উৎরাই। আশে পাশে জঙ্গল। এভাবে ২৩ মাইল অতিক্রম পূর্ব্বক 'খুঁটি'তে নবেন্দ্রবাবু উকিলের বাড়ীতে বিশ্রাম নিয়ে বেলা তিনটের সময় আবার যাত্রা করলুম। উঁচু নীচু পথ অতিক্রম করতে করতে হঠাৎ একটি বিশাল পাহাড় পথরোধ ক'রে দাঁড়ালো, যেন সম্মুখে আর পথ নাই। কিন্তু নিকটস্থ হ'তেই দেখি, পাহাড়টি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে ক্ষুদ্র গিরি-শঙ্কটে পরিণত হয়েছে। দু-পাশে প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান পাহাড়ের অভ্যন্তরে পথটি সল্পালোকে আলোকিত। এরূপ গিরি-শঙ্কটে অকস্মাৎ যদি ব্যাঘ্র কিম্বা হস্তী মহাশয়দের আবির্ভাব হয়, তাহলে আর পালাবার উপায় নাই। অতএব গিরি-শঙ্কটে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বিউগ্‌লার খুব জোরে বিউগ্‌লে ফুৎকার দিতে লাগলো। এভাবে পনেরো মিনিটের পর যেমনি

গিরি-শঙ্কট অতিক্রম ক'রে বাইরে এসেছি, তখন সম্মুখে এক মহা-সঙ্কট উপস্থিত দেখে বাধ্য হয়ে গাড়ীর গতিবেগ সংযত করলুম।

ডান পাশে একটি ভুট্টার ক্ষেতে কতকগুলি জংলী স্ত্রী-পুরুষ কাজ-কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল; হঠাৎ এরূপ মূর্ত্তি দেখে তারা 'রণ-চণ্ডী-মূর্ত্তি' ধারণ পূর্ব্বক ধনুকে তীর চড়িয়ে এক সঙ্গে আমাদের প্রতি লক্ষ্য ক'রে ঘুরে দাঁড়ালো। কি জানি—যদি তাদের অব্যর্থ বাণে পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ হয়, এই ভেবে আমরা হাসি-খুসি ভাব দেখিয়ে তাদের প্রতি নানারূপ ইসারা করায়, আমরা যে শত্রু নই বুঝতে পেরে উত্তোলিত ধনুর্ব্বাণ পুনরায় পৃষ্ঠদেশে ন্যস্ত করলে।

পথে কতই জংলী দেখছি; কিন্তু আজ আর এক নূতন ধরণের চোখে পড়লো। এদের দেহ বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট ও কৃষ্ণবর্ণ। পরণে নেংটী কিম্বা শর কাঠির বোনা একপ্রকার কৌপীন বিশেষ, কাঁধে তুণ এবং হাতে ধনুক। মাথার চুল বাব্‌রী হয়ে কাঁধে এসে পড়েছে। যা'হোক, আমরাও অভয় পেয়ে এদের নিকটস্থ হয়ে নানারূপ প্রশ্ন করতে লাগলুম; কিন্তু এরা না বুঝতে পেরে আশ্চর্য্যভাবে আমাদের মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল। যত জিজ্ঞাসা করি এখানে বাঘ আছে কিনা—এরা ত হেসেই লুটোপুটি। হিন্দী, বাংলা ইত্যাদি কোন ভাষায়ই বোঝাতে না পেরে, আমি তখন হামাগুড়ি দিয়ে বাঘের ডাক নকল করতেই, এরা স্ফূর্ত্তির সহিত উচ্চৈঃস্বরে হাস্‌তে হাস্‌তে বলতে লাগলো, "হঃ হঃ বাঘোঁ মিনাকো—হঃত্তি মিনাকো—ভলুই মিনাকো......ইত্যাদি।" এর মানে এখানে বাঘ, হাতি, ভালুক সবই আছে। প্রায় ত্রিংশতি বৎসরের একটি স্বভাব-সরলা যুবতী নগ্নদেহে কেবলমাত্র একটি কৌপীন পরিধান পূর্ব্বক আমার স্কন্ধে কোমল কর স্পর্শ ক'রে ডান দিকে গভীর অরণ্য মধ্যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে তাদের ভাষায় কত কি যে বলে গেল, তার সকল অর্থ বোঝা ভার। ভাবার্থ এই যে, ঐ বনে বড় বড় বাঘ আছে, তোমরা যদি এখনই যাও তাহলে দেখতে পাবে।

এরূপ ইসারায় ও নানা ভঙ্গিতে উভয় দলের অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, ক্যাপ্টেন যাত্রার জন্য হুইসিল দিলে ;—সঙ্গে সঙ্গে বিউগ্‌ল বেজে উঠ্‌লো। তৎক্ষণাৎ কয়েকজন জংলী অবাক্ হয়ে বিউগ্‌লটি দেখবার জন্য বিউগ্‌লারের নিকট উপস্থিত। বিউগ্‌লার এদের হস্তে বিউগ্‌লটি সমর্পণ করলে। এরা উল্টে পাল্টে তিন মিনিট ধরে ত নিরীক্ষণ ক'রে গম্ভীরচালে সেটি ফেরৎ দিলে ; যেন এই কয়েক মিনিটে বিউগ্‌লের সকল ব্যাপার বুঝে নিয়েছে। জংলীদের নিকট বিদায় নিয়ে সন্ধ্যা ছ-টায় একটি ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম ক'রে 'সিংভূম' জিলায় পড়লুম ও 'বাধগাঁও' এ (৩৫০ মাইল) উপস্থিত হয়ে সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার মিত্র মহাশয়ের অতিথি হলুম।

পাহাড়ের উপর বাধগাঁও গ্রামটি অতি ক্ষুদ্র। ভদ্রলোকের ভিতর ডাক্তারবাবু ব্যতীত সবই জংলীর বাস। ইংরেজ-রাজ এই সকল জংলীদের সভ্যতার পথে আনবার জন্য এখানে এই দাতব্য চিকিৎসালয়ের সৃষ্টি করেছেন ; কিন্তু কেহই এই চিকিৎসা লাভের জন্য প্রয়াসী নয়। সরকারের নিয়োজিত ব্যক্তিগণের দ্বারা কোন সময়ে এই সকল অবুঝ জংলীদের খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হয়। অবশ্য এরা অনেকেই খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে বটে, কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষার্থে নিয়মানুযায়ী ক্রিয়া কর্ম্মের ধার ধারে না। অতএব এদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোদের চিরন্তন প্রথাই বজায় থাক, কিন্তু তোরা হচ্ছিস 'খৃষ্টান'। সেজন্য এদের জিজ্ঞাসা করলে বলে থাকে—"মঃ খীস্‌তান্"। হায়রে অবুঝ! তোদের খৃষ্টানত্ব যে কোথায় তার ঠিক্ নাই, আর তোরা জোর-জবর-দস্তিতে খীস্‌তান্—এ বেশ মজা বটে!

আমাদের পেয়ে ডাক্তারবাবু বিশেষ আনন্দ লাভ করলেন ; কারণ ইনি কদাচিৎ বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ পেয়ে থাকেন। এঁর এটা বড়ই বাহাদুরী

যে, কি ক'রে এই নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে বন্দীর ন্যায় বাস করছেন। আমরা ডাক্তারবাবুর নিকট পথে 'রণ-চণ্ডী-মূর্ত্তি' ধারী জংলীদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গল্প করায় জানতে পারলুম, এ অঞ্চলের জংলীরা 'হো' এবং 'ওঁরাও' জাতি। এ পথে নাকি আমাদের পূর্ব্বে কখনও এরূপ ভাবে সাইকেল কিংবা পদব্রজে ভ্রমণকারীর দল যায় নাই; সেজন্য হঠাৎ আমাদের আবির্ভাবে তারা ভয় পেয়ে রণ-চণ্ডী-মূর্ত্তি ধারণ করেছিল।

আজকাল উক্ত জংলীদের মধ্যে কেহ কেহ একেবারে সভ্য হয়ে সরকারের চাকুরী করছে। সভ্যলোকের বাস থেকে যারা অনেক দূরে, অর্থাৎ এই সকল স্থানে বসবাস করে, তারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পরণে কৌপীন কিংবা শরকাঠি বা গাছের পাতা বুনে কৌপীনের ন্যায় তৈরী ক'রে লজ্জা নিবারণ ক'রে থাকে। এদের এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে একজন ক'রে মোড়ল বা সর্দ্দার থাকে। এই সর্দ্দারকে এরা খুব মান্য ক'রে চলে। এরা ধান, ভুট্টার চাষ করে এবং বনের মধু, গালা, ফলাদি সংগ্রহ ক'রে নিকটস্থ কোন হাটে বিক্রয় করে। সর্দ্দারের নিকট এরা জমির খাজনা দিয়ে থাকে ও সর্দ্দারের নিকট হ'তে স্থানীয় রাজারা কর আদায় করেন।

এদের বিবাহ প্রথা ও অতিথিসেবা উল্লেখ-যোগ্য। বিবাহযোগ্যা মেয়েদের কোন এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে অনেক লোকের সমাগম হয়। বিবাহার্থী যুবকদের ভিতর যে সকলের পূর্ব্বে মেয়েদের মধ্যে একজনকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, সেই তাকে বিবাহ করে। সেই সময়ে মেয়ের বাপ গরু, মুরগী ও জমি বরের কাছে দাবী করে। যদি বর সেই সব দ্রব্য-সামগ্রী দিতে রাজি হয় তবেই বিবাহ হয়, নচেৎ বিবাহ ভাঙ্গিয়ে দিয়ে, মেয়েকে নিয়ে বাপ চলে যায়। এদের মধ্যে বিধবা বিবাহ একটি মজার ব্যাপার। যে বিধবার পুত্র কন্যা বর্ত্তমান, তাদের বিবাহের সময় বরের নিকট হ'তে বেশী জিনিষ দাবী

করা হয়; কারণ এই সব বিধবা মেয়ের আদর খুব; তাদের 'সংসার-জ্ঞান' আইবুড়ো মেয়ে অপেক্ষা অনেক বেশী।

এ ছাড়া এরা খুব অতিথিপরায়ণ। সহরের কৃত্রিমতার বিষ এখনও এখানে প্রবেশ করে নাই। এরা খুব সরল ও নিরীহ। যদি কোন বিদেশীলোক এদের গ্রামে এসে পড়ে, এরা তার কাছে এসে নানারূপ ভঙ্গিতে আলাপ পরিচয়ের পর চাল, ডাল ইত্যাদি দিয়ে একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় দেয়।

"টেলিগ্রামযোগে দুঃসংবাদ !"

১১ই অক্টোবর :—ডাক্তারবাবুর আতিথ্যে মুগ্ধ হয়ে সকালে সাড়ে সাতটায় বাঁধগাঁও পরিত্যাগ করলুম। কিছুদূর হ'তেই ভীষণ খাড়া চড়াই প্রায় আট মাইল ধরে চললো। পাহাড়ের গা-কেটে রাস্তা তৈরী করা হয়েছে। প্রায় সাত আট হাত চওড়া রাস্তা সর্পগতির ন্যায় বক্রাকারে ঘুরে ঘুরে চলেছে। দূর থেকে মনে হয় আর বুঝি পথ নাই। এই পথ অতিবাহিত করতে বেশ গলদ্‌ঘর্ম্ম হ'তে হয়। এবার ছোটনাগপুরের নিবিড়ারণ্য ৪৪ মাইল এ (রাঁচী থেকে) আরম্ভ হ'ল। এই ভীষণ পার্ব্বতীয় বিস্তৃত অরণ্য—পথে ১৯ মাইল পড়ে। চতুর্দ্দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য এত সুন্দর যে, তা' বর্ণনা করতে হ'লে নানারূপ মনমুগ্ধকর-দৃশ্য একত্রে মানস-পঠে অঙ্কিত হয়ে আমার মত ক্ষুদ্র ভাবুক লেখকের মন এত তোল-পাড় ক'রে দেয় যে, তার খেই খুঁজে পাই না।

যতদূর লক্ষ্য হয়, অনন্ত সমুদ্রের ন্যায় ঘন বিন্যস্ত বৃক্ষাদি ফুল-ফলে সজ্জিত হয়ে প্রস্ফুট দিবালোকে ঘন ছায়ায় পথ অন্ধকার ক'রে কত যুগ-যুগান্তর ধরেই না অবস্থান করছে। নির্জ্জনতা ও নীরবতার ভিতরে আমাদের পথসাথী 'সাইকেলের' কির্ কির্ শব্দ ব্যতীত মধ্যে মধ্যে অজানিত পক্ষীর ঝঙ্কারে অরণ্যের নিস্তব্ধতা আলোড়িত হয়ে উঠছে। এরূপে পথটি পাহাড়ের পর পাহাড় ও ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী অতিক্রম ক'রে চলেছে। এক পাহাড় থেকে অপর পাহাড়ে গমনাগমনের জন্য কাঠের সেতুর দ্বারা সুবিধা করা হয়েছে। পাশে অতল খাদ—ঘোর অন্ধকার! তাকালে মাথা ঘুরে যায়। কত যে ক্ষুদ্র ঝরণা বক্রাকারে পাহাড়ের গা বেয়ে মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করতে করতে ঐ সকল খাদে পতিত হচ্ছে, তার আর সংখ্যা নাই। প্রকৃতিদেবীর চঞ্চল সৌন্দর্য্যে অঙ্গরাগ অনুলেপনের জন্যে স্থানে স্থানে অনতি-গভীর খাদের ভিতর ময়ূর ও

হরিণ নিশ্চিন্ত মনে ক্রীড়া-কৌতুকে ব্যস্ত। শোনা যায়, মাঝে মাঝে দিনের বেলাও পরিশ্রান্ত পথিক মহাশয়দের সহিত আলিঙ্গন করবার জন্য ব্যাঘ্র ও ভল্লুক মহাশয়রা বন-মধ্য হ'তে আবির্ভূত হন। সুতরাং আমরাও প্রতি মুহূর্ত্তে এ রকম একটা মাহেন্দ্র সুযোগের আশঙ্কা করতে লাগলুম। কিন্তু আমাদের কপালগুণে তাঁদের মধ্যে কেহই আমাদের আলিঙ্গন-বদ্ধ করতে এলেন না। এ বন-মধ্যে 'প্যান্থার' জাতীয় (অনেকটা চিতাবাঘের মত) এক প্রকার ভয়ানক হিংস্র জন্তু বাস করে, তারা বৃক্ষোপরি বিরাজ করে। ক্লান্ত পথিকেরা যখন বৃক্ষমূলে বিশ্রামলাভের জন্য আশ্রয় নেয়, তখন নাকি ঐ বিচিত্র-ব্যাঘ্র মহাশয় গাছ থেকে নেমে তড়াক্ ক'রে এক লম্ফে পথিককে স্কন্ধে নিয়ে অরণ্যান্তরালে প্রবেশ করেন।

এই ভয়ঙ্কর ১৯ মাইল জঙ্গলের চারটি নাম আছে,—কার্কা, হেসাডী, চাকী ও টেবো। এরূপে দারুণ চড়াইয়ের পর হঠাৎ আমরা অতল উৎরাইয়ে নামতে সুরু করলুম। এ উৎরাই সমানে ১৪ মাইল ধরে চলেছে। আমরা খুব সাবধানে গাড়ীর ব্রেক্ কষ্‌তে কষ্‌তে ঘোরা পথ দিয়ে ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে নীচে সমতল ভূমির দিকে অবতরণ করতে লাগলুম। হঠাৎ ডানপাশে একঝাড় আতাগাছ ফলভরে নত হয়ে পড়েছে দেখে, আমরা আর লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। গাড়ী চালানো বন্ধ ক'রে ফটোগ্রাফার ও কর্পোরাল আপনাপন ছোরার দ্বারা বড় বড় 'আতা' সংগ্রহ ক'রে নিয়ে এল। কিন্তু নিরাশ হয়ে দেখি, সব আতাই ডেও পিঁপড়েগুলিকে আশ্রয় দিয়ে ফুলে রয়েছে। তথাপি আতাগুলি নিস্তার পেল না, যেন-তেন-প্রকারেণ গলাধঃকরণ করা গেল। আবার দৌড়—

৬২ মাইল পাথরের (রাঁচী থেকে) নিকট নিবিড় বন অতিক্রম ক'রে ক্রমশঃ উপত্যকায় নেমে 'নাকৃতী' নামক ক্ষুদ্র একটি

গ্রাম পাওয়া গেল। এখানে একটি 'ইন্সপেক্সন বাংলো' অবস্থিত। অরণ্য বেষ্টিত পাহাড়গুলি পিছনে পরিত্যাগ ক'রে এসে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে পথটি সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণে অত্যন্ত উত্তপ্ত হওয়ায়, সাইকেল চালাতে একটু কষ্টবোধ হ'তে লাগলো। অতঃপর বেলা বার-টায় 'চক্রধর-পুর' পৌছতেই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। এখানে মধ্যাহ্নে বিশ্রামের পর সান্ধ্য সমীরণে উৎফুল্লচিত্তে পুনরায় পনেরো মাইল বনপথ অতিক্রম ক'রে 'চাইবাসায়' (৪০০ মাইল) শ্রীযুক্ত আশুতোষ গুই মহাশয়ের গৃহে রাত্রিতে বিশ্রাম নেওয়া গেল।

১২ই অক্টোবর :—চাইবাসা থেকে ৩৮ মাইল দূরে ভিন্ন একটি পথ 'টাটানগর' পর্য্যন্ত গিয়েছে। তথায় পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বিখ্যাত লোহার কারখানা অবস্থিত। আমরা পূর্ব্ব হ'তেই ঐ কারখানা দেখবার জন্য ঠিক্ করেছিলুম। অতএব বেলা সাড়ে ন-টার সময় সকলে 'মেন' রাস্তা ছেড়ে রেখে বাঁ-দিকের পথ ধরে টাটানগরে রওনা হলুম। রাস্তা বেশ সুন্দর, দু-পাশে ধানের ক্ষেত। ধানের শিষগুলি মৃদু বাতাসে হেলে দুলে যেন তালে তালে নৃত্য করছে। কালো কালো হৃষ্ট-পুষ্ট জংলী রাখালের ছেলেরা গরু-বাছুরের পাল মাঠে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তমনে মহুয়া-বৃক্ষমূলে বসে, কাঠের বড় বড় বাঁশীতে তান ধরেছে। উঁচু নীচু পথ বিস্তৃত প্রান্তর ভেদ ক'রে চলেছে। মাঝে মাঝে দু-একটা ছোট বড় পাহাড় যেন বোঁ বোঁ ক'রে আমাদের পিছন দিকে ছুটে পালাচ্ছে।

কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই বিউগ্‌লে 'এ্যালার্ম' বেজে উঠায়, সকলে গাড়ী হ'তে অবতরণ করলুম। সম্মুখে দেখি—'খড়্‌কাই' অর্থাৎ 'খরকায়া' নদী শান্তভাবে মৃদু-মন্থর গতিতে বয়ে চলেছে। এ বৎসরের বন্যায় নদীর সেতু ভেঙ্গে গেছে। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামগুলির অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয়। এ অঞ্চলের পাহাড়ী নদীগুলি বর্ষাকালে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রে কত

লোকের যে কত ক্ষতি করে, তার অন্ত নাই। কিন্তু এখন শান্ত-শিষ্ট-গোবেচারা, যেন কিছুই জানে না। নদীর উপর কোন প্রকারে পারাপারের জন্য নূতন সেতু (Cause way) নির্ম্মাণ করা হয়েছে, আমরা তার উপর দিয়ে পদব্রজে সাইকেল সমেত নদী পার হলুম।

পুনরায় সাইকেলে আরোহণ ক'রে দ্রুত গতিতে ছুটতে লাগলুম। এরূপে কত যে ছোট ছোট গ্রাম পার হ'য়ে চললুম, তার আর লেখাযোখা নাই। পথে এক স্থানে পাখী শিকার হ'ল; একটি গাছতলায় অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে পাখীর মাংস পুড়িয়ে উদরানল নির্ব্বাপিত ক'রে পুনরায় রওনা হলুম। ক্রমেই টাটানগরের নিকটস্থ হ'তে লাগলুম। কিছুদূর আসতেই মেঘমালার ন্যায় সুবিখ্যাত কারখানার ধূমরাশি দেখা গেল। তারপর দু-টো, চারটে ক'রে কালো কালো অসংখ্য চিম্‌নী দেখা গেল। ক্রমশঃ রেলওয়ে ষ্টেশনের ঘর-বাড়ী, বাঁ-দিকে ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণীর ন্যায় কারখানার অগণিত টিনের গৃহ-ছপ্পর দেখা গেল। অবশেষে ৩-১৫ মিনিটে টাটানগরে (৪৩৮ মাইল) এসে উপস্থিত হলুম।

পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী 'বর্ম্মা-মাইন্সে' আমার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উমাপদ নন্দী মহাশয়ের কোয়ার্টার্সে গিয়ে উঠ্‌লুম। এই সুবৃহৎ 'কলের সহর' দেখবার অভিলাষে এখানে দু-রাত্রি যাপন করা ঠিক হ'ল। ক্রমশঃই আমাদের আগমন বার্ত্তা সহরবাসীদের কর্ণগোচর হওয়ায়, অনেকেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য আসতে লাগলেন। 'সিভিল ইঞ্জিনীয়ার' শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র মুস্তোফী মহাশয়ের বাড়ীতে আগামী কল্য রাত্রের জন্য আমরা নিমন্ত্রিত হলুম।

১৩ই অক্টোবর:—টাটানগরে কারখানা বলতে মনে হয়, তথায় কেবলমাত্র টাটার কারখানাই অবস্থিত। কিন্তু টাটার কারখানা ব্যতীত এস্থানে ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর কারখানাও আছে। স্বর্গীয় মাননীয় জামসেদ-জী-নাশারোয়াঞ্জী টাটা কর্ত্তৃক এই সুবৃহৎ কারখানার সৃষ্টি।

ইনি একজন পার্শী। পূর্ব্বে এস্থানের নাম 'সাক্‌চী' ও রেল-ষ্টেসনের নাম 'কালীমাটি' ছিল। এখন জামসেদ-জী-টাটার নামে ষ্টেসনের নামকরণ হয়েছে 'টাটানগর'। ধলভূম রাজার নিকট হ'তে জামসেদ-জী কারখানা প্রতিষ্ঠিত করবার অভিপ্রায়ে ৯৯ বৎসরের জন্য এই বিশাল জমিদারী ইজারা স্বরূপ গ্রহণ করেন। সুবৃহৎ কারখানার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে লোকালয় বা সহরের সৃষ্টি করা হয়েছে। সুবর্ণরেখা নদীর নিকটে সাক্‌চী গ্রামটি অবস্থিত ছিল। এখন ঐ স্থানে সহর বসায় 'এল্‌-টাউন' নামে অভিহিত। এল্‌-টাউনের নৈর্ঋৎ কোণে প্রায় দেড় মাইল দূরে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোকালয়টি 'জামসেদপুর' নামে খ্যাত; এ অঞ্চলের মধ্যে জামসেদপুরে বিষ্ণুপুর বাজারটি প্রকাণ্ড। এখানে প্রত্যেক সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবারে হাট বসে। রবিবারের হাটে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে দ্রব্য-সামগ্রী বহুদূর হ'তে আমদানী হয়।

জামসেদপুর থেকে রেল ষ্টেসন প্রায় তিন মাইল ও 'গোলমুরী' প্রায় চারমাইল। গোল-মুরীতে 'টিন-প্লেট্‌-কোম্পানী'র কারখানা অবস্থিত। এই কারখানায় লোহার চাদরে টিনের কলাই করা হয়; কারখানাটি ক্ষুদ্র নহে, এই কারখানার জন্য গোলমুরীতে ক্ষুদ্র সহরের সৃষ্টি হয়েছে। গোলমুরীর নিকটেই 'এগ্রীকালচার কোম্পানী'; এখানে চাষ-বাসের যাবতীয় যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। উক্ত কোম্পানীর অবস্থা শোচনীয় হওয়ায় কারখানা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল, অধুনা টাটার অধীনে ঐ কারখানা পুনরায় চালিত হয়েছে। রেল-ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী 'বর্ম্মা মাইন্স'; পূর্ব্বে 'বর্ম্মা-জিঙ্ক্‌-কোম্পানী' এস্থানে একটি কারখানা নির্ম্মাণ করেছিল; কিন্তু কোন কারণ বশতঃ টাটার সঙ্গে বিবাদ ঘটে ও মোকর্দ্দমায় পরাজিত হওয়ায়, উক্ত কোম্পানী এ স্থান হ'তে বিলুপ্ত হয়। এক্ষণে তাদের পরিত্যক্ত 'কোয়ার্টার্স' সমূহে টাটার কয়েকজন কর্ম্মচারী বাস করছেন এবং এস্থানটি এখন একটি ক্ষুদ্র সহরে পরিণত করবার জন্য টাটা

কোম্পানী কর্তৃক অনেক নূতন নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা হচ্ছে। এই বর্ম্মামাইন্সের নিকটে 'ইণ্ডিয়ান-কেবল্-কোম্পানী'; এখানে ইলেকট্রিকের যাবতীয় তামার তার তৈরী করা হয়। এই কারখানার কিছুদূরেই 'ওয়্যার-প্রডাক্ট-কোম্পানী'; এখানে পেরেক, গজাল ইত্যাদি তৈরী হয়। ইহার অনতিদূরে 'ইণ্ডিয়ান-পেনিনসুলার-লোকোমটিভ-কোম্পানী'; এখানে লোকোমটিভ 'এঞ্জিন্'এর অংশ ও বগিগাড়ী তৈরী ও মেরামতাদি হ'য়ে থাকে। টাটার বিস্তৃত জমিদারীর অন্তর্গত উপরিউক্ত কারখানা-গুলি টাটার সুবৃহৎ কারখানা হ'তে প্রেরিত বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা চালিত।

টাটার কারখানা প্রতিষ্ঠিত হ'বার পূর্ব্বে এ স্থান অতি ভয়ঙ্কর বাঘ-ভালুক ভরা জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। কারখানা নির্ম্মাণকালে কত লোক যে বন্য-জন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে ইহজনমের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে—তার সংখ্যা নাই। এখন যদিও বন্য-পশুদের আক্রমণের ভয় দূরীভূত হয়েছে, তথাপি এই বৃহৎ কারখানায় কাজ করতে করতে দুর্ঘটনা বশতঃ প্রত্যহই বহুলোক হতাহত হচ্ছে। নানা জাতীয় অসংখ্য ব্যক্তি এখানে কাজ করে। দিবা-রাত্রি নানারূপ শব্দে মুখরিত হ'য়ে কারখানা চলছে ত চলছেই—যেন তার বিরাম নাই। এখানে কারখানা করার উদ্দেশ্য, লোহার পাথর, কয়লা প্রভৃতির খনি অতি নিকটে।

টাটানগর জায়গাটি বড় চমৎকার। চারিদিকে পাহাড়; সম্মুখে 'দলমা' পাহাড় তার বিশাল দেহ বিস্তার ক'রে নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। সহরের অনতি দূরে সুবর্ণ-রেখা ও খরকায়া নদীর সঙ্গম স্থলের দৃশ্য বড়ই মন মুগ্ধকর। আমরা আজ প্রাতে দ্বিচক্রযানে আরোহণ ক'রে এই সকল রমণীয় স্থান, ভিন্ন ভিন্ন কোম্পানীর উপরিউক্ত কয়েকটি কারখানা এবং সহরাদি দর্শন পূর্ব্বক বেলা প্রায় সাড়ে বারোটায় জামসেদপুর পোষ্টআফিসে কলকাতা থেকে কোন পত্র এসেছে কিনা দেখবার জন্য

উপস্থিত হলুম। আমাদের কয়েকটি স্থানে পোষ্ট-মাষ্টারের তত্ত্বাবধানে পত্র পাঠাবার জন্ম পূর্ব্ব হ'তে নির্দ্দেশ করা ছিল। আজ এখানকার পোষ্ট-আফিসে অনুসন্ধান করায়, আমাদের বিউগ্‌লারের নামে একটি 'টেলি-গ্রাম' দেখেই আমরা চম্‌কে উঠ্‌লুম; কারণ বাঙ্গালীর টেলিগ্রামে দুঃসংবাদ ব্যতীত সুসংবাদ বড় একটা আসে না। ঘটলোও ঠিক তাই,—বিউগ্‌লার টেলিগ্রামের পত্রটি পাঠ ক'রে অতি বিমর্ষভাবে আমাদের হাতে অর্পণ করলে। আমরা পত্রপাঠে কিরূপ চমকিত ও দুঃখিত হলুম, সে কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বিউগ্‌লারের মধ্যম ভ্রাতা হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়, আজ তাকে বাধ্য হ'য়ে ভ্রমণে-ভঙ্গ দিয়ে কলকাতায় রওনা হ'তে হ'বে। বড়ই দুঃখের বিষয়! এ দুঃসংবাদে আজ আমাদের সকলের মনই বিচলিত হ'য়ে উঠ্‌লো। অগত্যা বর্ম্মা মাইন্সে নন্দীবাবুর বাসায় ফিরে এলুম। বৈকালে কোথাও আর বেরুনো হ'ল না: রাত্রে কলকাতার গাড়ীতে আমাদের 'বিউগ্‌লার' মণিলাল গুঁইকে তুলে দিয়ে, ভগ্ন হৃদয়ে জামসেদপুরে প্রবোধচন্দ্র মুস্তোফী মহাশয়ের বাড়ীতে কোন রকমে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রে এলুম।

১৪ই অক্টোবর:—আজ খুব প্রত্যুষে টাটার কারখানা দেখতে বেরুলুম। প্রায় বেলা একটা পর্য্যন্ত ঘুরে ঘুরে সুবৃহৎ কারখানার কিয়দংশ দেখা হ'ল। এই কারখানা নিখুঁতভাবে দেখতে অন্ততঃ এক সপ্তাহ লাগে, তথাপি একদিনেই কিছু কিছু ধারণা করা যায়। কারখানার প্রধান উদ্দেশ্য পাথর (Dolomite, Manganese ইত্যাদি) থেকে লোহা বের ক'রে ইস্পাতের (Steel) জিনিষ তৈরী করা; যথা—রেলের লাইন, লোহার শিক, বরগা, কড়ি, চাদর ইত্যাদি। 'লোহার পাথর' (Iron Ore) ও 'কোক্ কয়লা' কাঁচা লোহা তৈরী করবার বৃহৎ চুল্লীতে (Blast Furnace) গলিয়ে লোহা তৈরী করা হয়। ঐ লোহা ইস্পাত তৈরী করবার বৃহৎ আথায় (Duplex Steel Plant or Open Hearth

Steel Furnace) পুনরায় গলিয়ে নানারূপ উপায়ে ইস্পাতে পরিণত করা হয়। অতঃপর ইস্পাতগুলিকে ছাঁচে ফেলে বড় বড় থান (Ingot) তৈরী ক'রে ভিন্ন কলে (Blooming or Rolling Mills) পাঠান হয়। তথায় রুটি বেলার ন্যায় বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত প্রকাণ্ড বেলুনের দ্বারা পেষণ ক'রে মাপ মত কেটে উপরি উক্ত ইস্পাতের নানাপ্রকার দ্রব্য তৈরী করবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কলে (Mill) পাঠান হয়। Sheet Mill এ লোহার চাদরকে গ্যাল্‌ভানাইজ্‌ ক'রে 'ঢেউ খেলান' (Corrugating) করা হয়। পাথুরিয়া কয়লাকে পোড়া কয়লায় (Coke) পরিণত করবার জন্য এখানে বৃহৎ সরঞ্জাম (Coke-Ovens) আছে। এ সকল ব্যতীত আলকাতরা (Tar), সালফিউরিক্‌ এসিড্‌ ও এমোনিয়াও উৎপাদন করা হয়। টাটার কারখানা সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দেবার জন্য অতি সংক্ষেপে ইহার বর্ণনা করলুম; কিন্তু এই বিরাট কারখানার বিরাটত্বের বিষয় সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করতে হ'লে একটি বিরাট গ্রন্থে পরিণত হ'য়ে যায়।

বৈকাল চারটের সময় টাটানগর থেকে বিদায় নিয়ে পুনরায় চাইবাসা অভিমুখে রওনা হলুম। মণিলাল চলে যাওয়ায়, আমাকেই বিউগ্‌লের ভার নিতে হ'ল। মণিলালের অভাবে আজ দলটি বড়ই ফাঁকা ফাঁকা বোধ হ'তে লাগলো। বহু ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সাইকেলে ১২ মাইল পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে টাটানগরের দিকে ফিরে গেলেন। তাঁদের মধ্যে সুবিখ্যাত 'জামসেদপুর-সোপ্‌-ওয়ার্কসে'র মালিক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় পথের মাঝে বিস্তর সাবান আমাদের উপহার দিয়ে বিদায় নিলেন। এরূপ অকস্মাৎ পুরস্কারলাভে সত্যই তাঁর প্রতি আমাদের মন শ্রদ্ধায় ভরে উঠ্‌লো। অতঃপর সকলকে বিদায় দিয়ে হু হু শব্দে পরিচিত পথ অতিক্রম করতে লাগলুম।

ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হ'য়ে এল। ক্যাপ্টেন হুইসিল

দেওয়ায়, সকলে গাড়ী হ'তে অবতরণ পূর্ব্বক আলোগুলি প্রজ্বলিত ক'রে পুনরায় এগিয়ে চলেছি, এমন সময়, ধপাস্ ক'রে এক শব্দের সঙ্গে সঙ্গে 'অসময়ের বাঁশী' তান ধরলে। সাইকেল চালানো বন্ধ ক'রে পিছনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতেই দেখি, কর্পোরালের গাড়ী একটি প্রস্তর খণ্ডের গায়ে প্রহৃত হওয়ায়, সে বেচারা গাড়ী হ'তে পড়ে গিয়ে সংজ্ঞা বিলুপ্তের ন্যায় আড়ষ্ট দেহে ধরাশায়ী হ'য়ে রয়েছে। অন্ধকারের মধ্যে তার নিকটস্থ হ'য়ে দেখি যে, ঈষৎ কম্পিত মুখ হতে সাদা ফেনার মত কি যেন নির্গত হচ্ছে! কর্পোরালের এরূপ দুরবস্থা দেখে আমাদের মনে বড়ই আশঙ্কা হ'ল। গাড়ীগুলো তৎক্ষণাৎ রাস্তার উপর শুইয়ে রাখলুম। তার চিকিৎসার জন্য জলের বোতল ও ঔষধের থলে সমেত উপস্থিত হ'য়ে টর্চ্চের আলোর দ্বারা বদনমণ্ডল পরীক্ষা করায়, আমরা একেবারে বোকা ব'নে গেলুম। মুখে আলো পড়তেই দেখতে পেলুম, আমাদের কর্পোরাল মহাশয় সাদা ফেনার পরিবর্ত্তে সজ্ঞানেই স্মিত-বদনে এক টুকরা পাউরুটি ধীরে ধীরে দন্তদ্বারা পেষণ করছেন।

অগত্যা আমরা এরূপে প্রতারিত হ'য়ে না হেসে খুব গম্ভীরভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, "কিহে কোথাও লেগেছে নাকি?" সে তখন উত্তর দিলে,—"আমি পড়ে গেছি বটে, কিন্তু রাস্তায় বালি থাকায় বিশেষ লাগেনি; তবে বুক পকেটের ভেতর থেকে এই পাউরুটির টুকরাটি হঠাৎ পড়ে যাওয়াতে তা' অদ্ভুতভাবে ছিট্‌কে আমার মুখের মধ্যে এসে পড়ে। অস্ত্রাঘাত-প্রাপ্ত দেহে ঘটনাচক্রে এরূপভাবে আহার জোটায় অগত্যা আর কি করি; তাই একটু চিবুচ্ছি।" যা'হোক্, কর্পোরালের এই ভয়াবহ পতন রহস্যে পরিণত হওয়ায়, আমরা যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলুম।

রাত্রি আটটায় চাইবাসায় উপস্থিত হ'য়ে আশুবাবুর বাড়ীতেই তাঁর কথামত গিয়ে উঠ্‌লুম। আশুবাবু অনেকক্ষণ ধরে আমাদের প্রতি

দৃষ্টি-নিক্ষেপ ক'রে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা আপনারা দলে সাতজন ছিলেন ; এখন ছ-জন দেখছি কেন, পথে কারো কিছু হয়নি ত ?" আমরা তখন অতি দুঃখের সহিত তাঁকে বিউগ্‌লারের টেলিগ্রাম-যোগে দুঃসংবাদের কথা জ্ঞাপন করায়, তিনিও অতিশয় দুঃখিত হ'লেন।

"চলি চলি পা পা..."

১৫ই অক্টোবর:—সকালে সিংভূম জিলার প্রধান নগর চাইবাসা ত্যাগ ক'রে 'কিরণঝড়' করদ রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করলুম। রাস্তা মন্দ নয়। বারো মাইল পথ যাবার পর পুনরায় জঙ্গল আরম্ভ হ'ল। উত্তম রাস্তা পেয়ে দ্রুত গতিতে ন-মাইল বনপথ অতিক্রম ক'রে 'হাট-গামারীয়া' নামক ক্ষুদ্র জংলীদের গ্রামে মধ্যাহ্নে বিশ্রাম নিয়ে বৈকালে আবার যাত্রা সুরু হ'ল। সন্ধ্যার ঠাণ্ডা বাতাসে আমাদের দৌড় বেশ প্রবলবেগে হ'তে লাগলো। দূরে কতকগুলি জংলী তাদের প্রিয় সঙ্গী কাঠের লম্বা লম্বা বাঁশী ও মাদল বাজাতে বাজাতে চলে গেল। বাতাসের সাথে তাদের সেই প্রাণ মাতানো বাঁশীর জংলা সুরে আমাদের এই শ্রান্ত দেহকে একেবারে মাতিয়ে তুললে। এরূপে ক্রমশঃ 'বৈতরণী' নদীকূলে 'জয়ন্তীগড়' গ্রামে এসে উপস্থিত। নদীর অপর পারে কিরণ-ঝড় রাজ্য আরম্ভ। এপারে সিংভূম জিলার শেষ সীমা। জয়ন্তীগড়ে অনেক লোকের বাস। দেশীয় ব্যক্তি ব্যতীত সুদূর মাড়োয়ারবাসীও যথেষ্ট; কারণ, বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এই বড় গ্রামটি একটি ব্যবসা-বাণিজ্যের আখ্‌ড়া। এখানে বৈতরণীর তীরে মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটি গড় অবস্থিত। পুরাকালে 'পোরাহাটে'র রাজবংশধরগণ এই গড় প্রস্তুত করেন। এখন গড়ের অবস্থা অতীব শোচনীয়।

পোরাহাটের রাজার গড় দেখা সাঙ্গ ক'রে কোন রকমে পদব্রজে বৈতরণীর ধারে হাজির হলুম। এবারের প্রচণ্ড বন্যায় জয়ন্তীগড়ের অবস্থা যেন নিশীথ শ্মশানের ন্যায় ভয়ঙ্কর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় তিনশ' লোকের ঘর বাড়ীর চিহ্ন মাত্র নাই। শস্যের অবস্থাও তদ্রূপ। স্থানীয় ব্যক্তিগণ অনাহারে অতি কষ্টে কাল যাপন ক'রছে। বহুলোক বন্যার তাণ্ডবলীলায় জীবন ভাসিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে—হায়রে

আজ তারা কোথায়! তাদের আত্মীয়-স্বজন আজও এসে নদীকূলে আছ্‌ড়ে পড়ে উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে কেঁদে চোখের জলে ভাস্‌ছে। এই নিদারুণ দৃশ্য অবলোকন ক'রে আমাদের পথের সম্বল থেকে কয়েকজনকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে বাধ্য হলুম; তারা দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করলে।

নদীর উপর সেতুটি কতকাংশ একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছে। নূতন তৈরী অস্থায়ী সেতুর (Diversion) দ্বারা 'সজ্ঞানে' এবং 'সশরীরে' বৈতরণী পার হ'য়ে কিয়ণঝড় রাজ্যের মহকুমা 'চাম্পুয়া'য় (৫১২ মাইল) উপস্থিত। বিউগ্‌লের শব্দে যখন ক্ষুদ্র সহরটি মুখরিত হ'য়ে উঠ্‌লো, তখন কোতয়াল শ্রীযুক্ত প্রদ্যুম্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর গৃহ হ'তে বহির্গত হ'য়ে আশ্চর্য্যান্বিতভাবে আমাদের নিকট উপস্থিত হ'লেন। অতঃপর ভ্রমণ বৃত্তান্ত অবগত হ'য়ে সানন্দচিত্তে আজকের রাতটা তাঁর বাটীতে আমাদের অতিবাহিত করবার জন্য অনুরোধ করলেন। আমরাও বিনাবাক্যব্যয়ে তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করতে কোতয়াল মহাশয়ের গৃহাভিমুখে রওনা হলুম। কোতয়াল মহাশয়ের নিকট শুনলুম, এখানকার 'এস্‌-ডি-ও' শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ দে মহাশয়ের বাংলো বন্যায় ভেসে গেছে; তিনি নিরুপায় হয়ে, মোটরে কিয়ণঝড় সহরে পলায়ন করেন। এমন কি এঁরা বন্যার ভীষণ স্রোতে বড় বড় হাতী, বাঘ ইত্যাদি ভেসে যেতে দেখেছেন। উঃ কি সাংঘাতিক বন্যাই না এখানে হ'য়েছিল!

১৬ই অক্টোবর:—নিদ্রাদেবীর আরাধনা কিঞ্চিৎ মাত্রায় অধিক হ'য়ে পড়ায়, চাম্পুয়া থেকে রওনা হ'তে বেলা আটটা বাজলো। দু-ধারে জঙ্গলময় পথ অতিবাহিত ক'রে চলেছি, এমন সময় অসময়ের বাঁশী বেজে উঠ্‌লো। গাড়ী চালানো বন্ধ ক'রে দেখি যে, ক্যাপ্টেন মহাশয় একটি বৃক্ষ-মূলে অবস্থান ক'রে বিমর্ষভাবে ইংরেজীতে গান ধরেছেন,—

"Jingle bell, jingle bell
Jingle all the way ;
Oh ! what fun it is to ride
In an one-horse-open—sleigh."

হঠাৎ বাঁশী দেবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায়, ক্যাপ্টেন বললে, "গাড়ী চলছে না, 'ফ্রী-হুইল' ভেঙ্গে গেছে।" সে কি! প্রথমে তার কথা বিশ্বাস করতে পারলুম না; কিন্তু যখন মাষ্টার-মেকানিক ক্যাপ্টেনের গাড়ী পরীক্ষা ক'রে বললে,—"সত্যই 'ফ্রী' একেবারে কি ক'রে ভাঙ্গলো!" তখন তার কথা শ্রবণ মাত্র আমরা যেন অমাবস্যার রাত্রে প্রেতমূর্ত্তি দর্শন করলুম! বাস্তবিক এ এক মহাবিপদ উপস্থিত। সঙ্গে আমাদের উপরি ফ্রী নেওয়া হয় নাই। এমন ইস্পাতের জিনিষটা অবলীলাক্রমে যে ফাটতে পারে—তা কে জানে? কয়েকজন হুইলার্সের মধ্যে, সঙ্গে উপরি ফ্রী নেওয়া যে উচিৎ ছিল, এই ব্যাপার নিয়ে মহা তর্ক বিতর্ক বেঁধে গেল। তখন ক্যাপ্টেন উঠে বললে, "এখন আর তর্কাতর্কি ক'রে লাভ কি? উপরি ফ্রী সঙ্গে নেওয়ার সম্বন্ধে একটা নিয়ম এবার থেকে করা যাবে,—আপাততঃ কি করা যায়?"

কোন উপায় নাই। নিকটে কোন সহর বা বড় গ্রাম নাই যে, ফ্রী কেনা হ'বে। এ আবার 'ট্রাম্ফ-গাড়ী',—সকল স্থানে এ গাড়ীর অংশ পাওয়া দুষ্কর। ট্রেণে ক'রে কোন নিকটস্থ সহরে যে, ফ্রীর চেষ্টা দেখা হ'বে তারও উপায় নাই। প্রায় ৬৯ মাইলের মধ্যে কোন রেল ষ্টেসনের সঙ্গে এ স্থানের সম্বন্ধ নাই। ফ্রী সাইকেলের প্রধান অঙ্গ। কোন উপায় নাই দেখে গাড়ী হ'তে 'চেনটি' একেবারে স্থানচ্যুত ক'রে, বাধ্য হ'য়ে আমাদের ক্যাপ্টেন সাহেব তার অচল সাইকেলে উপবিষ্ট হ'ল। অগত্যা সকলে পালা ক'রে তাকে এই চড়াই-উৎরাই পথে ঠেলতে ঠেলতে কোন প্রকারে কিয়ণ ঝড় সহরাভিমুখে রওনা হলুম।

মাঝে একটি ক্ষুদ্র গ্রামে হাট বসেছে দেখে, ফলাদি সংগ্রহ করবার জন্য থামা হ'ল। গ্রামটির নাম 'পলাশপোড়া'। হাটে প্রবেশ করবামাত্র আর এক মহাবিভ্রাট উপস্থিত। হাটের ব্যক্তিগণ আমাদের আবির্ভাবে হাট পরিত্যাগ ক'রে দৌড় দেবার মতলব করলে। বোধ হয় আমাদের এই অপরূপ 'মিলিটারী' সাজ-সজ্জাই তাদের ভয়ের কারণ। আমরা ত অবাক্! যা'হোক্, নিকটে ইনেস্‌পেক্সন বাংলোর ঈষৎ-শিক্ষিত চৌকিদারের সাহায্যে তাদের অনেক বুঝিয়ে দ্রব্যাদি ক্রয় করা হ'ল। এখানে পয়সার দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় করা অপেক্ষা কোন দ্রব্যের পরিবর্ত্তে দ্রব্য ক্রয় করার রীতিই অধিক প্রচলিত। হাট হ'তে অতি কষ্টে ফলাদি ক্রয় ক'রে অনতি দূরে বৃক্ষমূলে অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর—আবার যাত্রা।

পথে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অনেক সেতু অতিক্রম করতে হ'ল। সকল স্থানেই নূতন নির্ম্মিত অস্থায়ী সেতুর বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অতঃপর বৈকাল সাড়ে পাঁচ-টায় অনেক কষ্টে ক্যাপ্টেন সাহেবকে, "চলি চলি পা পা, খোকা চলে দেখে যা"—ক'রে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ২২ মাইল পথ অতিক্রম ক'রে কিয়ণ্‌ঝড় রাজধানীতে এসে হাজির।

বিউগ্‌লের শব্দে রাজধানীর বহুলোক আমাদের দেখবার জন্য উপস্থিত হ'তে লাগলো। পাশের একটি সুন্দর বাংলো থেকে তিনজন ইয়োরোপীয় ভদ্রলোক আমাদের নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনারা কে এবং কোথা থেকে আসছেন?" আমরা পরিচয় দেওয়ায়, 'এই দুর্গম পথ বেয়ে সমানে সাইকেলে কলকাতা থেকে আসছি' জেনে বড়ই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। আর কোন কথাবার্ত্তা না বলে, তাঁরা তাড়াতাড়ি আমাদের গাড়ীগুলি নিজেরাই ধরাধরি ক'রে তাঁদের বাংলোয় নিয়ে গেলেন এবং প্রকাণ্ড একটি মোটর-গাড়ী হাঁকিয়ে এসে বললেন, "হ্যাল্লো হুইলার্স—আপনারা যদি কিছু মনে না করেন, দয়া করে এই Charabancs (মোটর-গাড়ী) এ উঠে বসুন; আপনাদের সহরটি

দেখিয়ে আনি।” আমরা তাঁদের ব্যবহারে চমৎকৃত হ'য়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলুম যে, তাঁরা এই রাজ্যের ‘সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট’ মিঃ এইচ্-ডব্লিউ-প্রাইস্, আই-সি-এস্ এর পুত্র। মিঃ প্রাইসের মধ্যম পুত্র মিঃ মর্‌রিস্ প্রাইস মোটর-বাসে আমাদের তুলে নিজেই হাঁকিয়ে চললেন।

কিয়ণ্‌ঝড় একটি সুন্দর পাহাড়ী সহর। রাজ্যের পরিসর প্রায় ৩০৯৬ বর্গ মাইল। উঁচু নীচু সুন্দর চওড়া পথগুলি সহরময় বিক্ষিপ্ত। চতুর্দ্দিকে পাহাড়গুলি সহরটিকে প্রাচীরের ন্যায় গড়-বন্দী ক'রে রেখেছে। উদ্যান বেষ্টিত বাড়ীগুলি সবই বাংলো ধরণের। রাজসরকারে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা ব্যতীত এ সহরে বেশীর ভাগ জংলী ও উড়িয়া। রাজ্যের লোকসংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ। কিয়ণ্‌ঝড় বহু পুরাতন করদ (Feudatory State) রাজ্য। এখানকার বর্ত্তমান রাজা (Chief) বলভদ্র ভঞ্জদেও নাবালক বলে রাজ্যের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাজকার্য্য পরিচালনা করেন। শুনলুম রাজাবাহাদুর শীঘ্রই সাবালকত্ব প্রাপ্ত হবেন। এখন মিঃ প্রাইস্ ছুটিতে আছেন, তাই শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ দে, এস্-ডি-ও মহাশয় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত হয়েছেন। রাজা বাহাদুরের পিতা স্বর্গীয় রাজা গোপীনাথ নারায়ণ ভঞ্জদেও অতিশয় কড়া ও বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। উক্ত রাজ্যের বাৎসরিক আয় প্রায় দশ লক্ষ টাকা এবং রক্ষিত বনজঙ্গলাদি থেকে প্রায় তিন লক্ষ টাকা। এখানকার জগন্নাথদেবের মন্দির ও দরবার উল্লেখ যোগ্য। রাজা বাহাদুরের পুরাতন প্রাসাদ সহর থেকে প্রায় দশ মাইল দূরে পাহাড় কেটে তৈরী একটি গড়ের ন্যায় বিরাজমান। সে প্রাসাদ একটি অন্ধকারময় নির্জ্জন স্থান। সেজন্য পুরাকালের প্রাসাদে বসবাস করা অসুবিধা বলে রাজা বাহাদুরের সহরের মধ্যে নূতন রাজবাটী নির্ম্মিত হচ্ছে।”

এখানে বাঙ্গালী আছে জেনে, তাঁদের সহিত আলাপ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মিঃ মর্‌রিস্ রাজ্যের কোতয়াল শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে নিয়ে গেলেন। কোতয়াল মহাশয় আমাদের পেয়ে অতিশয় আনন্দিত হ'লেন। তাঁর বাড়ীতেই প্রাণবল্লভ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ ঘটায় আলাপ পরিচয় হ'য়ে গেল। তাঁরা সকলে আমাদের রাজা বাহাদুরের নিকট আলাপ করাতে নিয়ে গেলেন।

রাজা বলভদ্র অতিশয় সরল প্রকৃতি ব্যক্তি। তিনি আমাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত শুনে অতিশয় আহ্লাদিত হ'লেন এবং ভারতের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালী জাতিরই এই অদ্ভুদ রকমের ভ্রমণ-স্পৃহা আছে বলে খুব প্রশংসা করলেন। ইনি একজন 'পাকা' ফুটবল খেলোয়াড়। কলকাতার মোহন-বাগানে'র খবরও জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু একটু দুঃখিত হ'য়ে বল্‌লেন, "একবার মাত্র 'শীল্ড্' জয়লাভ ক'রে মোহনবাগান খুবই নাম করেছে; কিন্তু তারপর ত আর জয়লাভ করতে দেখি না! কেবল শুনি—অত্যাধিক বৃষ্টির দরুণ আজ মোহনবাগান পরাজিত হ'ল, নচেৎ,—শীল্ড্ তার মারে কে···ইত্যাদি।" রাজা বাহাদুরের নানারূপ প্রশ্নে বুঝতে পারলুম, তিনি অতি মিশুক লোক।

যা'হোক্, আজ রাতটা আমাদের দরবারে কাটানো বন্দোবস্ত হ'য়ে গেল। দরবারে গিয়ে দেখি আমাদের আসবার পূর্ব্বেই মিঃ প্রাইস গাড়ীগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। এমন কি, আমাদের কোন কাজকর্ম্মের দরকারের জন্য একটি বেয়ারা পর্য্যন্ত নিযুক্ত হয়েছে। সত্যই—এতদিনের এই দারুণ পরিশ্রমের পর ছ-টি খাটে গদি-আঁটা নরম বিছানা পেয়ে ক্যাপ্টেন সাহেবকে "চলি চলি পা পা" ক'রে আবার যে কাল ঠেল্‌তে হ'বে, সে কথা আর মনেই পড়লো না—এক ঘুমে রাত কাবার।

"লোমহর্ষণ ঘটনা !"

১৭ই অক্টোবর ঃ—কিয়ণ্‌ঝড় সহরে আমরা আশা ক'রেছিলুম যে, হয় ত "ফ্রী" কিন্‌তে পাওয়া যাবে। কিন্তু সাইকেলের দোকান বলতে এখানে কিছুই নাই। কেবল মাত্র একটি মুদিখানার দোকানে সাইকেলের দ্রব্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তথায় "ষ্ট্যাণ্ডার্ড-ফ্রী" ব্যতীত "ট্রান্সফের-ফ্রী" পাওয়া গেল না। আমাদের আশা ভঙ্গ হ'ল। এখনও ১২ মাইল 'যায্‌পুর রোড্‌' অবধি ক্যাপ্টেনকে ঠেলে নিয়ে গেলে, তবে যদি কোন উপায় হয়। কিয়ণ্‌ঝড় রাজ্যের 'ঘাটগাঁও' নামে সুবিস্তৃত অরণ্য ও পাহাড়ের মধ্য দিয়ে উক্ত পথ অতিবাহিত করতে হ'বে। এ এক মহা ভাবনার কথা! অনুপায়ে ক্যাপ্টেনকে ঠেলে নিয়ে যাবার জন্যই সকলে প্রস্তুত হলুম।



কিয়ণ্‌ঝড়, বিদায় সম্ভাষণ সভা

হুইলাস গণের মধ্যে রাজা বাহাদুর, তাঁর ডান পার্শ্বে রাজ-ভ্রাতা ও বাম পার্শ্বে মিঃ পি, দে, সুপারিন্টেডেন্ট

ক্ষুণ্ণ মনে রাজা বাহাদুরের কথামত তাঁর নিকট উপস্থিত হ'তেই

দেখি, বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমাদের বিদায় সম্ভাষণের জন্য একটি সভার আয়োজন করেছেন। সভাপতিরূপে রাজা বাহাদুর দরবার হ'তে আনীত চার-হাজার টাকা মূল্যের একটি কাঁচের কেদারায় উপবিষ্ট। তাঁর পার্শ্বে আমাদের বসবার স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়েছে। তথায় আমরা উপবেশন ক'রে রাজা বাহাদুরের সহিত নানারূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হলুন। আমাদের আকস্মিক আপদের কথা তাঁকে জানাতেই পিছন থেকে যেন এক দৈববাণী হ'ল—"হাম্‌কো পাশ্‌ একঠো ট্রাম্ফ্‌ নাই-কল্‌ হায়; আব্‌লোককা হুকুম হোনেসে আভি হাম্ উস্‌কা ফ্রী খুল্‌কে লে আনে সক্‌তা!" সহসা উক্ত বাণী কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশমাত্র মন্ত্রচালিতের ন্যায় চকিতে আমাদের বদন-মণ্ডল দৈব-বক্তার খোঁজে পিছন দিকে ঘুরে গেল এবং এই 'রাখে কৃষ্ণ, মারে কে' কথাটি অজানিত ভাবে কয়েক-বার হৃদয় অভ্যন্তরে তোলপাড় ক'রে গেল।

আমরা সেই অমায়িক ব্যক্তিটির সঙ্গে তখন আর কথা বলবার সময় পেলুম না। তাঁর উক্ত বাণী উচ্চারিত হবামাত্র সভাশুদ্ধ ব্যক্তি হৈ হৈ ক'রে চীৎকার ক'রে উঠ্‌লেন,—"লে আইয়ে, লে আইয়ে, জলদি লে আইয়ে।" অতঃপর কিছুক্ষণ পরেই তিনি এক ট্রাম্ফ্‌ গাড়ী সমেত সভায় এসে উপস্থিত। আমাদের মাষ্টার-মেকানিকের দ্বারা তাঁর গাড়ীটি 'খঞ্জে' পরিণত হ'য়ে যখন ক্যাপ্টেন তার নূতন 'ফ্রী' লাগানো গাড়ী চেপে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে এক চক্র রো ক'রে ঘুরে এল, তখন কি ব'লে যে তাঁকে ধন্যবাদ দেব, কিছুই স্থির করতে পারলুম না। তাঁর সহিত আলাপ হওয়ায় জানতে পারলুম, তিনি একজন রাজকর্ম্মচারী, নাম শ্রীযুক্ত গজরাজ প্রসাদ।

সভাভঙ্গে যাত্রার উদ্যোগ করছি, এমন সময় আমাদের পথের ক্ষুধা নিবারণের জন্য নানারূপ মিষ্টান্ন এসে হাজির। আমরাও বিনাবাক্যব্যয়ে সে-গুলিকে সাথী ক'রে বেলা সাড়ে দশটায় সকলের নিকট বিদায়

নিয়ে 'ঘাশিপুরের' দিকে রওনা হলুম। ঘাশিপুর এখান থেকে ৫০ মাইল।

প্রায় সাড়ে বারোটায় 'ঘাটগাঁও' নামক ক্ষুদ্র গ্রামে এসে উপস্থিত হলুম। এখানে একটি থানা অবস্থিত। রাজা বাহাদুর 'টেলিফোন' যোগে এখানকার দারোগাবাবুকে আমাদের বিশ্রামের বন্দোবস্ত করবার জন্য জানিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা পৌঁছাবামাত্র দারোগাবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। স্নানাহার শেষ ক'রে বেলা প্রায় আড়াইটার সময় বেরিয়ে পড়লুম। এই থানার কিয়ৎদূর হ'তেই কিয়ণ্‌ঝড় রাজ্যের সুবিখ্যাত বিশাল বনভূমি 'ঘাটগাঁও-জঙ্গল' এবার ২০ মাইল ধরে পথে পড়বে।

রাস্তা ভরা বালি। গাড়ীর চাকা মাঝে মাঝে বসে যেতে লাগলো, আবার মাঝে মাঝে পিছলে গিয়ে আরোহী সমেত পপাত—কোথাও স্থানে স্থানে চারা গাছ জন্মে গেছে; আবার মধ্যে মধ্যে বিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ডের দরুণ গাড়ীর গতি-বেগ সংযত করতে হচ্ছে। দু-পাশের নির্ম্মুক্ত ভূমি খণ্ডগুলি ক্রমে ক্রমে শাল, বেল, নিম, আতা প্রভৃতি বৃক্ষ-রাজির দ্বারা ঘন সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, অরণ্যাভ্যন্তর মধ্যাহ্নেও ঘোর অন্ধকারে পরিণত হ'য়ে গেল। ছোট বড় অসংখ্য পাহাড় ক্রমশঃই মাথা তুলে দাঁড়াতে লাগলো। বন আরম্ভ হ'ল।

জংলী কাঠুরেরা কাঠ কাটা সাঙ্গ ক'রে জংলা গানে মাতোয়ারা হ'য়ে ঘরের দিকে ফিরে চলেছে। এই ভীষণ বন্যজন্তুভরা জঙ্গল পথে বেলা চারটের পূর্ব্বেই লোক চলাচল বন্ধ হ'য়ে যায়। আমরা যা'তে দিনে দিনে দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে ঘাশিপুরে পৌঁছতে পারি, সেই মত এস্তগতিতে চতুঃপার্শ্বে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে করতে এগিয়ে চলেছি। চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, নিঝুম, মাত্র ঝিঁঝি পোকার একঘেয়ে রাগিণী ও মাঝে মাঝে বিদ্‌ঘুটে পাখীর নিরস ডাক, নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে অরণ্যের গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করছে। বৃদ্ধ সূর্য্যিমামা তাঁর শেষ

আভাটুকু কালো কালো পাহাড়গুলির মাথার উপরে এখনও বিস্তার করছেন। স্থান অতি ভয়ঙ্কর,কিন্তু দৃশ্য অতি মনোরম।

প্রকৃতিদেবীর উচ্ছ্বসিত রূপ-তরঙ্গে ভাসতে ভাসতে, চলেছি ত চলেছি-ই। এমন সময় এক দারুণ চড়াই সম্মুখে দেখে গাড়ীর গতি বৃদ্ধি করতে হ'ল। হাঁফাতে হাঁফাতে চড়াই ঠেলে উঠ্‌তে অকস্মাৎ বনের ভিতর থেকে মড়্ মড়্, ধুপ্ ধুপ্ শব্দ আসতে লাগলো। পথটি এস্থানে অল্পদূর পর্য্যন্ত সোজা গিয়ে ডানদিকে বেঁকে গেছে। একটু অগ্রসর হ'তেই প্রায় ৪০ গজ দূরে ডান পাশে দৃষ্টি পতিত হওয়ায়, দেখতে পেলুম, বনের লতাগুল্মবৃক্ষাদিকে কে যেন মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে খণ্ড বিখণ্ড ক'রে ভূতলোপরি নিক্ষেপ করছে এবং চতুর্দ্দিকের বিক্ষিপ্ত ধূলিরাশি স্বল্প অন্ধকারে পরিণত হয়েছে। হঠাৎ এরূপ দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম। আবও কয়েক পদ অগ্রসর হওয়ায়, দূরে উক্ত অদ্ভুত দৃশ্যটি রাস্তা থেকে ডান পার্শ্বে প্রায় বিশ গজের মধ্যে কানন অভ্যন্তরে নিরীক্ষিত হ'ল।

ব্যাপার কি? কিছুই বোঝা যায় না। জনপ্রাণীহীন নিরালা বনপথে শঙ্কিত হৃদয়ে অতি সন্তর্পণে আরও কয়েক পদ অগ্রসর হতেই, দেখি কি সাংঘাতিক! বন্যহস্তীরদল উন্মত্তের ন্যায় এই বনরাজি লুপ্ত বিলুপ্ত ক'রে তাদের শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। অজ্ঞানতা বশতঃ কখন যে গাড়ী হ'তে অবতরণ করেছি, স্মরণ-ই নাই। বন্ধুগণ পিছনে আসছিল, তারা আমাকে এরূপভাবে গাড়ী হ'তে নাম্‌তে দেখে যখন জিজ্ঞাসা করলে, "কি ব্যাপার?" তখন আমার জ্ঞান হ'ল। তাড়াতাড়ি বনমধ্যে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে সেই অভাবনীয় দৃশ্য দেখাতেই, এবার বুঝি বা প্রলয়কাণ্ড উপস্থিত মনে ক'রে সকলেরই আমার মত অবস্থা হ'ল।

কারুর মুখে কথা নাই—নির্ব্বাক নিশ্চল! জানিনা, কতক্ষণ পথের উপর আমরা নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়িয়েছিলুম! যখন ফটোগ্রাফার সাহসভরে রাস্তার বাঁ-দিকে সাইকেল সমেত অনতিগভীর

নালীর ভিতরে লুক্কায়িত হ'ল, তখন এঞ্জিনে জোড়া বগির মত আমরাও তাকে অনুসরণ ক'রে উক্ত নালীর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে মুখচাওয়া-চাওই করতে লাগলুম। হঠাৎ অনির্ব্বচনীয় ভয়াবহ দৃশ্য অবলোকিত হওয়ায়, আমরা যে কিরূপ দিশেহারা হ'য়েছিলুম, সে কথা বর্ণনাতীত। সমস্ত দেহটি অনতিগভীর নালির মধ্যে আচ্ছাদিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা একবার রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো। অতিকষ্টে কম্পিতকণ্ঠে নিম্নস্বরে একজন বললে, "ভাই আর এগিয়ে দরকার নাই, ঘাটগাঁও থানায় ফিরে চল।" আর একজন বললে "পাগল নাকি, এখন কখন যাওয়া যায়, এখানেই গুড়ি মেরে বসে থাকো।"

আমরা এই বনপথ ১৫ মাইল অতিক্রম করেছি, আর মাত্র পাঁচ মাইল কোনরূপে অতিক্রম করলেই বন পার হ'য়ে যাব। সন্ধ্যা আগত প্রায়; এখন যদি আবার ফিরতে হয়, তাহলে হয়ত বাঘের পেটে আশ্রয় নিতে হ'বে। ৪০-৪৫ গজ দূরেই হাতীর পাল; তাদের সামনে দিয়েই বা কি ক'রে যাওয়া যায়। সাইকেলের গতি যতই বৃদ্ধি করি না কেন, এরূপ চড়াই পথে ঘণ্টায় দশ মাইলের অধিক যাওয়া অসম্ভব। হাতী যদিও দলের মধ্যে থাকলে বড় একটা কিছু করে না শোনা যায়, কিন্তু চতুষ্পদ ত বটে! কারণে অকারণে যদি একবার পশ্চাদ্ধাবন করে, তাহলে এরূপ পথে তারা ঘণ্টায় অন্ততঃ ১৮ মাইল বেগে ধাবিত হ'য়ে হুইলার্স-গণকে নিমেষের মধ্যে পদদলিত ক'রে ধূলায় পরিণত ক'রে ছাড়বে।

নালির মধ্যে ফটোগ্রাফার প্রথমে ছিল, তারপর ক্রমশঃ আমরা সারি দিয়ে সাইকেলের হাতলের 'রড' ও বসবার 'সিটের' নীচের রড দু-হাতে ধরে গুড়ি মেরে বসে রইলুম। এভাবে নানারূপ চিন্তা করতে করতে ক্ষণকাল অতিবাহিত হ'ল। নালি প্রায় হাত তিনেক চওড়া ও চার হাত উচ্চ। বাঁ-পাশে অতল খাদ। ফটোগ্রাফার দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে দেখলে,—ভয়াবহ স্থান অতিক্রম ক'রে নালিটি অনেক দূরই পর্য্যন্ত

এভাবে গিয়েছে। অগত্যা ফটোগ্রাফার ও মাষ্টার-মেকানিক কারুর কথায় ভ্রুক্ষেপ না ক'রে গাড়ীগুলি দু-হাতে বাগিয়ে গুড়ি মেরে মেরে সামনের দিকেই এগিয়ে চললো। কলের পুতুলের ন্যায় আমরাও তাদের অনুসরণ করতে লাগলুম।

স্থানে স্থানে নালির মধ্যে বড় বড় ঘাসের জঙ্গল। ঘাসের ভিতর ব্যাঘ্র মশাই অনায়াসে লুকিয়ে থাকতে পারেন; কিন্তু বাঘ কি সাপের কথা তখন আমাদের খেয়ালই নাই। উপস্থিত বিপদ হ'তে রক্ষা পাবার আশায় বড় বড় ঘাসগুলি মথিত ক'রে এগিয়ে চলেছি। মাঝে মাঝে মাথা তুলে টুপীর অন্তরালে মুখ লুকিয়ে হস্তীদলের প্রতি সভয় দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলুম। এরূপে কিয়ৎদূর অগ্রসর হ'বার পর আমাদের ফটোগ্রাফার অদ্ভুত সাহসে সাহসী হ'য়ে নালির ভিতর থেকে চক্ষুদ্বয় ও 'ক্যামেরার' মুখটি বহির্গত ক'রে তাড়াতাড়ি হস্তীযুথের একটি ফটো তুলে নিলে। ফটোগ্রাফার খুব সাহসভরে এই ভীষণ হাতীর পালের ফটো তুলেছিল বটে; কিন্তু তাড়াতাড়িতে ক্যামেরা নড়ে যাওয়ায়, তার শ্রম ব্যর্থ হয়। প্রায় কুড়ি মিনিট গুড়ি মেরে হাঁটার পর দেখি যে, আর নালি নাই। রাস্তা অতিশয় উৎরাই পথে নেমে গেছে। কি করা যায়! টুপির সাহায্যে ঘাড়টি তুলে দেখলুম, হস্তী মহাশয়দের প্রায় ২০ গজ দূরে পরিত্যাগ ক'রে এসেছি। অতঃপর সকলে দ্রুতপদে রাস্তায় উঠেই সাইকেলে আরোহণ ক'রে এস্তহৃদয়ে উৎরাই পথেও প্যাডেল চাপতে চাপতে "জীবন্ত জঙ্গল" অতিক্রম ক'রে সন্ধ্যা ছ-টায় ঘাসিপুরায় (৫৯৫) এসে সেখানকার ডাক্তারবাবুর কৃপায় দাতব্য-চিকিৎসালয়ের একটি ঘরে আশ্রয় নিলুম

বৈতরণী নদীর সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ—ঘাসিপুরার গা বেয়ে কল কল নাদে মন্থর গতিতে প্রবাহিত। ওপারে কিয়ণ্‌ঝড় রাজ্যের মহকুমা 'আনন্দপুর'। আনন্দপুরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের কয়েকটি বাংলো ও

এই চিকিৎসালয় ব্যতীত ঘাসিপুরায় ভিন্ন গৃহাদি নাই। মাত্র একটি ক্ষুদ্র মুদিখানার দোকান অবস্থিত। চতুর্দ্দিক জঙ্গলে পূর্ণ। আমরা শাল্‌তি ক'রে নদী পার হ'য়ে আনন্দপুরে রাত্রি ভোজন সমাধান করলুম।

তখন রাত এগারটা। সমস্ত দিনের ক্লান্ত দেহকে চিকিৎসালয়ের ক্ষুদ্র গৃহমধ্যে বিছানো কম্বলের উপর বিস্তার ক'রে, আজ বৈকালের সেই 'লোমহর্ষণ ঘটনার' কথা ভাবতে ভাবতে নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে কখন যে লুটিয়ে পড়েছি, সে কথা মনেই নাই। সহসা অন্ধকার নিশীথের মৌন বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে ভীষণ এক গর্জ্জন সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ ক'রে দিলে। সকলে ত্রস্তে বিছানা পরিত্যাগ ক'রে উঠে বসলুম। ক্রমশঃই ঐ ভীষণ গর্জ্জন স্তরে স্তরে উচ্চনাদে নিনাদিত হ'তে লাগলো। এ শব্দ আর কিছুই নয়—ব্যাঘ্রের ভীষণ গর্জ্জন। ঠিক যেন আমাদের ঘরের পাশেই বাঘ ডাকছে। একবার জানলার বাইরে গোপনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করায়, কেবলমাত্র রাশীকৃত জোনাকীর জ্যোতিঃ ভিন্ন কিছুই দৃষ্টিগোচর হ'ল না।

পাশের ঘরে ডাক্তার বাবুর একটি বেয়ারা সুখে নিদ্রা যাচ্ছিল। ঐ ঘরে প্রবেশ করবার একটি দরজা আমাদের ঘরের ভিতর থাকায়, তথায় অনায়াসে উপস্থিত হলুম। অনেক ডাকাডাকিতে উড়িয়া বেয়ারাটি উঠে বসেই বলতে লাগলো "আপনরা কলিকাতার লুক, বাঘো ডাকিবারে এতে ডরি গলা? পোয়া কুশ বাটর বাঘো ডাকুচি; এঠি রুজ বাঘো ডাকুচি। তুমভে শুইব যাও, কিছু ডর নাই।" এই বিকট শব্দ আধ মাইল দূর থেকে আসছে শুনে, আমরা বড়ই আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম। যা'হোক, নিশ্চিন্ত হ'য়ে আবার শুয়ে পড়া গেল; কিন্তু কিছুতেই আমাদের নিদ্রা হ'ল না। অতঃপর ঐ সব উৎকট হিংস্র জন্তুদের সম্বন্ধে নানারূপ জল্পনা কল্পনা করতে করতে দেখি যে, জানালার ফাঁক দিয়ে অরুণদেবের রাঙ্গা আলোয় ঘর ভরে গিয়েছে।

"ভুবনেশ্বর অভিমুখে"

১৮ই অক্টোবর :—ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘাসিপুরা থেকে রওনা হ'য়ে কটকের' দিকে যাত্রা করলুম। এখান থেকে কটক ৬৭ মাইল। চার মাইল অতিক্রমের পর 'কুশভদ্রা' নামে একটি সেতুবিহীন নদী পড়লো। নদীতে কোমর পর্য্যন্ত জল; কিন্তু বেশ চওড়া। রাস্তা মেরামতের জন্য তথায় অনেক উড়িয়া কুলি কাজ করছিল। আমাদের স্কন্ধে নিয়ে ওপারে যাবার জন্য তারা এসে মহা হৈ হৈ আরম্ভ করলে। অগত্যা তাদের কাঁধে চেপে নদী পার হলুম, কিন্তু বখশীস্ দেবার সময় মহা বিপদে পড়া গেল। কারণ শেষকালে মাষ্টার-মেকানিককে প্রায় পাঁচ-জন কুলিতে গোলযোগ করতে করতে পরপারে এনে উপস্থিত করেছিল। তারা কেউ বলে, "গোড় ধরি কিরি বাবুকু মু ঘিন্নি আইচি।" কেউ বলে, "মু গুটে হাত ধরি কিরি ঘিন্নি আইচি।" আবার কেউ বা বলে "মু কোমর ধরি কিরি বাবুকো ঘিন্নি আইচি......ইত্যাদি।" এ এক মহাবিপদ!—একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললে। অনুপায়ে প্রত্যেককে কিছু কিছু বখশীস্ দিয়ে গণ্ডগোলের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করা গেল।

কুশভদ্রা নদী থেকে আট মাইল পথ অতিক্রম ক'রে কিয়ণঝড় রাজ্যের সীমানা পার হ'য়ে গেলুম। এবার 'কটক-জিলা' আরম্ভ। এখান থেকে আমরা প্রকৃত উড়িয়ার সংস্পর্শে এলুম। ছাই রংএর ছোট বড় পাহাড়গুলি ক্রমশঃই যেন দূর হ'তে দূরে ছুটে পালাতে লাগলো। এতদিন পরে প্রায় সমতল রাস্তা পেয়ে গাড়ীর গতি বৃদ্ধি করলুম। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত প্রান্তর। দু-পাশে হলুদ বর্ণ ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে রাস্তা। পথিকের বেশ চলাচল।

এরূপে ২২ মাইল পথ অতিবাহন ক'রে 'বি-এন্-আর' এর পুরী

যাবার 'মেন-লাইন' দেখতে পেয়ে আনন্দে বিউগ্ল এ 'মার্চিং' বাজাতে বাজাতে আমাদের বাঙ্গালীর কীর্ত্তি সুবিখ্যাত 'জগন্নাথ রোডে' গিয়ে পড়লুম। এই সুন্দর চওড়া পথটি কলকাতা থেকে সোজা 'পুরীধাম' পর্য্যন্ত গিয়েছে। বহুকাল পূর্ব্বে যখন রেলগাড়ীর চলাচল এ অঞ্চলে হয় নাই, তখন কলকাতার 'পোস্তা'র রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ মহারাজা সুখময় রায় একদিন পুরীধাম গমন উপলক্ষে তীর্থযাত্রীগণের ক্লেশ দর্শন ক'রে ৩১২ মাইল বিস্তৃত এই পথটি দেড় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত করান।

আমরা 'যাষ্পুর রোড্ ষ্টেসন' পিছনে রেখে হু হু শব্দে এগিয়ে চলেছি, এমন সময় 'ব্রাহ্মনী নদী' আমাদের গতিরোধ করলে। সেতু না থাকায় বড় একটি নৌকা চড়ে পরপারে উপস্থিত হলুম। পথে আরও দু-একটি নদী পার হ'য়ে বেলা দুটো নাগাদ সেতুবিহীন 'মহানদীর' ধারে এসে হাজির। বিশাল নদী, এপার ওপার প্রায় দেখা যায় না। ঠিক্ দুপুর বেলায় নৌকা পাওয়া গেল না। অগত্যা মহানদীর তীরে 'জগৎপুর' রেল ষ্টেসনে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর 'পুরী প্যাসেঞ্জারে' ছ-মিনিটের মধ্যে ভারতের পঞ্চম বৃহৎ সেতু অতিক্রম ক'রে 'কটকে' এসে পৌছলুম। কটক ষ্টেসন থেকে আড়াই মাইল দূরে 'বখরাবাদে' (৬৬২ মাইল) শ্রীযুক্ত হেমন্ত কুমার বসু মহাশয়ের বাড়ীতে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত গিয়ে উঠলুম। এখানে আজ রাতটা খুব আমোদে গান-বাজনার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হ'ল।

১৯শে অক্টোবর :—সকালে নিকটস্থ 'কাটজুরী' নদীতে স্নান করা গেল। এই নদীকূলে সুদৃঢ় ভাবে নির্ম্মিত মারাঠা আমলের উচ্চ বাঁধ আজও অক্ষত দেহে বিরাজমান। আরামে নদীতে একটু সাঁতার কেটে কটক সহরটি পর্য্যবেক্ষণ করতে বেরুলুম। পথ ঘাট বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলে মনে হ'ল না। পথ চল্তে চল্তে কেবলি এক অদ্ভুত দৃশ্য দৃষ্টি-গোচর হ'তে লাগলো,—পায়ে গোদ! এই উড়িষ্যায় উক্ত

রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যাধিক বলে মনে হয়। স্থানীয় অধিবাসীগণ বলেন যে, মশকের প্রকোপে এই রোগের সৃষ্টি। সত্যই, গত রাত্রেই বুঝতে পেরেছি অতিশয় মশকের উপদ্রবে কটকবাসীদের অনিদ্রাই বোধ হয় সহজ নিয়ম। শরীরে অবাধে মশক ভায়ারা ত দংশন করেছেন, এবার বুঝি বা পা ফুলে ঢোল হয়; এই ভয়ে ঐ কথা শ্রবণ মাত্র প্রত্যেকে আপনাপন পদদ্বয় বারে বারে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম।

যা'হোক্, একদিকে বিপুল মহানদী ও অপরদিকে কাটজুরী এবং 'কোয়াখাই' নদী সহরটিকে গড়বন্দী ক'রে রেখেছে। এখানকার "রেভেন্‌সও কলেজ"ও কৃষিক্ষেত্রে জল-সেচন করবার জন্য নির্ম্মিত মহানদীর বাঁধ (Anicut) দ্রষ্টব্য। নদীর জল প্রবলবেগে বাঁধের উপর দিয়ে জল-প্রপাতের ন্যায় গর্জ্জন করতে করতে অপর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এই সকল দেখা সাঙ্গ ক'রে আমরা বেলা সাড়ে দশটায় ভুবনেশ্বর অভিমুখে যাত্রা করলুম। কাটজুরী নদীর ওপারে রাস্তা। পরপারের জন্য সেতু না থাকায়, নৌকা ভাড়া ক'রে পার হওয়া গেল।

এ স্থানে দু-টি রাস্তা রয়েছে। বাঁ-দিকের পথটি (জগন্নাথ রোড) সোজা পুরীধাম পর্য্যন্ত (কটক থেকে ৫০ মাইল) এবং ডান দিকের পথটি চিল্‌কাহ্রদ হ'য়ে 'মান্দ্রাজ' অবধি (কটক থেকে প্রায় ৭৭১ মাইল) প্রসারিত। আমরা এখন ভুবনেশ্বর হ'য়ে চিল্‌কায় যাব বলে ডান দিকের রাস্তা ধরলুম। এখান থেকে এই পথে ভুবনেশ্বর ২৪ মাইল। বেশ যাচ্ছিলুম, সম্মুখে হাড়গোড় ভাঙ্গা কোয়াখাই নদী পথরোধ করলে। নদীতে একবিন্দু জল নাই, কেবল ধূ ধূ করছে বালি। সূর্য্যদেবের অসহ্য রৌদ্রে বালুকারাশি অতিশয় উত্তপ্ত। অনন্তর প্রায় এক-মাইল বালির পথে অতিকষ্টে ভারি গাড়ীগুলি ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে চরণযুগলের সাহায্যে এহেন কটক-মরুভূমি অতিক্রম ক'রে রাস্তায় এসে উপস্থিত। একটি বৃক্ষমূলে খানিক বিশ্রামলাভের পর আবার দৌড় আরম্ভ হ'ল।

দুধারে সারি সারি বৃক্ষরাজি পথটিকে ছায়াযুক্ত করায়, আমরা তীরবেগে গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে ছুটতে লাগলুম। এই সকল গ্রামে উড়িয়াদের বাস। কটিদেশের হরিদ্রারঞ্জিত ক্ষুদ্র পীত বর্ণ বস্ত্রের দ্বারা কোনরূপে স্থূলযৌবনভারাপন্ন বক্ষঃস্থল আবৃত ক'রে বিউগ্‌লের শব্দে চমকিত গ্রাম্য রমণীগণ কবাটের অন্তরাল হ'তে বক্র নয়নে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। কোথাও বা পথের উপর ক্রীড়া-মত্ত বালক-বালিকাদল আমাদের দেখে আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে সত্রাসে কুটীর মধ্যে পলায়ন করলো। এরূপে কটক থেকে ১১ মাইল পথ অতিবাহিত ক'রে 'চান্দকা' গ্রামের থানার পাশ দিয়ে 'মেন্' রাস্তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাঁ-দিকে প্রায় ছ-হাত চওড়া বন-জঙ্গলে পূর্ণ উৎকট পথ ধরলুম।

ক্রমশঃ, ক্ষুদ্র পাহাড় শ্রেণীর ভিতর আবদ্ধ হলুম। সঙ্গে সঙ্গে পথের গতিও উঁচু নীচু হ'তে লাগলো। পথে 'খণ্ড-গিরি' ও 'উদয়গিরি' পড়লো। এখানে জৈনদিগের একটি ধর্ম্মশালা অবস্থিত। তথায় গাড়ীগুলি রেখে গুহাভিমুখে পদব্রজে রওনা হলুম।

বাঁ-দিকে উদয়গিরি; মাত্র ১১২ ফিট্ উচ্চ। এই পাহাড়ের শিখর হ'তে সূর্য্য উদয়ের সুন্দর দৃশ্য সর্ব্বাগ্রে নয়ন পথে পতিত হয় বলে, এর নাম হয়েছে উদয়গিরি। এখানে কিম্ভূতকিমাকার 'ব্যাঘ্র গুম্ফ' নামে একটি গুহা আছে; পাহাড় কেটে প্রকাণ্ড একটি ব্যাঘ্র-মস্তক তৈরী করা হয়েছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রটি বিকট 'হাঁ' ক'রে রয়েছে। হাঁ'টি এত বড় যে, দুটি মানুষ অনায়াসে তার মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। 'হস্তী-গুহা' নামে আর একটি অদ্ভুত গুহা আছে; তথায় একটি গণেশঠাকুরের মূর্ত্তি অবস্থিত। কতকগুলি গুহা উপর নীচে একত্রে মিলিত হওয়ায়, চক্‌মিলান দ্বিতল বাড়ীর ন্যায় বোধ হয়। এ স্থানটির নাম 'রাণী-হংসপুর'। প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমীতে উদয়গিরির উপর একটি মেলা

হয়, ঐ সময় এখানে বহুযাত্রীর সমাগমে নিরালা রম্য স্থানটি তাদের কোলাহলে মুখরিত হ'য়ে উঠে।

উদয়গিরি দেখা সাঙ্গ ক'রে ডানদিকে খণ্ডগিরিতে আরোহণ করলুম। খণ্ডগিরি প্রায় ১২৩ ফিট্ উচ্চ। একটি গিরির একস্থানে দু-ভাগে বিভক্ত ক'রে পথ নির্ম্মাণ করা হয়েছে ; এই কারণে উক্ত পথটি স্বল্প পরিসর উপত্যকার ন্যায় মনে হয় এবং উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি দু-টি ভিন্ন গিরি বলে ভ্রম হয়। গিরিকে এরূপে খণ্ড করায়, এই গিরির নাম করণ হয়েছে খণ্ডগিরি। এখানে প্রায় শতাধিক গুহা ও অনেকগুলি দেব-দেবীর মূর্ত্তিও বিদ্যমান। গিরি-শিখরে একটি মন্দির অবস্থিত। তথায় পরেশনাথ, দশভূজা-দুর্গাদেবী এবং বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের চতুঃপার্শ্ব আধুনিক 'রেলিং' দ্বারা বেষ্টিত। এ স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি 'কুণ্ড' দর্শনযোগ্য, যথা—গুপ্তগঙ্গা, আকাশ গঙ্গা, রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ইত্যাদি। অনন্তগুহাতে অনেকগুলি অদ্ভুত মূর্ত্তি খোদাই করা আছে এবং পুরাকালের 'পালি-জাতীয় দুর্বোধ্য ভাষায় একটি প্রস্তর খণ্ডের উপর নানা কথা লেখা আছে। কিম্বদন্তী আছে, এই গুহাগুলি জৈনরাজ খারবেলের কীর্ত্তি। 'পাটালিপুত্র' অবধি তাঁর বিস্তৃত রাজ্য ছিল এবং রাজধানী ছিল 'কলিঙ্গ' নগরীতে। এতদ্ব্যতীত আহির নামক কলিঙ্গাধিপতির দ্বারা কতকগুলি গুহা খোদিত। আবার কেহ বা বলেন, এ সকল বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তি। অতঃপর খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি দেখা সাঙ্গ ক'রে তিন মাইল দূরবর্ত্তী ভুবনেশ্বরাভিমুখে রওনা হলুম। এখান থেকে ভিন্ন একটি পথ 'খুরদা' অভিমুখে গিয়েছে।

আনন্দের সহিত বিউগলে মার্চিং বাজাতে বাজাতে আজ এতদিন পরে বৈকাল পাঁচ-টার সময় ভুবনেশ্বরে প্রবেশ করলুম। ডান পাশে ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের ডাক বাংলো থেকে একজন পশ্চিমদেশীয় ভদ্রলোক বহির্গত হ'য়ে অত্যাশ্চর্য্যান্বিতভাবে আমাদের থামতে অনুরোধ করলেন।

আমরা গাড়ী হ'তে অবতরণ ক'রে তাঁর নিকট উপস্থিত হলুম। পরিষ্কার ইংরেজী ভাষায় তিনি আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। এরূপ নিখুঁত ভাবে তাঁর মুখে ইংরেজী কথা উচ্চারিত হওয়ায়, আমরাও একটু অবাক্ হ'য়ে গেলুম। আমাদের পরিচয় লাভে অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে তিনি বিশেব খাতির করলেন। তাঁর হাতে একটি পুস্তক ছিল; সহাস্য বদনে ঐ পুস্তকখানি আমাদের চোখের সম্মুখে ধরলেন, পুস্তকখানির নাম দেখি যে, "Across Asia by Bicycles"! আমাদের দেখে তাঁর এরূপ আশ্চর্য্য হবার কারণ এই যে, জনৈক প্রতিবাসীর নিকট হ'তে 'সাইকেল ভ্রমণ-সম্বন্ধে' উক্ত পুস্তকখানি নিয়ে সময় অতিবাহিত করবার জন্য সবেমাত্র পাঠে নিযুক্ত হয়েছেন, অকস্মাৎ আমাদের বিউগ্‌লের প্রচণ্ড শব্দ তাঁর কর্ণকুহরে প্রবেশ করলো। ব্যাপার কি দেখবার জন্য বাংলোর বহির্দ্দেশে উপস্থিত হওয়ায়, তাঁর চোখের সামনে সেই সাইকেল ভ্রমণকারীর দলই দৃষ্টিগোচর হয়।

যা'হোক্, আলাপ পরিচয়ে জানা গেল, তাঁর পৈতৃক বাড়ী সুদূর 'কান্দাহারে'। কিন্তু 'সাত সমূদ্র তেরো নদীর পার' ইয়াঙ্কী রাজ্যে তাঁর জন্ম, নাম—মিঃ বদ্রুদ্দীন খাঁ। কোন কর্ম্মউপলক্ষে তিনি ভুবনেশ্বরে এসেছেন। খাঁ-সাহেব আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে কি ক'রে যে সন্তুষ্ট করবেন, স্থির করতে পারছিলেন না। তাঁর বিশেষ অনুরোধে বাধ্য হ'য়ে এখানেই রাত্রি-বাস ঠিক্ হ'ল। পরদিন প্রত্যূষে মন্দিরাভিমুখে গমন করলুম

২০ শে অক্টোবর ঃ—ভুবনেশ্বর একটি মন্দিরবহুল স্থান। পূর্ব্বে প্রায় সহস্রাধিক মন্দির দ্বারা সহরটি পরিবেষ্টিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে একশত মন্দির ব্যতীত অধিকাংশই ভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত এই মন্দিরের কারুকার্য্য দেখলে চমৎকৃত হ'তে হয়। কেহ কেহ বলেন, এই সকল মন্দিরাদি তৎকালে উড়িষ্যার কেশরী বংশীয় রাজগণের

দ্বারা স্থাপিত। এই সকল মন্দিরের মধ্যে চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ভুবনেশ্বর দেবের মন্দিরই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর উচ্চতা প্রায় ১৮০ ফিট্।

লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর অন্ধকার মন্দির অভ্যন্তরে ছত্রাকারে বিরাজমান। প্রকাণ্ড গোলাকার মসৃণ কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডের চতুঃপার্শ্ব স্বর্ণ মণ্ডিত। উচ্চতায় মাত্র অর্দ্ধফুট্। মন্দিরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভুবনেশ্বরী, ভৈরবেশ্বর, নিশা পার্ব্বতী, নৃসিংহদেব প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্ত্তিও বিরাজমান। এতদ্ব্যতীত এস্থানে কেদারেশ্বর, মুক্তেশ্বর রাজারাণী, সিদ্ধেশ্বর, কপিলেশ্বর ইত্যাদি মন্দির এবং গৌরীকুণ্ড, রামকুণ্ড, কেদারকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, কপিলাহ্রদ প্রভৃতি কুণ্ডও দর্শনীয়। 'বিন্দু-সরোবর' নামে এখানে একটি প্রকাণ্ড দীঘী আছে, এর মাঝে ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর 'জগতী' নামে একটি মন্দির অবস্থিত। বহু তীর্থযাত্রী এই পবিত্র সরোবরে স্নানতর্পণাদির দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় ক'রে থাকেন। এর সম্মুখে একটি ধর্ম্মশালা আছে।

এ স্থানে প্রাচীন-যুগের স্থপতিগণ বিশ্বকর্ম্মার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য বিদায় সর্ব্বজ্ঞতার পরিচয় প্রদান ক'রে গিয়েছেন বটে, কিন্তু তা' পৃথিবীর মধ্যে হিন্দুজাতি ব্যতীত ভিন্ন জাতির উপলব্ধি করা একপ্রকার অসম্ভব; জনরব এবং পুস্তকাদিই তাঁদের উক্ত বিদ্যার পরিচয় দান ক'রে থাকে। কারণ, এই সকল হিন্দুদিগের পবিত্র পীঠস্থানে যদি কোন অপর জাতি প্রবেশ করেন, তাহলে নাকি শাস্ত্রানুযায়ী দেব-মন্দির কলুষিত হয়। উক্ত কারণে অপরজাতির মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ নিষেধ। কোন দয়ালু ব্যক্তির দ্বারা ভুবনেশ্বর মন্দিরের বহির্দ্দেশে একটি নাতি উচ্চ মঞ্চ নির্ম্মান করা হয়েছে, এর উপর থেকে ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণ দূর হ'তেই প্রাচীন হিন্দুদিগের কারুকার্য্য অবলোন পূর্ব্বক যৎকিঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু, অতীতকালের হিন্দুদিগের এই আশ্চর্য্য শিল্পকলার দুর্লভ

দৃষ্টান্ত দেখে উক্তমরূপ জ্ঞানলাভের নিমিত্ত জগতের সর্ব্বসাধারণকে মন্দির মধ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া কর্ত্তব্য নয় কি ?

শাস্ত্রে বলে,—"আকাশস্বরূপে, বায়ুস্বরূপে, সূর্য্যদেব ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বরূপে, অগ্নিস্বরূপে, সলিলস্বরূপে এবং পৃথিবীস্বরূপে—'সাকার ব্রহ্ম' এই চরাচরকে নিয়ে প্রত্যক্ষ আছেন এবং পরমাত্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ এই সাতটীকে নিয়ে বিরাট বিষ্ণুভগবানস্বরূপে বিরাজিত। সূর্য্যদেব ও চন্দ্রমাজ্যোতিঃ বিরাট বিষ্ণুভগবানের নেত্র ও মন।" এই সাকার ব্রহ্মের মধ্যে কে ভুবনেশ্বর, আর কে-ই বা ন'ন ? যিনি ভুবনের ঈশ্বর, তিনিই ভুবনেশ্বর। পৃথিবীর সকল স্থানেই তিনি বিরাজ করছেন। তিনিই মানবের সৃষ্টিকর্ত্তা, সবই তিনি। সবই যদি তিনি হন, তবে কি হিন্দুজাতি ভিন্ন এই বিশ্বজগতে 'মানব' বলতে আর কেহ নাই ? হিন্দু ব্যতীত মুসলমান. খৃষ্টান প্রভৃতি জাতিগণও যদি এই নিখিল ভুবনে মানবরূপে জ্ঞাত হন, তাহলে ভুবনেশ্বর দেব তাঁদেরও সৃষ্টিকর্ত্তা, অর্থাৎ তাঁদেরও পিতাস্বরূপ। পিতার গৃহে সন্তান যদি প্রবেশ ক'রে, তাহলে কি সেই গৃহ কলুষিত হয় ? অবশ্য জানিনা, শাস্ত্রজ্ঞেরা এ বিষয় কি বলেন !

হায়রে ! আমি আবার ভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ ক'রে বসলুম ; এদিকে যে নিজ ধর্ম্মের সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁদের নীচজাতি বলে ধারণা করা হয়েছে, মন্দিরে প্রবেশ সম্বন্ধে কোন কোন স্থানে তাঁদেরই প্রতি কতই না অসহনীয় ব্যবহার করা হয়—মুসলমান-খৃষ্টান ত দূরের কথা ! সমাজিক শাসনের ভয়ে যেখানে ইচ্ছা সেখানেই পরমাত্মার ভোগ দিয়ে সকল বর্ণের হিন্দুজাতি একত্রিত ভাবে আহারাদি করতে পারেন না ; কিন্তু জগন্নাথক্ষেত্রে সকল বর্ণের হিন্দুজাতি ছোঁওয়া-অন্ন একত্রে বসে আহারাদি ক'রে থাকেন। শাস্ত্রের এটুকু অনুশাসন আছে বলেই হয়ত অনিষ্টের ভয়ে সকলে একত্রে আহার করতে দ্বিধা বোধ করেন না।

হিন্দুদিগের এই চরম তীর্থে এরূপ যদি একটা সংস্কার থাকতে পারে, তাহলে এই ভূমণ্ডলের প্রভু ব্রহ্মার স্বরূপ—বিষ্ণু ভগবান, যিনি বিষ্ণু তিনিই জগন্নাথ বা ভুবনেশ্বর, মানবজাতি যখন তাঁরই সৃষ্টি, তবে কেন ভুবনের সকল মানবই এই সকল দেব মন্দিরে প্রবেশাধিকার পায় না? জগন্নাথ ক্ষেত্রে একত্রে আহারাদির ন্যায়, এ বিষয়েও অন্ততঃ একটা সংস্কার যদি করা যায়, তাহলে আজ পৃথিবীর লোকে স্বচক্ষে এই সকল প্রাচীন হিন্দুদিগের কীর্ত্তি অবলোকন ক'রে অতীত ভারতের মহান্ আদর্শ চিরকালের জন্য মানস-পটে অঙ্কিত ক'রে নিতে পারবেন। এ বিষয় হিন্দু শাস্ত্রজ্ঞেরা যদি একটু বিবেচনা করেন, তাহলে কি শাস্ত্রানুযায়ী অধর্ম্ম করা হ'বে?

হিন্দুধর্ম্মকে সর্ব্বজনপ্রিয় করবার চেষ্টা করলে যদি অধর্ম্ম হয়, তবে পূর্ব্ব সংস্কার মতই নিজজাতীর মধ্যে চারিবর্ণের বিবাদ-বিসংবাদে দিন অতিবাহিত হোক্; সমাজনীতি কোনমতে বজায় রাখবার নিমিত্ত সামান্য কারণে অসহায় ব্যক্তিগণকে জাতিচ্যুতই করা হোক্, আর তারা একে একে, দুয়ে দুয়ে, ক্রমান্বয়ে ভিন্ন ধর্ম্মে দীক্ষিত হ'য়ে, প্রতিশোধ নেবার জন্য কেহ বা আবার অকস্মাৎ 'কালাপাহাড়'রূপে আবির্ভাব হোক্; আর তখন সমাজতন্ত্রীগণ দেব-দেবীর মূর্ত্তিগুলি লুকাইত করবার নিমিত্ত সভয়ে গুপ্তস্থানের অনুসন্ধানে ধাবিত হ'ন; অতঃপর চরম অত্যাচারের কবল হ'তে রক্ষা পেয়ে অতি দুঃখের সহিত নিজেদের দুরবস্থার বিবরণ উজ্জ্বল অক্ষরে লিপিবদ্ধ ক'রে ধর্ম্মের গরিমা চতুর্দ্দিকে প্রচার করতে থাকুন,—এই কি ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব?

আজ কোথায় চারিবর্ণ একত্রিত হ'য়ে স্বদেশভূমি রক্ষার্থে নিজ জাতির বৃদ্ধি করতে চতুর্দ্দিকে ধর্ম্ম-কাহিনী প্রচার করবার চেষ্টা করবে, তা' নয়, স্বধর্ম্মকে দিনে দিনে তুচ্ছ সংস্কারের নামে শক্তিহীন ক'রে দিচ্ছে। যদি পূর্ব্ব সংস্কারেই নিমগ্ন থেকে দিন অতিবাহিত করতে হয়, তাহলে

ভারতবাসীর দ্বারা ভারত শাসনের মনস্কামনা কতদূর যে সিদ্ধ হ'বে সে কথা ধারণা করা যায় না। যতই কেন না দেশ জাগ্রত হোক্— পঞ্চাশ জাতির বিভিন্নাভিপ্রায়ে 'ভারতমাতা', ক্রমান্বয়ে দুর্ব্বল হ'য়ে পড়বেন। যা'হোক্, ভ্রমণকাহিনীর মধ্যে এসব "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" এর মত অপ্রাসঙ্গিক 'অনধিকার' (?) চর্চ্চায় আর কাজ নাই।...........

সহর বলতে যা' মনে হয়, ভুবনেশ্বর ঠিক্ তা' নয়; ভুবনেশ্বর একটি প্রকাণ্ড গ্রাম। বেশীর ভাগই মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহ পথের দু-ধারে লক্ষ্য হয়। কয়েকটি সুন্দর বাংলো ধরণের ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহ লোকালয়ের অন্তরালে অবস্থান করছে। আর এই বৃহৎ গ্রামটির চতুঃপার্শ্বে হিংস্র বন্য-জন্তুপূর্ণ কাননশোভিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় বিরাজমান। অনন্তর ভুবনেশ্বরের সারবত্তা দর্শনীয় স্থানসমূহ অবলোকন পূর্ব্বক কেদারকুণ্ডের অতি উত্তম জল বোতলে পূর্ণ ক'রে বেলা সাড়ে দশটায় চিল্‌কা হ্রদের দিকে গতি নিয়ন্ত্রিত করলুম।

"জয় জগন্নাথজী-কি জয়"

পুনরায় সেই তিন মাইল পথ অতিক্রম ক'রে খণ্ডগিরিকে ডান পাশে রেখে 'খুরদার' রাস্তা ধরলুম। ভুবনেশ্বর থেকে খুরদা মাত্র ১৫ মাইল। এই পথটি পুনরায় 'কটক-মান্দ্রাজে'র সুন্দর রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। দু-পাশের বড় গাছগুলি প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণ বিস্তারের পথ বন্ধ করায়, পথটি শীতল ছায়াযুক্ত হ'য়ে থাকে। প্রায় ঘণ্টাখানেক সাইকেলের সঙ্গে 'কুস্তি' ক'রে 'খুরদা'য় পৌছলুম। এখানকার হাঁসপাতালের প্রধান ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৃহে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত গিয়ে পৌছতেই, তিনি আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন।

অপরাহ্নে চিল্‌কাহ্রদ অভিমুখে দ্বিচক্রযানের গতি নিয়ন্ত্রিত করা গেল। কয়েক মাইল অতিক্রম ক'রে বাধ্য হ'য়ে গাড়ী কাঁধে ঝপাং—ঝপ্ শব্দে হাঁটুভোর জল 'মদাগ্নী' অথবা মন্দাকিনী নদীর অপর পারে পদব্রজে উপস্থিত হলুম। রাস্তা জনপ্রাণীহীন—নির্জ্জন। ক্রমে ক্রমে নাতিউচ্চ পাহাড় শ্রেণী ও বনভূমি আরম্ভ হ'ল। এ সকল স্থানে অন্যান্য হিংস্র জন্তু অপেক্ষা ভল্লুকের অত্যাচারের ভয়ই বেশী। বৈকালের মৃদু-মন্দ পাহাড়ী দেশের জংলা বায়ু আমাদের ঘর্ম্মাক্ত দেহগুলি শীতল করায়, আমরাও বায়ু বেগে পথ অতিবাহন করতে লাগলুম।

অতঃপর সন্ধ্যা হ'য়ে এল; ক্রমশঃ সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হ'য়ে গেল। পথের ধারে একটি ইনেস্‌পেক্সন বাংলো দৃষ্টিগোচর হওয়ায়, এই মসীময় অন্ধকার রাত্রে অজানা জঙ্গল পথে আর পাড়ি দেওয়া সঙ্গত নয় ভেবে, ক্যাপ্টেন বাঁশীতে ইঙ্গিত করলে, গাড়ী হ'তে অবতরণ করবার জন্য। গাড়ী থেকে নেমে দেখি, বাংলোর দরজায় তালা বন্ধ। বড়ই হতাশ হ'য়ে পড়লুম; এখন কি করা যায়! বাংলোর চৌকিদারকে চীৎকার ক'রে ডাকা হ'ল; কিন্তু কোনই উত্তর পাওয়া গেল না

অগত্যা আরও কিছুদূর অগ্রসর হ'বার জন্য সাইকেলে আরোহণ পূর্ব্বক কয়েকপদ অতিক্রম করতেই, অদূরে ঘন বৃক্ষ-পল্লবের ফাঁকে প্রদীপের আলোর ন্যায় ক্ষীণ রশ্মি নিরীক্ষিত হ'ল। তথায় নিশ্চয় কোন ব্যক্তির সাক্ষাৎ পা'ব মনে করে, পদব্রজে সাইকেল হাতে ক্ষীণ-আলোক-রশ্মি অনুসরণ করতে লাগলুম।

এরূপে নিকটস্থ হ'য়ে টর্চ্চের সাহায্যে একত্রিত ভাবে অবস্থিত কতকগুলি গৃহ দেখা গেল। একটি গৃহের দাবায় উপবিষ্ট এক ভদ্রলোক আমাদের দেখতে পেয়ে নিকটে এসে হাজির হ'লেন। এঁর সহিত আলাপে অবগত হলুম, এ স্থানের নাম 'টাঙ্গি' (৭২৫ মাইল) এবং ইনি থানার ইনেস্‌পেক্টর শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত। অখিল বাবুকে বাংলোর চৌকিদারের কথা জিজ্ঞাসা করায়, ইনি বাধা দিয়ে আমাদের তাঁরই গৃহে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আমাদেরও বিশেষ সুবিধা ছাড়া অসুবিধা হ'ল না। অখিলবাবু খুব মিশুক লোক; উদর তুষ্টির পর এঁর সঙ্গে নানারূপ খোসগল্পে এমন মস্‌গুল হ'য়েছিলুম যে, যখন রাত্রি দেড়টা বাজলো, তখন আমাদের খেয়াল হ'ল—কাল ভোরেই যে চিল্‌কায় পাড়ি দিতে হ'বে! সুতরাং আর নয়, নিদ্রাদেবীকে স্মরণ ক'রে এখন নাসিকা-গর্জ্জনে মনোযোগ দেওয়া যাক।

২১ শে অক্টোবর :—'বরাকুল' থেকে চিল্‌কা হ্রদের দৃশ্য অতি মনোহর। টাঙ্গি থেকে বরাকুল ২১ মাইল। গতরাত্রে বিশাল চিলকা হ্রদের কথা এ রকমভাবে মনের ভিতর তোলপাড় আরম্ভ ক'রেছিল যে, নিদ্রাদেবী কাহাকেও আকর্ষণ করতে সাহস করেন নাই; ঘুম হ'ল না। অগত্যা ভোর চার-টের সময়ে টাঙ্গি পরিত্যাগ করলুম। অখিলবাবুও আমাদের সঙ্গে চিল্‌কা অবধি যাবার ইচ্ছায় তাঁর সাইকেল নিয়ে মিশে গেলেন।

পথে সেই এক ঘেয়ে পাহাড় আর পাহাড়; কিন্তু আজ এই এতদিনের হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর, বিশ্ব প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি চিল্‌কাহ্রদ

দেখবার আশায় এই অরুচিকে হটিয়ে দিয়ে ছুটে চললুম। ঘণ্টায় বারো মাইল হিসাবে সাইকেল চালিয়ে ছ-টা পনেরো মিনিটে বরাকুলের নিকটস্থ হলুম। হঠাৎ রাস্তা নীচের দিকে নামতে সুরু হ'ল। অদূরের ছোটবড় পাহাড়গুলি ক্রমশঃই পরিষ্কার দেখা যেতে লাগলো। ঐ অসীম আকাশ সহসা যেন মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে চতুর্দ্দিকে নীল রংএর এক বিচিত্র দৃশ্য সৃষ্টি ক'রে সকলকে ধাঁধাঁয় ফেলতে লাগলো। একেবারে বিস্মিত হ'য়ে এই নূতন দৃশ্য দেখতে দেখতে এগিয়ে চললুম। সম্মুখ হ'তে ঝলকে ঝলকে ঠাণ্ডা বাতাসের শীতল স্পর্শ ভেসে এসে হুইলার্সগণকে বিশাল চিল্কা হ্রদের আগমনী বার্ত্তা জানাতে লাগলো; গাড়ী হ'তে অবতরণ করলুম। নিকটেই একটি সুন্দর ডাক-বাংলো অবস্থিত। এখানে না কি ছোটলাট সাহেব বাহাদুর মাঝে মাঝে চিল্কার এই প্রাণ-মাতানো সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে এসে আস্তানা ফেলেন। আমরা বহুক্ষণ তীরে অবস্থান ক'রে নীরবে সম্মুখস্থ বিশাল জলরাশি অবলোকন করতে লাগলুম। একদিকে পাহাড় শ্রেণী এই প্রকাণ্ড হ্রদটিকে বেষ্টন ক'রে রেখেছে, অপর দিকে চিল্কার বিপুল জলরাশি গম্ভীরভাবে তার বিরাটত্ব জ্ঞাপন করছে। উজ্জ্বল আকাশের প্রতিবিম্ব এই শান্ত স্থির হ্রদে প্রতিফলিত হওয়ায়, মনে হয়—হ্রদটি কাঁচের আস্তরনে মণ্ডিত। মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপগুলি সবুজ গাছ-পালায় সাজানো পাহাড়গুলিকে বক্ষে ধারণ ক'রে যেন কি এক অপূর্ব্ব মিলনে তন্ময় হ'য়ে রয়েছে। বাস্তবিক, অতিবড় নীরস ব্যক্তির মনও বোধ হয় এখানে এলে একটু না একটু বিচলিত হ'য়ে পড়ে। নানা জাতীয় পক্ষীসকল ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে বিচরণ করছে ও হ্রদে অসংখ্য মাছ ভেসে ভেসে যেন 'লুকোচুরি' খেলছে।

জেলেরা তাদের ছোট ছোট 'শাল্তী' হ্রদের বক্ষে ভাসিয়ে মাছ ধরতে বেরিয়েছে। এদের নৌকা চড়া দেখে আমাদেরও নৌ-বিহারের ইচ্ছা হ'ল। জেলেদের নিকট হ'তে একটি শাল্তী ভাড়া ক'রে অসীম

চিল্‌কার বিশাল বক্ষে ক্ষণেকের তরে আশ্রয় নিলুম। চিল্‌কায় নৌ-বিহারে যে কি আমোদ, তা' যিনি না উপভোগ করেছেন, তিনি কিছুতেই উপলব্ধি করতে পারবেন না। কত শত শত পাখীর ঝাঁক্ মাথার উপর দিয়ে কলরব করতে করতে উড়ে চলেছে। এখানে পাখী শিকার করা খুবই সহজ। একজন অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও একটু লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ছুড়লে, অনায়াসে কিছু না কিছু শীকার করবেই,—তা' 'কাক' মারতে 'চিল'ই হোক্, আর যা-ই হোক্। পাখীর মধ্যে এখানে হাঁসের ভাগই বেশী। এই সকল হাঁস নাকি 'মানস-সরোবর,' 'সাইবেরীয়া' প্রভৃতি বহুদূর হ'তে এই সময় এখানে আসতে আরম্ভ করে। সমস্ত শীতকালটা চিল্‌কায় অতিবাহিত ক'রে, আবার তারা ঐ সকল দেশ-দেশান্তরে উড়ে চলে যায়।

এখানে আকাশে যেমন পাখীর ঝাক্, জলে তেমনি অসংখ্য মাছ হ্রদে এক প্রকার মাছ আছে, তাদের নাকি রাত্রি ব্যতীত ধরা দুস্কর ছিপ্ কিম্বা জাল ফেলে এ মাছ ধরা যায় না। এ মাছ ধরার বিশেষত্ব আছে। জেলেরা নৌকায় আগুন জ্বেলে এদিক ওদিক ঘুরতে থাকে, আর সেই আগুন দেখে মাছগুলি 'দেওয়ালী পোকার' মত দলে দলে নৌকার ভিতর ঝাঁপ্ দিয়ে পড়ে। আশ্চর্য্য! শেষে এত মাছ নৌকায় ভর্ত্তি হ'য়ে যায় যে, নৌকা জলমগ্নের ভয়ে বাধ্য হ'য়ে রাশি রাশি মাছ ফেলতে ফেলতে জেলেরা ঘাটে এসে উপস্থিত হয়। এই মাছের নাম 'তারুই'; অনেকটা আমাদের দেশের 'ভাঙ্গন' মাছের মত। এ ছাড়া ইলিশ, চিংড়ী ইত্যাদি মাছও যথেষ্ট পাওয়া যায়। প্রত্যহই বহুদেশে এখান থেকে ঐ সকল মাছ রপ্তানী হয়। আমাদের সামনেই একজন জেলে দু-ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বারো মণ 'ইলিশ' জাল ফেলে তুললে।

এই ভারতবর্ষের মধ্যে চিল্‌কা-হ্রদই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হ্রদ; কিন্তু ভৌগলিকেরা একে ঠিক্ হ্রদ বলে আখ্যা দেন নাই, কারণ চিল্‌কা

একস্থানে বঙ্গোপসাগরের সহিত মিলিত হয়েছে। ইংরেজীতে একে 'লেগুন' বলে থাকে। সেজন্য আজ কাশ্মীরের 'উলার-হ্রদই' সর্ব্বসাধারণের নিকট ভারতের মধ্যে বৃহৎ বলে পরিচিত। চিল্‌কাহ্রদ দৈর্ঘে প্রায় ৪৪ মাইল, প্রস্থে প্রায় ২০ মাইল এবং পাঁচ-ছয় ফিট্ মাত্র গভীর। চিল্‌কার জল সব সময় লবণাক্ত হয় না, মাত্র গ্রীষ্মকালে কখন কখন লবণাক্ত হ'য়ে পড়ে। এরূপে বহুকালের আশা চিল্‌কা হ্রদ দেখা সাঙ্গ ক'রে, বেলা দশটার সময় বরাকুল পরিত্যাগ করলুম। পুনরায় সেই পুরাতন পথ ধরে টাঙ্গিতে অখিল বাবুকে বিদায় দিয়ে, খুরদায় ডাক্তার বাবুর গৃহে ফিরে এলুম। এখানে কয়েক ঘণ্টা মাত্র বিশ্রাম ক'রে খুরদাকে পিছনে রেখে ডেলাঙ্গের পথে ৺পুরীধাম অভিমুখে রওনা হলুম।

ডেলাঙ্গের পথ খুব ভাল নয়। পথের উপর বালুকারাশি ও ইষ্টক খণ্ড কে যেন বিক্ষিপ্ত করেছে। মাঝে মাঝে নাতি উচ্চ পাহাড় ও জঙ্গল। ঈষৎ আঁধার মিশ্রিত বৈকালের আলো যখন সন্ধ্যায় পরিণত হ'ল, শৃগাল ভায়ারা উচ্চৈঃস্বরে ডেকে ডেকে প্রথম প্রহর রাতের কথা জানিয়ে গেল ক্যাপ্টেনের হুকুম পেয়ে গাড়ীর আলো জেলে নিয়ে, উৎরাই পথে নামতে শুরু করলুম। হু হু ক'রে নামতে নামতে হঠাৎ আমার গাড়ীর সামনের চাকাটা কে যেন সজোরে চেপে ধরলে; তৎক্ষণাৎ ঠিক্‌রে গড়াতে গড়াতে কয়েক গজ দূরে এক বৃক্ষমূলে আমার দেহ বাধা পাওয়ায়, এ যাত্রা রক্ষা পেলুম; নচেৎ প্রায় ৫০ ফিট্ নিম্নে এক খাদের মধ্যে আশ্রয় নিতে হ'ত।

আমি ছিলুম প্রথমে, দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার এই শোচনীয় অবস্থা দেখেই বাঁশী বাজিয়ে সকলকে থামবার নির্দ্দেশ করায়, সকলে গাড়ী হ'তে অবতরণ ক'রে আমার নিকট উপস্থিত; আমিও অতি কষ্টে উঠে বসলুম একেবারে জখম হইনি; শরীরের কয়েকটি ক্ষতস্থান টিঞ্চার আয়োডিন ও ব্যাজিনের সাহায্যে ব্যাণ্ডেজের দ্বারা বাঁধা হ'ল এবং ইতিমধ্যে মাষ্টার-

মেকানিকও আমার ছিট্‌কে পড়া গাড়ীটাকে পরীক্ষা ক'রে দেখলে, বিশেষ কিছুই হয়নি। পথের উপর বিরাজমান একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরখণ্ডই আমার এই আকস্মিক পতনের কারণ।

যা'হোক্, অল্পক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার যাত্রা আরম্ভ করলুম। সম্মুখে টর্চ্চের আলো নিক্ষেপ করায় দেখি যে, ক্ষুদ্র একটি নদী নিঃশব্দে নিজের খেয়ালে ব'য়ে চলেছে। এরূপ নদীগুলি ক্ষুদ্র হলেও এত বেয়াড়া যে, মানুষকে পার ক'রে দেবার ব্যবস্থা করতে, তারা একেবারেই নারাজ। নদী দেখে বড়ই রাগ হ'ল; বুঝি জুতো মোজা খুলে আবার স্কন্ধে গাড়ী নিতে হ'বে। কিন্তু তীরে পৌঁছে দেখি, এই ক্ষুদ্র নদীটির আমাদের মত ক্লান্ত ভবঘুরের উপর অশেষ দয়া। এই নির্জ্জন স্থানে একটি বয়োঃবৃদ্ধ ব্যক্তি নৌকার উপর বসে বসে নিশ্চিন্ত মনে তামুক সেবনে মত্ত; দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। লোকটি খেয়া পার করে। তাকে নদীর কি নাম জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল, 'দয়ানদী'। আহা! বড়ই সুন্দর নাম; এই নির্জ্জন স্থানে তিনি, এহেন ক্লান্ত পথিকদের পার ক'রে দেবার ব্যবস্থা দয়া ক'রেই ক'রে রেখেছেন। অতঃপর দয়া-নদীর অশেষ দয়ায় আমরা সহজেই পরপারে গিয়ে হাজির হলুম।

রাত্রি তমোময়। পথের দু'পাশে জঙ্গল যদিও গভীর নয়, তথাপি গাঢ় অন্ধকার রাত্রে অতি-ভীষণ-রূপ ধারণ করেছে। সাবধানে মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে চলেছি। বনের ভিতর কতকগুলি পেচক বীভৎস চীৎকারে আমাদের চম্‌কে দিলে। পুনর্ব্বার শৃগাল ভায়ারা উচ্চরবে ডেকে ডেকে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের কথা জানিয়ে গেল।

ক্যাপ্টেনের গাড়ীর আলোর জ্যোতি বেশী তাই সে প্রথমে যাচ্ছিল; অকস্মাৎ সে হৈ হৈ চীৎকার ক'রে স্ব-ইচ্ছায়েই গাড়ী সমেত

পথোপরি ধরাশায়ী হ'ল। ফলে সকলেই গাড়ী সমেত পর পর ভূতলে গড়াগড়ি দিতে বাধ্য হলুম। ক্যাপ্টেনকে এরূপ পতনের কারণ জিজ্ঞাসা করবার আর দরকার হ'ল না; উঠে দেখি কি ভীষণ! ক্যাপ্টেন যে স্থানে ঐরূপ ভাবে ধরাশায়ী হয়, তথা হ'তে প্রায় পাঁচ হাত দূরেই পথটি একটি খাদে পরিণত হয়েছে। প্রায় ২৫ ফিট্ নিয়ে ক্ষুদ্র একটি ঝর্‌ণা কুল কুল ধ্বনিতে প্রবাহিত দেখা গেল। এর উপর একটি সেতু ছিল, কিন্তু বন্যায় তা' কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! ডান দিক দিয়ে অনেকটা নিচে নেমে টর্চ্চের সাহায্যে অতি সাবধানে জুতো মোজা খুলে হাঁটুভোর জল পার হ'য়ে গেলুম।

এবার খুব সাবধানে এই অন্ধকারময় রাতে পথ অতিবাহিত করতে লাগলুম। ক্রমাগত এব্ড়ো-খেব্ড়ো, উঁচু-নিচু রাস্তায় সাইকেল চালাতে চালাতে শরীর পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়লো। ঘুমের ঘোরে চক্ষুদ্বয় ঢুলে ঢুলে পড়তে লাগলো। পা যেন আর চলে না। কোন গতিকে এগিয়ে চলেছি; শৃগাল ভায়ারা আবার সেই চীৎকার ক'রে উঠলো, এবার বোধ হয় তৃতীয় প্রহর রাতের কথা জানিয়ে দিলে। দূরে কতকগুলি আলো দেখা গেল। অতিকষ্টে আলোর নিকট উপস্থিত হ'য়ে দেখি, 'ডেলাঙ্গ রেল ষ্টেশন' (৮০৭ মাইল)। রাত্রি দেড়টার সময় ক্ষুধার্ত্ত হুইলার্সগণ অনশনে ষ্টেশন গৃহের দাবায় কম্বলের উপর অবসন্ন দেহ বিস্তার ক'রে স্বর্গ-সুখ উপভোগ করলে। অন্যদিন অপেক্ষা আজ আমাদের দৌড় বেশী হয়েছে—একেবারে ৮২ মাইল।

২২শে অক্টোবর:—আজ ২১ দিনের পর কত শত দেশ, পাহাড়, অরণ্য ও নদ-নদী অতিক্রম ক'রে গন্তব্য-স্থান ৺পুরীধামে পদার্পণ করবো, সকলের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো। সবে মাত্র দিন-মণির রাঙ্গা আভায় আলো করা পথের উপর দিয়ে মৃদু গতিতে ডেলাঙ্গের ক্ষুদ্র রেল-ষ্টেশনটি ছেড়ে রেখে শ্রীক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে গানে মত্ত

হ'য়ে এগিয়ে চলেছি। আমাদের রিপোর্টারকে কোনদিনও সঙ্গীতে যোগদান করতে দেখা যায়নি; কিন্তু আজ সে বোধ হয় ভ্রমণ চক্রের চক্র হ'তে নিস্তার পাবে জেনে, আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে আমাদের গানের সঙ্গে যেমনভাবেই হোক্ সুর দিতে দিতে চললো।

এতদিনে সত্য সত্যই অরুচিকর জঙ্গলগুলি, ছাই রংএর পাহাড়গুলিকে সঙ্গী ক'রে যেন, পিছন দিকে ছুটতে ছুটতে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। এরূপে ছ-মাইল অতিক্রম ক'রে 'পাটনায়িকা' গ্রামে এসে সেই জগন্নাথ রোড্ ধরলুম। এখান থেকে ৺পুরীধাম তেরো মাইল মাত্র। সুন্দর সমতল রাস্তা। কিছুদূর আসতেই 'সাক্ষী গোপাল' গ্রাম। এখানে একটি সুন্দর গোপালের মূর্ত্তি বিদ্যমান। লোকে বলে, সাক্ষী-গোপাল দেব দর্শন না করলে ৺পুরীধামের জগন্নাথদেব দর্শন সার্থক হয় না। সুতরাং ডান পাশের রাস্তা ধরে আমরাও মন্দিরাভিমুখে রওনা হলুম।

প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ মন্দিরটি 'গুপ্ত-বৃন্দাবন' নামক প্রকাণ্ড একটি উদ্যান মধ্যে অবস্থিত। আমাদের মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করতে বেশ বেগ পেতে হ'ল। কারণ এরূপ আধা-সাহেবী পোষাক দেখে উড়িয়া পাণ্ডা মহোদয়গণ মহাগোলযোগের সৃষ্টি করলেন। অগত্যা যেনতেন-প্রকারেণ আমরা হিন্দু প্রমাণ করায়, মন্দিরে প্রবেশাধিকার পাওয়া গেল বটে; কিন্তু পাণ্ডাগণ গোপালজীর ভোগের জন্য কয়েকটি টাকা পাবার আশায়, আমাদের ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললে। এ এক বিপদে পড়া গেল; এতটা পথ অতিবাহন করায়, সামান্যমাত্র সঞ্চিত ধন আমাদের সঙ্গে আছে। বাধ্য হ'য়ে পাণ্ডাঠাকুরদের বুঝিয়ে দিলুম,—

"আমাদের সঙ্গে টাকাকড়ি কিছুই নাই। টাকা না নিয়ে তোমরা যদি গোপালজীকে দর্শন করতে না দাও তাহলে জোর ক'রে ঠাকুর দর্শন করতে আমরা চাই না। তোমাদের এ জমিদারী বিশেষ; যদি জোর ক'রে প্রবেশ করি, তোমরা আমাদের বিতাড়িত করবার জন্য

অনেক প্রকার ভোজবাজী দেখাতে পার জানি। কিন্তু আমরা যাঁকে দর্শন করতে এসেছি, তিনি অন্তর্য্যামী ন'ন কি? তাঁকে তুমি আমি টাকা কি দেব? সবই ত তাঁরই। জগতের সকল লোককে তিনিই ত সব দিচ্ছেন, নয় কি? তবে তোমরা এই ঠাকুরের নাম ক'রে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য অনেক গরীব দুঃখীর নিকট হ'তেও জোর জবর-দস্তিতে নানারকম শাস্ত্রের কথা আওড়ে ভয় প্রদর্শন ক'রে সর্ব্বস্বান্ত করতেও দ্বিধা বোধ কর না। এতে ঠাকুর কি তোমাদের অধর্ম্মের কথা জানতে পারেন না মনে কর? তোমাদের প্রতিপালনের নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ আশা কর ত আমরা দিতে পারি; কিন্তু গোপালজীর নাম ক'রে বলপূর্ব্বক আমাদের নিকট 'তে কিছুই আদায় করতে পারবে না। আমরা এই দ্বার থেকেই ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম ক'রে বিদায় নিচ্ছি,—তিনি যখন অন্তর্য্যামী তখন নিশ্চয় অবগত হবেন যে, পাণ্ডা-গণের ব্যবহারে তাঁর সাকার মূর্ত্তির দর্শন না পেয়ে একদল ভক্ত দ্বার হ'তে ফিরে গিয়েছে। মানুষের জন্ম মৃত্যু ত আছেই; তা' তোমরা মৃত্যুর পর স্বর্গে অথবা নরকে গিয়ে তাঁর নিকট এ বিষয় জবাবদিহি করো। তবে এখন চল্লুম—প্রণাম হই।"

অবশ্য প্রণাম করলুম গোপালজীর উদ্দেশ্যেই। আমাদের এরূপ বক্তৃতাতে পাণ্ডাঠাকুরেরা সহসা নম্রমূর্ত্তি ধারণ ক'রে সাদরে মন্দির মধ্যে অভ্যর্থনা করলেন। বক্তৃতা বৃথা গেল না দেখে, আমরাও ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলুম। পাণ্ডাগণ সসব্যস্তে মন্দিরের সকল স্থান উত্তমরূপে দর্শন করালেন। মন্দিরটি নেহাৎ ক্ষুদ্র নয়। মন্দির-গাত্রে নানারূপ বিচিত্র চিত্র পূর্ণ। পাশে একটি 'তমাল বৃক্ষ' আছে। পাণ্ডাগণের নিকট শুনলুম, এই বৃক্ষমূলে বিশ্বপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, বিশ্বপ্রেমকা শ্রীরাধিকাকে বিশ্বপ্রেম দান ক'রে ছিলেন। এই বৃক্ষের সহিত সকল যাত্রীদের একবার ক'রে আলিঙ্গন করতে হয়। যা'হোক, বিদায়কালে

পাণ্ডাঠাকুরেরা মাত্র আট-গণ্ডা পয়সা পুরস্কার লাভ ক'রে, দু-হাত তুলে আমাদের আশীর্ব্বাদ করলেন।

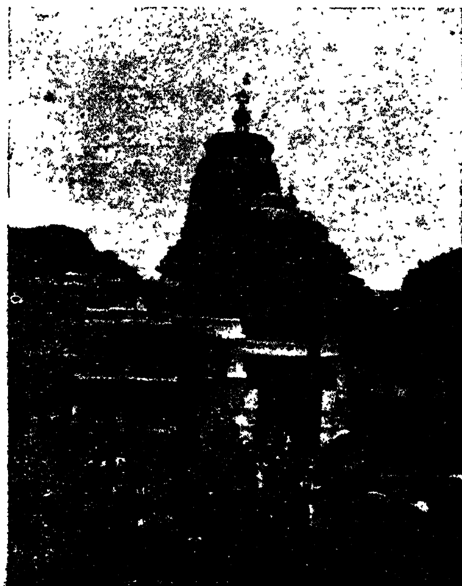
সাক্ষীগোপাল গ্রাম পরিত্যাগ ক'রে এবার হু হু শব্দে জগন্নাথ রোড অতিক্রম করতে লাগলুম। দু-পাশে সবুজবর্ণ ক্ষেত ও নারিকেল বৃক্ষরাজি পথের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করেছে। অনেক গ্রাম পার হ'য়ে 'দামোদরপুর' গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে সেতুবিহীন 'দণ্ডভাঙ্গা' নদীর ধারে হাজির হলুম। পূর্ব্বে এই নদী 'ভার্গসী' নামে অভিহিত ছিল। এই গ্রাম হ'তে কিয়ৎদূরে অষ্টাদশ সংখ্যক ফোকর বিশিষ্ট নদীর উপরিস্থ সেতু থাকায়, ইহা 'আঠারো নালা' নামে খ্যাত। কিম্বদন্তী আছে, এই সেতু পুরাকালে রাজা মৎস্যকেশরী নির্ম্মাণ করান। কিন্তু এস্থানে খেয়া পারের নৌকা থাকায়, আমরা অনায়াসে নদী পার হ'য়ে গেলুম।

কয়েক গজ অতিক্রম ক'রে পরম তীর্থ ক্ষেত্রের বিরাট মন্দিরের চূড়াটি অবলোকিত হওয়ায়, আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে, "জয় জগন্নাথজী-কি জয়" বলতে বলতে তীর বেগে ছুটে চললুম। অকস্মাৎ 'অসময়ের বাঁশী' এ হেন পবিত্র লক্ষ্যভেদে বাধা প্রদান করলে। যা'হোক্, গাড়ী চালানো স্থগিত রেখে দেখি বিপদ এমন কিছুই নয়, 'টিউব লিক্'—তবু রক্ষে! মাষ্টার-মেকানিকের গাড়ীর আজ এই প্রথম টিউব লিক্। এতটা পথ অতিবাহন ক'রে আজ পর্য্যন্ত হুইলার্সগণ-এর মোট পাঁচবার মাত্র এই ঝঞ্ঝাটে পড়তে হ'ল।

রাধু লিক্ সারাতে লাগলো। আমাদের এভাবে হঠাৎ দাঁড়াতে দেখে স্থানীয় ব্যক্তিগণ গোদা গোদা পা নিয়ে ব্যস্ত হ'য়ে মেকানিকের এই বিচিত্র কাজ দেখবার জন্য ভীড় ক'রে দাঁড়ালো। নিকটস্থ গ্রামের বধুরা হরিৎ বরণ বস্ত্রে ভূষিত হ'য়ে, কলসী কাঁকে এক হস্ত পরিমাণ লম্বা ঘোমটার অন্তরাল হ'তে, আমাদের অপরূপ মূর্ত্তি একবার নিরীক্ষণ ক'রেই, প্রকাণ্ড নথ দুলিয়ে স্মিত বদনে স্থানান্তরে চলে গেল। এদিকে

কেশবিহীন মস্তক নিয়ে বালকেরা অতি সন্তর্পণে আমাদের প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে ভয়ে ভয়ে এক-পা, দু-পা ক'রে এগিয়ে এল। অতঃপর লিক্ সারা হ'য়ে গেল, আবার আমরা "জয় জগন্নাথজী-কি জয়," বলতে বলতে দু-পাশে জলাভূমির মধ্যে পথ অতিবাহিত করতে লাগলুম।

অনন্তর এতদিনের দারুণ পরিশ্রমের পর, বিউগ্‌লে 'মার্চ্চিং' বাজাতে বাজাতে সুবিখ্যাত হিন্দুদিগের পরম তীর্থক্ষেত্র পুরীধামে (৮২৬ মাইল) উপনীত হ'য়ে, স্মরণাতীত কালের হিন্দুজাতির চরম কীর্ত্তি বিশাল জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখে বেলা ন-টার সময় উপস্থিত হলুম এবং এ বৎসরের মত 'ক্যালকাটা হুইলার্স' এর বেয়াড়া হাওয়া খাওয়ার বিবরণও সাঙ্গ করলুম।



জয় জগন্নাথজী-কি জয়

ভ্রমণের নেশা

মেঘের দেশে

তৃতীয়বারের ভ্রমণ-কাহিনী



এলবার্ট হলে বিদায়-সম্ভাষণ

ক্লাবের সভ্যগণের মধ্যে সম্মুখে রায় জলধর সেন বাহাদুর, তাঁর ডান পার্শ্বে সভাপতি এল-টি কর্ণেল স্টৌভল্ড, ও বাম পার্শ্বে কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য, ভাইসরয়গণ, বাম-দিক হইতে—

মেঘের দেশে

"কলকাতা পরিত্যাগ"

ইংরেজী ১৯২৮ সাল। ক্লাবের অধিবেশনে স্থির হ'ল এবার সাইকেলে 'দার্জ্জিলিং' এ পাড়ি দিতে হবে। কার্য্যকরী সমিতির দ্বারা নিম্নলিখিত ছ-জন সভ্য যাবার জন্য প্রস্তুত হ'ল ;—মণীন্দ্র মুস্তোফী (ক্যাপ্টেন), জহরলাল দত্ত (কোয়ার্টার-মাষ্টার), শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (রিপোর্টার), রাধারমণ দত্ত (মাষ্টার-মেকানিক্), কিশোরী মোহন দাস (কর্পোরাল) এবং নরেন্দ্র ঘোষ (বিউগ্‌লার)। গরম পোষাকাদি এবার আমাদের নিতে হ'ল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কারণ, শীতের দেশে যেতে হচ্ছে। আর সকল সাজ-সরঞ্জাম নিয়মানুযায়ী পূর্ব্বের মতই নেওয়া হ'ল। ক্লাবের পৃষ্ঠ-পোষকগণ যথাসাধ্য সাহায্য করলেন। এবার প্রত্যেক সাইকেল ওজন ক'রে দেখা গেল, দ্রব্য-সামগ্রী সমেত প্রায় একমণ-সাতসের ক'রে দাঁড়িয়েছে।

২৩ শে সেপ্টেম্বর :—আজ আমাদের যাত্রার দিন ধার্য্য করা হয়েছে। এ বৎসরেও লেপ্টন্যাণ্ট্ কর্ণেল, ষ্টোভল্ড্ এরই সভাপতিত্বে আমাদের বিদায় সম্ভাষণের জন্য পৃষ্ঠপোষকগণ গোলদীঘীর নিকট 'এলবার্ট হলে' একটি সভার আয়োজন করায়, আমরা বেলা দেড়টার সময় ক্লাব (১৯ বি, রাজেন্দ্রলাল ষ্ট্রীট্, মানিকতলা) থেকে বহির্গত হয়ে তথায় উপস্থিত হলুম। বেলা সাড়ে তিনটের সময় সভা ভঙ্গ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে বিউগ্‌ল-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক একবার কম্পিত হয়ে উঠ্‌লো। উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট বিদায় নিয়ে দ্বিচক্রযানে আরোহণ ক'রে 'হুইলার্স'গণও পুনরায় কলকাতা পরিত্যাগ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো।

বঙ্গেশ্বরী-কটন্-মিলের ম্যানেজিংডিরেক্টর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্র নাথ মল্লিক

মহাশয়ের কথামত 'শ্রীরামপুরে' বৈকাল সাড়ে পাঁচটায় পৌঁছে, তাঁর বাড়ীতেই অতিথি হলুম। রাত্রে বিস্তর লোক জমায়েৎ হওয়ায়, গান বাজনার খুব মজ্‌লিস্‌ জমানো গেল ও তার সঙ্গে আমি আবার সামান্য 'ম্যাজিক'ও দেখিয়ে দিলুম। এইরূপে অনেক রাত পর্য্যন্ত হৈ হৈ ক'রে কাটান গেল

হ্যাঁ! অনেকে বোধ হয় ভাবছেন যে, দার্জ্জিলিংএর পথে শ্রীরামপুর এলো কেন? 'দম্‌দম্‌' কিম্বা 'বেলঘোরে' আসা উচিত ছিল। কিন্তু দম্‌দম্‌, রেলঘোরে অর্থাৎ কলকাতার পূর্ব্বদিক দিয়ে দার্জ্জিলিং যাবার তেমন সুবিধাজনক পথ নাই। একমাত্র ভাল রাস্তা হ'ল কলকাতা থেকে 'অণ্ডাল' গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড্‌ ধরে গিয়ে, তারপর ডান দিকে ভিন্ন একটি পথ ধরতে হ'বে। এই পথে শিউড়ী, ভাগলপুর পূর্ণিয়া এবং শিলিগুড়ি হয়ে দার্জ্জিলিং যেতে হ'বে! আমাদের উক্ত রাস্তা অতিবাহন ক'রে দার্জ্জিলিং এ পাড়ি দেওয়া স্থির হয়েছে। 'পানাগড়ে'র নিকট 'কাঁক্‌সা' নামে এক গ্রাম আছে, এখান থেকে 'ডিস্‌ট্রিক্ট বোর্ডে'র একটি পথ শিউড়ী অবধি গিয়েছে এবং বর্দ্ধমান ছাড়িয়ে 'খানা'জংসনের কাছ থেকে আর একটি রাস্তা 'বোলপুর' হয়ে শিউড়ী পর্য্যন্ত গিয়েছে। এই দু-টি পথ ধরেও শিউড়ী অবধি গিয়ে দার্জ্জিলিং এ যাবার ঐ একই রাস্তা ধরা যায়।

"রইল বাকি চার!"

২৪ শে সেপ্টেম্বর :—শ্রীরামপুর থেকে মল্লিক মহাশয় মোটরে চেপে 'চন্দরনগর' অবধি পৌঁছে দিয়ে যখন বিদায় নিলেন বেলা তখন দশ-টা। আজ আমাদের 'মেমারী'তে এক বন্ধুর বাড়ীতে থাকবার কথা। কিন্তু ৩৫ মাইলে 'গো' গ্রামের নিকট ভীষণ বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। অগত্যা কুঁড়ে ঘরের দাবায় আশ্রয় নিলুম। ঠিক্ সময়ে মেমারী পৌঁছতে পারবো বলে মনে হ'ল না।

আমরা যখন বৃষ্টির ঝাপ্‌টায় অস্থির হ'য়ে কুঁড়ে ঘরের দাবায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছি, হঠাৎ তখন দু-টি 'মানিক জোড়' পাখী উড়ে যাচ্ছে দেখে, রিপোর্টার বন্ধুর শীকারের ঝোঁক্ চেপে গেল "ওয়াটারপ্রুফ"টি সর্ব্বাঙ্গে আবৃত ক'রে, জুতো মোজা পরিত্যাগ ক'রে বন্দুক সহ কর্দ্দমাক্ত গ্রাম্যপথ অতিবাহন পূর্ব্বক একটি পাখীর ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে ফিরে এল। অগত্যা কোয়ার্টার-মাষ্টারের কৃপায় পাখীটার সদ্‌গতি হ'ল, অর্থাৎ কোনরূপে পুড়িয়ে লবণ ও গোলমরিচের দ্বারা দগ্ধ পক্ষী-মাংস উদরসাৎ করা গেল। অতঃপর বৃষ্টি কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। রাত সাড়ে সাতটায় মেমারী পৌঁছে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারীর বাড়ীতে রাত্রের মত আস্তানা গাড়লুম।

২৫ শে সেপ্টেম্বর :—প্রত্যুষে মেমারী পরিত্যাগ করলুম। 'বর্দ্ধমানে স্নানাহার শেষ ক'রে সন্ধ্যা ছ-টায় বর্দ্ধমান ছেড়ে প্রায় মাইল পাঁচেক যাওয়ার পর, হঠাৎ কর্পোরালের পেটে বেদনা (colic) ধরলো। প্রায় ঘণ্টা দুই বিশ্রামের পর সে সুস্থ হ'লে আবার দৌড় আরম্ভ হ'ল। কিন্তু 'গোলসী'র কাছে এসে তার পুনরায় সেই বেদনা অসহনীয়ভাবে আক্রমণ করায়, সে বেচারাকে একেবারে অস্থির ক'রে তুললে

বিষম বিপদ! আশ্রয়ের চেষ্টায় গোলসী থানার ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়ের সহিত দেখা করলুম। তিনি থানার ইনেস্‌পেক্সন্‌ কামরাটি আমাদের জন্য দয়া ক'রে ছেড়ে দিলেন। বহুক্ষণ সেবা শুশ্রূষার পর তার ব্যাথাটা একটু কমলো; কিন্তু এ রকম অবস্থায় সে নিজেই যখন আর এগুতে সাহস করলে না, তখন আমরা দুঃখিত মনে কলকাতায় প্রতিনিধির নিকট টেলিগ্রাম ক'রে রাত্রের গাড়ীতে কর্পোরাল কিশোরী মোহন দাসকে বাড়ী পাঠাতে বাধ্য হলুম।

২৬ শে সেপ্টেম্বর :—গোলসী থেকে একজনকে বিদায় দিয়ে আমাদের মন বড়ই খারাপ হয়েছিল; আবার পানাগড়ে পৌছে আমাদের বিউগ লারের নামে এক টেলিগ্রাম দেখেই সন্দেহ হ'ল, এবার এর বুঝি বাড় থেকে শমন জারি হয়েছে। টেলিগ্রাম পড়ে দেখি, ঠিক্ তাই। বিশেষ কোন জরুরী কাজের জন্য বিউগ্‌লালের ডাক পড়েছে, যেতেই হবে। এখন পানাগড়ে কলকাতা যাবার গাড়ী নাই, কাজেই সে অণ্ডাল থেকে বিদায় নেবে ঠিক্ হ'ল।

দুর্গাপুর জঙ্গল পার হয়ে 'ভিরিঙ্গী' গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত 'বসন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথামত তাঁর বাড়ীতে মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম ক'রে সন্ধ্যা ছ-টার সময় ১২২ মাইলে উপস্থিত হলুম। এখান থেকে দু'টি রাস্তা বেরিয়েছে। ডানদিকের রাস্তা শিউড়ীর দিকে গেছে, এখান থেকে ৩৮ মাইল; এবং বাঁ-দিকের রাস্তা গেছে অণ্ডাল পর্য্যন্ত, এখান থেকে দু'মাইল। বিউগ্‌লারকে বিদায় দেবার জন্য আমরা অণ্ডালে এসে হাজির হলুম।

অণ্ডাল-রেলওয়ে-ইন্‌ষ্টিটিউটের সভ্যগণ এখানে আজ রাতটা কাটাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন। আরো যখন শুনলুম, বিউগ্‌লারের কলকাতা যাবার গাড়ী ভোরের দিকে, তখন রাতটা একসঙ্গেই কাটিয়ে দেবার বাসনা করলুম। যা'হোক্, ইন্‌ষ্টিটিউটে গান-বাজনা ও ম্যাজিকের

মধ্য দিয়ে এক রকমে রাত্রি অতিবাহিত ক'রে ভোরের গাড়ীতে আমাদের বিউগ্‌লার নরেন্দ্র ঘোষকে তুলে দিয়ে বিদায় নিলুম। মন বড়ই খারাপ হয়ে গেল, ছ'জন এক সঙ্গে বেরিয়ে—এখন রইল বাকি চার!

"ভাগলপুর অভিমুখে"

২৭শে সেপ্টেম্বর ঃ—অবশেষে অণ্ডাল থেকে 'হারাধনের চারটি ছেলে'র মত আমরা শিউড়ির পথে ধাবিত হলুম। ১৬ মাইল অতিক্রম ক'রে, কল কল নাদে নিনাদিত, খরস্রোত সেতুবিহীন 'অজয়' নদের কূলে এসে হাজির। এ সময় অজয়নদে ভীষণ জল; পারাপারের কোন বন্দোবস্ত না থাকায়, কিছুদূরে রেলের সেতু দেখতে পেয়ে, প্রায় দেড় হাত চওড়া বাঁধের উপর দিয়ে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে সকলে নদীর পরপারে উপস্থিত হলুম।

সেতু অতিক্রম ক'রে বর্দ্ধমান জিলা ছেড়ে এবার 'বীরভূম' জিলায় পদার্পণ করলুম। একটি গাছ তলায় অল্পক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া গেল। কোয়ার্টার-মাষ্টারের কৃপায় বিশ্রামটা খুব আরামেই সাধিত হ'ল; কারণ সে তাড়াতাড়ি চার পেয়ালা চা তৈরী ক'রে ফেললে।

এখানকার রাস্তা বেশ চওড়া ও পরিষ্কার। কিন্তু সূর্য্যদেবের চড়্‌চড়ে তাপের আধিক্যে মাথায় টুপি থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মতালু ফাটবার উপক্রম হ'তে লাগলো। অজয়নদ থেকে চার মাইল আসার পর 'হিংলু' নামে এক নদী এবং হিংলু থেকে চার মাইলের পর 'শাল' নামে আর একটি নদী পড়লো। এই দু-টি সেতুবিহীন নদী, জুতো-মোজা খুলে গাড়ী কাঁধে ক'রে পার হ'তে হ'ল। হিংলুতে কোমর পর্য্যন্ত জল থাকায় 'হাফ্‌ প্যাণ্টটি' অবধি দেহচ্যুত করতে হয়েছিল।

এরূপে 'দোবরাজপুর' নামে বীরভূম জিলার একটি মহকুমায় উপস্থিত হলুম। এ স্থানে অনেক লোকের বাস; বাজারটি নেহাৎ ছোট নয়। মাড়োয়ারী ভায়ারাও এ স্থানে বিস্তর দোকান পাট খুলে খদ্দেরের আশায় বসে রয়েছেন। বাজারের কাছে একটি খাবারের দোকান দেখে, সেখানে ওঠা গেল। স্নানাহার সাঙ্গ ক'রে বেরুতে প্রায় তিনটে বাজলো।

বেশ যাচ্ছিলুম, হঠাৎ কোথা থেকে একখণ্ড মেঘ সূর্য্যদেবকে আবৃত করলে। দেখতে দেখতে ঝমাঝম্ শব্দে প্রবলধারে বৃষ্টি নামলো। ত্রস্ত-গতিতে একটি বৃক্ষমূলে আশ্রয় নিলুম। প্রায় ঘণ্টা দুই পরে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল,—আমরাও পুনরায় গাড়ীতে চেপে বসলুম।

কিছুদূর যেতেই সম্মুখে দেখি, প্রায় দু-হাত লম্বা গাছের একটা সরু ডাল রাস্তার মাঝখানে পড়ে রয়েছে। আমার গাড়ীর সম্মুখের চাকা চল্‌তে চল্‌তে যেমন গিয়ে সেই ডালকে ধাক্কা মেরেছে, অম্‌নি ডালটি



শিউড়ী, মৌরাক্ষী নদীতে আরামে সাঁতার কাটা

এক সাপে পরিনত হয়ে ফোঁস ক'রে প্রায় চার ইঞ্চি মাটিতে ভর দিয়ে ফণা তুলে সোজা দাঁড়িয়ে উঠ্‌লে।

হঠাৎ এ রকম ব্যাপার দেখে আমি কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। কিন্তু পরক্ষণেই বিউগ্‌লে 'ডেঞ্জার কল' দিতে দিতে বোঁ-বোঁ ক'রে গাড়ী চালাতে লাগলুম। যখন সাপটা হাত দশেক তেড়ে এসে বাঁ-পাশের নালায় ঢুকে গেল, তখন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচলুম। অবশেষে বৈকাল প্রায়

সাড়ে পাঁচ-টার সময় শিউড়ীতে (১৬০ মাইল) আমার কাকাবাবু শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ মুস্তোফী মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলুম।

২৮শে সেপ্টেম্বর :—শিউড়ীতে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হ'ল। এখানকার 'ওয়াটার ওয়ার্কসে'র সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁর বাড়ীতে একদিন থাকবার জন্য আমাদের বিশেষ অনুরোধ করলেন। তাঁর কথা অমান্য না ক'রে শিউড়ী থেকে তিন মাইল দূরে মৌরাক্ষী নদীর ধারে দীনেশ বাবুর 'কোয়ার্টাসে' উপস্থিত হয়ে খুব স্ফুর্ত্তিতে সমস্ত দিনটা



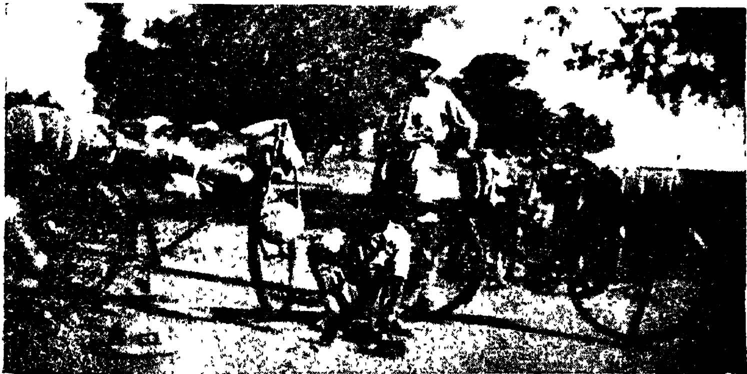
ডোঙ্গার সাহায্যে মৌরাক্ষী নদী পার হওয়া

কাটিয়ে, পরদিন ভোরে আমরা 'ভাগলপুরের' দিকে পাড়ি দিলুম। শিউড়ী থেকে ভাগলপুর ১০৩ মাইল।

২৯শে সেপ্টেম্বর :—হু হু ক'রে গাড়ী চালিয়ে ছ-মাইল আসার পর খরস্রোতা 'মৌরাক্ষী' নদী এঁকে বেঁকে এসে আমাদের গতিরোধ ক'রে দাঁড়ালো। এখানে নদীর দৃশ্য অতি চমৎকার। দূরে ছোট ও বড় পাহাড়গুলি নদীর দু-দিকে যেন গড়বন্দী ক'রে রেখেছে। নদীর উপর

সরু সরু তালগাছের 'ডোঙ্গা' ভাসিয়ে মাঝিরা যাত্রীর অপেক্ষায় নিশ্চিন্ত মনে তামুক সেবন করছে।

ডোঙ্গার সাহায্যে নদীর ওপারে গিয়ে অনেকটা বালির চড়া ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে আমরা রাস্তায় গিয়ে উঠ্‌লুম। এবার বীরভূম জিলা শেষ হয়ে 'সাঁওতাল পরগণা' আরম্ভ হ'ল। ভারী সাইকেল অনেকটা পথ বালিতে ঠেলে নিয়ে আসতে হাঁফিয়ে গেলুম! একটু বিশ্রাম নেওয়ার পর পুনরায় দৌড় আরম্ভ করলুম।



মাষ্টার-মেকানিক শীঘ্র গাড়ী মেরামত ক'রে ফেললে

কিছুদূর যাবার পর রাস্তা বেশ উঁচু-নীচু আরম্ভ হ'ল। চারিদিক থেকে ছোট বড় পাহাড়গুলো ফুঁড়ে বেরুতে লাগলো। ক্রমশঃই বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে গাড়ী চালানো অসম্ভব হয়ে উঠ্‌লো। 'মশানজুরী' নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে কিছু মুড়ি আর বাতাসা কিনে নিকটবর্ত্তী গাছতলায় আমরা আশ্রয় নিলুম। এমন সময়, এক দম্‌কা বাতাস এসে রিপোর্টারের কিক্‌ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড় করানো গাড়ীটাকে এরূপ জোরে রাস্তার উপর আছাড় দিলে যে, গাড়ীর 'ক্র্যাঙ্ক'

বেঁকে গেল। দম্‌কা বাতাসের উদ্দেশ্যে গালি দিতে দিতে মাষ্টার-মেকানিক শীঘ্র গাড়ী মেরামত ক'রে ফেললে। কিছুক্ষণ পরে আবার যাত্রা সুরু হ'ল।

শিউড়ী থেকে ৩৩ মাইল অতিক্রম ক'রে 'দুম্‌কায়' এসে শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের গৃহে অতিথি হলুম। এখান থেকে একটি চমৎকার রাস্তা দেওঘর পর্য্যন্ত গিয়েছে। দেওঘর এখান থেকে ৪৫ মাইল। সতীশ বাবুর নিকট বিদায় নেওয়ার পর, ১৪ মাইল দূরে



"হরদীয়া নদী," আমাদের জুতো-মোজা খুলে গাড়ী কাঁধে নদী পার হ'তে হ'ল।

'অমরপুর' নামে একটি ছোটোখাটো জঙ্গল আমাদের অতিক্রম করতে হ'ল। কিছুদিন থেকে একটি নরখাদক বাঘ্র এই জঙ্গলের আশপাশের গ্রামের লোকদের এবং পথের পথিকদের প্রাণনাশ ক'রে উদরপূরণ-ব্রতে ব্যস্ত ছিল। অনেক শীকারী বাঘটিকে মারবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত কেহই সফল হন নি। উক্ত কারণ বশতঃ স্থানীয় ভদ্রলোকেরা

আমাদের ঐ জঙ্গল পার হ'তে নিষেধ ক'রেছিলেন; কিন্তু আমরা নির্ব্বিঘ্নে জঙ্গল পার হয়ে ননিহাটে'র রাজবাটীতে আশ্রয় নিলুম।

৩০শে সেপ্টেম্বর :—সকাল বেলা ননিহাট ছেড়ে তিন মাইল যাবার পরই পুলভাঙ্গা 'হরদীয়া' নদী আমাদের পথ আট্‌কে দাঁড়ালো। ভাঙ্গা পুল মেরামতের জন্য বিস্তর বাঁশের ভারা খাটানো রয়েছে, কিন্তু মাঝ-খানটা একেবারে ফাঁক। বাধ্য হয়ে আবার আমাদের জুতো-মোজা খুলে গাড়ী কাঁধে নদী পার হ'তে হ'ল।

ননিহাট থেকে ১৩ মাইল সাইকেল চালানোর পর আমরা সাঁওতাল পরগণা ছেড়ে ভাগলপুর জিলায় পড়লুম। সাঁওতাল পরগণার পাহাড়-গুলি ক্রমশঃই অদৃশ্য হ'তে লাগলো। রাস্তার দু-পাশে কেবল আম-কাঁঠালের বাগান। এরূপে মাইলের পর মাইল অতিক্রম ক'রে আমরা 'বউসি'তে এসে ডাক্তার শ্রীযুক্ত চন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাড়ীতে রাত্রের মত আশ্রয় পেলুম।

১লা অক্টোবর :—ভোর বেলায় উঠে দেখি, বন্ধুরা তখনও নিদ্রামগ্ন। তাড়াতাড়ি বিউগ্‌ল বাজিয়ে দিলুম। বিউগ্‌লের সেই চড়্‌চড়ানি আওয়াজে বন্ধুরা ধড়্‌মড়িয়ে উঠে পড়লো। তারপর আমরা সাইকেল গুলো ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে রেখে 'মন্দার' পর্ব্বতাভিমুখে 'চরণজুড়ি' হাঁকিয়ে চললুম। পাহাড়টি বউসি থেকে দু-মাইল। পাহাড়ের নীচে থেকে পর্ব্বত শিখরের মন্দির আরও দু-মাইল।

নীচে এক প্রকাণ্ড দীঘীর বাঁধের উপর দিয়ে রাস্তা কিছুদূর গিয়েছে। আমরা যখন প্রায় দেড় মাইলের উপর উঠেছি, তখন এক সুন্দর পুষ্করিণীর ধারে কয়েকজন সঙ্গী পাওয়া গেল। পর্ব্বত শিখরে উপস্থিত হয়ে দেখি দু-টি মন্দির রয়েছে। একটি জৈনদের ও অপরটি হিন্দুদের ভোলানাথের মন্দির। কিন্তু দুটি মন্দিরেই তালা বন্ধ, জনপ্রাণীর চিহ্ন নাই। যা'হোক,

মন্দিরের বাহির হ'তেই আমরা ভক্তিভরে দেবতাকে প্রণাম জানালুম অবশেষে বেলা প্রায় দু-টার সময় ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে ফিরে এলুম।





মন্দার-পর্ব্বত

মন্দার পর্ব্বত শিখরের মন্দির

ভাগলপুর যাত্রার জন্য তৈরী হচ্ছি, এমন সময় ডাক্তারবাবু জুতো র

শুখ্‌তলার চাম্‌ড়ার মত প্রকাণ্ড এক গোলাকার বস্তু হাতে নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, "এই প্রচণ্ড রোদে আপনারা সাইকেল চেপে যাবেন বলে আমার স্ত্রী এইটে দিয়েছেন। মাঝে মাঝে একটু ক'রে মুখে ফেলে জল খাবেন, তাহলে তৃষ্ণা দূর হ'বে।" আমরা ত অবাক্! শেষকালে এই শুখ্‌নো চাম্‌ড়া খেয়ে তৃষ্ণা দূর করতে হবে! তখনি আমাদের সংশয় দূর ক'রে ডাক্তারবাবু বললেন,—"ল্যাংড়া আমের আমসত্বের কাছে কোন আমসত্বই লাগে না।" তখন আমরা ডাক্তার বাবুর স্ত্রী ও ডাক্তারবাবুকে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে আমসত্বটি যত্নের সহিত হ্যাভারসাক্-জাত ক'রে প্রায় সাড়ে তিনটের সময় বউসী ছাড়লুম।

সুন্দর সমতল রাস্তা পেয়ে আমরা সাইকেলের গতি খুব বাড়িয়েছি; কিন্তু হঠাৎ সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড হাতী তার পিঠে ডাল পালা বোঝাই ক'রে মন্থর গতিতে রাস্তা জুড়ে চলেছে। ডান পাশে হাত দেড়েক জায়গা পেয়ে রিপোর্টার ও কোয়ার্টার-মাষ্টার বোঁ ক'রে হাতীর পাশ কাটিয়ে যাবার পর মাষ্টার-মেকানিক্ যেমন যাবার উদ্যোগ করেছে, অম্‌নি হাতী ভীষণ ঘাব্‌ড়ে গিয়ে 'ঘোঁৎ' ক'রে এক গর্জ্জনের সহিত শুঁড় তুলে মেকানিক মহাশয়ের দিকে বেঁকে দাঁড়ালো। মেকানিক তার দেহটাকে সাইকেলের সঙ্গে মিশিয়ে নিমিষের মধ্যে বেরিয়ে হাতীর কবল থেকে বাঁচলো। হায়! শেষে বাকি রইলুম আমি; কিন্তু মাহুতের গুঁতোয় হস্তী ভায়া রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে দাঁড়ালো। আমি তখন নিশ্চিন্ত মনে বুক ফুলিয়ে জোরে প্যাডেল চাপ্‌তে চাপ্‌তে হাতীর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলুম।

ডুমকা থেকে ভাগলপুরের উকিল বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাপদ চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে ভাগলপুর পৌছাব বলে একটি পত্র দিয়েছিলুম। অম্বিকাবাবু ও কয়েকজন ভদ্রলোক আট মাইল আগে সাইকেল চেপে আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। হঠাৎ এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায়, কি

রকম যে আনন্দিত হলুম, সে কথা লিখে ব্যক্ত করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বিউগ্‌লে মার্চ্চিং বাজাতে বাজাতে সকলে সন্ধ্যার পর ভাগলপুর পৌঁছে (২৬৩ মাইল) অম্বিকাবাবুর বাড়ীতে উঠলুম।

"সিলিগুড়ির পথে"

২রা অক্টোবর :—আমাদের সকালে বেরুবার কথা ছিল, কিন্তু ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁর গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ করলেন। সাইকেল পরিষ্কার করার পর গঙ্গাস্নান সেরে, চারুবাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে আমরা আর এক নিমন্ত্রণ পেলুম, আমাদের বিদায় সম্ভাষণের জন্য সঙ্গীত সমাজ থেকে।

বেলা সাড়ে পাঁচটার সময় সঙ্গীত সমাজ থেকে বেরিয়ে ভাগলপুরের 'ভিখনপুর' ষ্টেসনে আমরা উপস্থিত হলুম; কারণ, গঙ্গার ওপারে 'কারাগোলা' ঘাট ষ্টেসন থেকে আমাদের রাস্তা আরম্ভ হয়েছে। ভিখনপুর ষ্টেসনে (বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের গাড়ী ধরে ভাগলপুর ফেরী ষ্টীমার ঘাট অর্থাৎ 'বারারি ঘাট' পর্য্যন্ত গিয়ে ঐ টিকেটে ষ্টীমারে গঙ্গা পার হওয়াই সুবিধা) অনেক ভদ্রলোক আমাদের পৌছে দিতে এসেছিলেন। অম্বিকাবাবু, চারুবাবু ইত্যাদি সকলের কাছে আমরা বিদায় নিয়ে বারারিঘাট-গামী গাড়ীতে উঠে বসলুম। গাড়ীও হুস্‌হুস শব্দে ভাগলপুরের ভিখনপুর ষ্টেসন ছেড়ে চললো...

৩রা অক্টোবর :—ভোর পাঁচটার সময় 'কারাগোলা' থেকে বেরিয়ে আমরা 'শিলিগুড়ি' অভিমুখে চললুম। এখান থেকে শিলিগুড়ি ১১২ মাইল। এবার 'পূর্ণিয়া' জিলা আরম্ভ হল। এই জিলা কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার ভীষণ আড্ডা। ম্যালেরিয়ার ভয়ে সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করতে আমাদের 'কুইনাইনে'র সাহায্য নিতে হয়েছিল।

কারাগোলা থেকে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত রাস্তা মোটেই ভাল নয়। রাস্তায় এত খোয়া ছড়ান যে,মনে হয় যেন 'ষ্টীমরোলার' চলাবার আয়োজন হয়েছে। তার উপর আবার দু-পাশে পাটের চাষ—তার পচা জলের গন্ধে নাড়ীশুদ্ধ বেরিয়ে আসবার উপক্রম হ'ল। বেলা প্রায় সাড়ে দশ-টার

সময় আমরা পূর্ণিয়া সহরে উপস্থিত হলুম। পূর্ণিয়া মিউনিসিপালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান মহাশয় ও ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণের অনুরোধে আমরা সেদিনটা সেখানে অতিবাহিত ক'রে পরদিন প্রত্যূষে যাত্রা করলুম।

৪ঠা অক্টোবর :—পূর্ণিয়া থেকে কয়েকজন ভদ্রলোক প্রায় তিন মাইল পর্য্যন্ত সাইকেলে আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন। আমরা হু হু ক'রে কিষণগঞ্জের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলুম—হঠাৎ ১৮ মাইল এসে একটা ভাঙ্গা পুলের কাছে থামতে হ'ল। পুলের নীচে দিয়ে যত পাট-ক্ষেতের পচা জল প্রবাহিত হয়ে চলেছে। অতঃপর অনেক ঘুরে ক্ষেতের আল ধরে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে আমরা রাস্তায় গিয়ে উঠলুম।

পুনরায় এক মাইল যাবার পর 'কঙ্কাই' নামে এক সেতুবিহীন খাল আমাদের নৌকায় চড়ে পার হ'তে হ'ল। দুটো খাল অতিক্রম ক'রে বেশ নিশ্চিন্ত মনে যাচ্ছিলুম, কিন্তু দু'মাইল অগ্রসর হওয়ার পর সেতুবিহীন 'মহানন্দা' নদীর বিপুল দেহ সম্ভার দেখে, আমরা সাইকেল হ'তে নামলুম।

অদূরে ঘাটের কাছে একটি নৌকা পাওয়া গেল। কোয়াটার-মাষ্টার হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে এগিয়ে চল্‌লো—ভিজে বালির চড়া ভেঙ্গে। আমরাও তার পিছু পিছু যেতে লাগলুম। ক্রমশঃ যেতে যেতে বালির চড়ায় দু-তিন আঙ্গুল জুতো বসে যেতে লাগলো, তখন তাকে বারণ করা হ'ল, আর এদিক দিয়ে এগিয়ে কাজ নাই। কিন্তু, সে কারুর কথায় ভ্রুক্ষেপ না ক'রে বললে, "এই চড়ার উপর দিয়েই আমি সাইকেল চালিয়ে যেতে পারি—দেখবে?" এই বলে যেমনি সে সাইকেলে চড়ে কিছুদূর এগিয়েছে, অম্‌নি গাড়ীর পিছনের চাকার অর্দ্ধেকটা ও তার বাঁ-পায়ের হাঁটু পর্য্যন্ত চোঁ-চোঁ ক'রে পাঁকের ভিতর ঢুকে পড়লো। এক হাতে গাড়ী ধরে সে অতি কষ্টে বাঁ-পা তুললে, কিন্তু হায়! তার দেহের

জল পেয়ে গাড়ীটি আরও কিঞ্চিৎ ঢুকে গেল। যখন কোয়ার্টারমাষ্টার লজ্জিত হয়ে সাহায্যের আশায় আমাদের দিকে ফিরে তাকালো, তখন আমরা তার এরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখে হাস্‌বো কি কাঁদবো, তা' ঠিক্ করতে পারলুম না। অবশেষে আমাদের বত্রিশ-পাটীর আবির্ভাবে সে আমাদের হাঁকিয়ে দিয়ে, অনেক ধস্তাধস্তির পর যখন আরক্ত বদনে কর্দ্দমাক্ত কলেবরে নৌকায় গিয়ে উঠলো, তখন আমরাও নৌকার কাছে উপস্থিত।

অতঃপর আমরা বেলা বারোটায় পূর্ণিয়া জিলার মহাকুমা কিষণগঞ্জে এসে পৌছলুম। আজ আর কোথাও যাওয়া হ'ল না; কারণ কোয়ার্টার-মাষ্টারের গাড়ীর মধ্যে পাঁক ঢুকে, তাকে প্রায় অচল ক'রে তুলেছিল। সমস্ত দিন ধরে আমরা জামা-কাপড় কাচা ও গাড়ী পরিষ্কারের কাজে লেগে গেলুম।

৫ই অক্টোবর:—সকাল ছ-টায় কিষণগঞ্জ অতিক্রম ক'রে কিছুদূর যাবার পর, দূরে 'হিমালয়ে'র রেখা দেখতে পেয়ে আমরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ছুটে চল্লুম। পথে কতকগুলি বাল্‌হাস ও পানকৌড়ীর ভবলীলা সাঙ্গ ক'রে সাইকেলের হাতলে ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ভীষণ জোরে বৃষ্টি নামলো। "ওয়াটার প্রুফ্" গায়ে চাপান সত্ত্বেও আমরা ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে আঠারো মাইলে "ইসলামপুর-রেষ্টহাউস্" দেখতে পেয়ে সেখানে ঢুকে পড়লুম। সমস্ত দিন সমানে বৃষ্টি হওয়ায়, আজ আর আমাদের আঠারো মাইলের বেশী দৌড় হ'ল না। এস্থানেই রাত্রি যাপন করতে হ'ল। রেষ্ট-হাউসের চৌকিদারের সাহায্যে আমরা পাখীগুলোর সদ্গতি করলুম।

৬ই অক্টোবর:—সকালে উঠে দেখি আকাশের অবস্থা মোটেই সুবিধাজনক নয়। কালো কালো মেঘগুলো তাল-গোল পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পৃথিবী যেন গুমোট ভাব ধারণ ক'রে বৃষ্টির আশঙ্কা

জানিয়ে দিচ্ছে। ১৯ মাইল দূরে 'তেঁতুলিয়া' নামে একটি বড় গ্রাম; বৃষ্টির পূর্ব্বেই যা'তে আমরা সেস্থানে পৌঁছতে পারি, সেই চেষ্টায় ইসলামপুর ছেড়ে দ্রুতবেগে সাইকেল চালাতে লাগলুম। কিন্তু তেঁতুলিয়া পৌঁছুবার আগেই তুমুল বেগে বৃষ্টি নামলো।

বৃষ্টির মধ্য দিয়ে এক রকম যাওরা যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ রিপোর্টারের "এ্যালার্ম হুইসিল্" ধ্বনিত হওয়ায় সকলকে থামতে হ'ল। এই দারুণ দুর্য্যোগে রিপোর্টারের গাড়ীর টিউব লীক্! কি করা যায়, কাছে কোথাও আস্তান গাড়্বার মত জায়গা নাই। কোয়ার্টার-মাষ্টার তাড়াতাড়ি তার ওয়াটার-প্রুফ্‌টি খুলে ফেলে তাঁবুর মত ক'রে আমাদের ধরতে বললে। আমি ও রিপোর্টার ওয়াটার প্রুফটিকে তাঁবুর মত ধরে রইলুম, আর তার ভিতর গাড়ী ঢুকিয়ে মাষ্টার-মেকানিক খুব তাড়াতাড়ি লীক্ সারিয়ে দৌড় দেবার আদেশ করলে। যখন একবার ভিজে ঢোল হয়েছি, তখন একেবারে সিলিগুড়ি গিয়ে থামবো স্থির হ'ল। এরূপে সমানে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে সিলিগুড়িতে (৩৮৫ মাইল) এসে পূর্ব্ব বন্দোবস্ত মত ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে উঠলুম।

"হিমালয়ে"

৭ই অক্টোবর ঃ—সমস্তদিন দুর্য্যোগের পর যখন দেবেনবাবুর নিকট বিদায় নিয়ে দার্জ্জিলিং এর উদ্দেশ্যে বিউগ্‌লে 'ফল্‌ইন্' দিয়ে দাঁড়ালুম, তখন বৈকাল সাড়ে পাঁচটা। দেবেনবাবুর ইচ্ছা ছিল না যে, আমরা এই সন্ধ্যার সময় যাত্রা করি; কারণ দার্জ্জিলিং জিলার 'টেরাই' পাহাড়তলীতে অতি সাংঘাতিক জঙ্গল অতিক্রম ক'রে পর্ব্বতারোহণ করতে হ'বে। এই টেরাই এর জঙ্গলে বড় বড় বাঘ, ভালুক, হাতী প্রভৃতি নানাবিধ হিংস্র জন্তুর বাসস্থান। এমন কি গভীর জঙ্গলের মধ্যে জলাকীর্ণ ভূমিতে স্বনাম প্রসিদ্ধ জন্তু 'গণ্ডার' পর্য্যন্ত বাস করে।

তার উপর আবার কয়েকদিন থেকে একটা 'গুণ্ডা' (পাগ্‌লা) হাতী বেরিয়ে চা-বাগানের কুলিদের ঘরবাড়ী নষ্ট করছে। হাতীর দৌরাত্ম্যের জন্য রাজসরকারের নাকি হুকুম হয়েছে—যে এই গুণ্ডা হাতীকে বিনাশ করতে পারবে, সে পাঁচশ' টাকা পুরস্কার পাবে! কিন্তু আমাদের এই বৃষ্টির জন্য ও পথে অনেক ভদ্রলোকদের খাতিরে পড়ে বহু স্থানে দেরী হ'য়ে গেছে; তার উপর সম্মুখেই হিমালয়। তার প্রচণ্ড আকর্ষণে সিলিগুড়ীতে দু-দিন অপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। কাজেই ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে কার্টরোডে পড়ে এগিয়ে চল্লুম, বাদ্‌লার সন্ধ্যায় 'শুখ্‌না'র পথে। এখান থেকে দার্জ্জিলিং ৪৮ মাইল ও শুখ্‌না মাত্র সাত মাইল।

আবার সেই মহানন্দা নদীর সঙ্গে সাক্ষাৎ! আপন মনে সে বয়ে চলেছে কুল্‌কুল্ ক'রে। পুল থাকায় এবার আমরা মহা আনন্দে মহানন্দা পার হয়ে গেলুম। যখন শুখ্‌নার জঙ্গলের মধ্যে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলো, তখন ঝড়-বৃষ্টি তুমুল সংগ্রাম তুলে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। একে অন্ধকার রাত্রি, তায় ভীষণ দুর্য্যোগ ও জঙ্গল। রাস্তা

কর্দ্দমাক্ত ও পিছল হওয়া সত্ত্বেও যত জোরে পারা যায় আমরা এগিয়ে চললুম।

এরূপ সময় দূরে ডান দিক থেকে বন-ভেদ করা আলোক-রশ্মি আমাদের চোখে এসে পড়লো। হুইসিল্ দিয়ে সকলেই থামলুম। আমরা বন্দুকে টোটা ভ'রে এবং ছোরাগুলি বাগিয়ে টর্চের আলোর সাহায্যে আলোক রশ্মি লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে এসে দেখতে পেলুম—একটি কাঠের বাংলো। বারান্দায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। আলাপ পরিচয়ে জানা গেল, ইনি কৃষ্ণনগরের জমিদার পাল চৌধুরী মহাশয়দের 'মোহরগঙ্গ-টি-ষ্টেট্'এর ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায়। আমাদের অবস্থা দেখে মোহিনীবাবু সানন্দচিত্তে অভ্যর্থনা করলেন। পরদিন ৮ই অক্টোবর এখানেই আটকে রইলুম, কারণ বর্ষার সংগ্রাম-সঙ্গীত তখনও উচ্চ গ্রামেই চলেছে।

৯ই অক্টোবর :—বেলা বারো টার সময় আকাশ একটু পরিষ্কার দেখে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। মোহরগঙ্গ-টি-ষ্টেট্ থেকে শুখ্না ষ্টেসন এক মাইল; এখান থেকে আমাদের পর্ব্বতারোহণ সুরু হ'ল। এরূপে কিছুদূর উঠ্‌তেই আমরা অত্যন্ত হাঁফিয়ে পড়তে লাগলুম। সেজন্য একটা নিয়ম করা হ'ল, আধ ঘণ্টা সাইকেল চালানোর পর পনেরো মিনিট ক'রে বিশ্রাম নিতে হ'বে। এরূপ দারুণ চড়াইয়ে সাইকেল চালানো খুবই কষ্টকর বটে, কিন্তু পাঁচ-সাত মিনিট বিশ্রাম নিলে ঘর্ম্মযুক্ত দেহ শীতল হয়ে আসে এবং শরীরে নূতন বলের সঞ্চার হয়।

সাড়ে ন-মাইলের কাছে গাড়ী থেকে সবে মাত্র নেমে বিশ্রাম নেবার জন্য গাড়ী 'কিক্‌ষ্ট্যাণ্ড' এ দাঁড় করাচ্ছি, এমন সময় অরণ্যের ভিতর হ'তে ভল্লুকের ঘোঁৎ-ঘোঁতানি শব্দের মত ভীষণ এক গর্জ্জন আমাদের কাণে এলো। তাড়াতাড়ি বন্দুকটি বাগিয়ে এদিক ওদিক তাকাতেই দেখতে পেলুম,—বিস্তর বানর বনের ভিতর সভা ক'রে বসে আছে এবং তাদের

সর্দ্দার আমাদের দেখে ঐ রকম বিকট শব্দ করছে ! যা'হোক, বানররূপী ভল্লুক দেখে আমাদের প্রাণটা একটু ঠাণ্ডা হ'ল। তারপর একটু বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় দৌড় আরম্ভ করলুম।

প্রায় ১২ মাইলে আমরা 'রঙ্গ্‌টন্' ষ্টেশন অতিক্রম ক'রে গেলুম। কার্টরোডের ভিতর এস্থানটাই অতি ভীষণ চড়াই। পথে একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ীর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হ'ল। যত উপরে উঠ্‌ছি, রাস্তার অবস্থা ততই সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এমন বিশ্রী ভাবে রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে যে, পনেরো হাত দূরে কি আছে দেখবার যো নাই।



তিনধেরিয়ার পথে

এক পাশে পহাড়ের মাথা আকাশ ফুঁড়ে উঠেছে, আর এক পাশে অতল খাদ। আর কেবলি রেলের লাইন ঘুরে ফিরে রাস্তায় এসে পড়েছে। উৎরাই-মুখো ট্রেন যদি হঠাৎ এসে পড়ে তো তার শব্দ পর্য্যন্ত শোনা যায় না। আর এক ভয় মোটর-গাড়ীকে—অবিরত বোঁ বোঁ ক'রে নাম্‌ছে উঠ্‌ছে।

এরূপে 'চুণভাট্টি' ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী হলুম। চুণভাট্টির ষ্টেশন-মাষ্টার

মহাশয় আমাদের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে এলেন। আমরা গাড়ী থেকে নামলুম। আমাদের গলদঘর্ম্ম দেখে মাষ্টার মহাশয়ের দয়া হ'ল। তাড়াতাড়ি ছোট্ট ষ্টেশনটিতে নিয়ে গিয়ে চা পান করিয়ে তবে ছাড়লেন। আমরা মাষ্টার মহাশয়কে যথেষ্ট ধন্যবাদ দিয়ে বৈকাল পাঁচটার সময় মোটে ১৯ মাইল মাত্র 'তিনধেরিয়া'য় এসে ডি-এইচ্-রেলওয়ের ডাক্তার শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র কুণ্ড মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করলুম। সিলিগুড়ীর উচ্চতা ৩৯৮ ফিট্ ও তিনধেরিয়া ২৮২২ ফিট্। আজ আমাদের ২৪২৪ ফিট্ চড়াই ঠেলে উঠতে হয়েছে।



পাগলা-ঝোরা

১০ই অক্টোবর :— বেলা দশটায় ডাক্তারবাবুর নিকট বিদায় নিয়ে ২২ মাইলে 'ঘয়াবাড়ী' পার হয়ে 'পাগ্‌লা-ঝোরা' নামে এক জল-প্রপাতের কাছে আমরা উপস্থিত হলুম। এই পথে বিস্তর ছোট-খাট জল-প্রপাত পড়ে। এদের মধ্যে পাগ্‌লা-ঝোরাই সব চেয়ে বড়। আগে এই জল-প্রপাত অতি ভীষণ ছিল। অনেকগুলো জল-প্রপাত এক সঙ্গে উন্মাদিনীর মত

উপর থেকে নীচে ছুটে যেত বলে এর নাম হয়েছে পাগ্‌লা-ঝোরা। কিন্তু এখন আর সে রকম নাই। অনেকগুলো পথ ক'রে দেওয়ায় পাগ্‌লা-ঝোরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গা দিয়ে নেমে পড়ছে। এখানকার দৃশ্য অতি চমৎকার।

তিনধেরিয়া থেকে বেরিয়ে আসা অবধি কুয়াসা জোঁকের মত ধরে আছে—পাগ্‌লা-ঝোরার সৌন্দর্য্য ভাল ক'রে অনুভব করতে দিলে না। পাগ্‌লা-ঝোরার ছবি নেবার আশায় ক্যামেরা ঠিক্ ক'রে একটুখানি আলোর জন্য হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় আমাদের গা ঘেঁসে প্যাসেঞ্জার ট্রেণ হাঁপাতে হাঁপাতে দার্জ্জিলিং এর দিকে এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর ছবি তোলা শেষ ক'রে ৪৮৬৪ ফিট্ উচ্চ 'কার্সিয়ং' গিয়ে পৌঁছলুম, বৈকাল চার-টের সময়। তিনধেরিয়া থেকে কার্সিয়ং ১১ মাইল। আজ আমাদের সবশুদ্ধ ২০৪২ ফিট্ চড়াই উঠতে হয়েছে।

১১ই অক্টোবর ঃ—আজ আমাদের গন্তব্য স্থানে পৌঁছবার দিন। আজ আর বিউগ্‌লে "রিভেলি" বাজাবার দরকার হ'ল না। কারণ সকলেরই মন আনন্দে বিভোর। ভোরের দিকে সকলেই ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লুম। কিন্তু হায়! বন্ধ ঘরের জানালা খুলতেই দেখি, যে বাহিরের ভীষণ কুয়াসা জমাট বেঁধে কার্সিয়ং সহরকে অচেনা ক'রে তুলেছে। বেলা ন-টা নাগাৎ কুয়াসা কেটে গেল, কিন্তু এবারে বর্ষার জ্বালায় বেরুতে আমাদের সাড়ে বারোটা বাজলো।

'টুং', 'সোনাদা' পার হয়ে ঘস্‌ড়াতে ঘস্‌ড়াতে আমরা 'ঘুমে'র দিকে এগুচ্ছি, এমন সময় পুনরায় প্রবলবেগে বৃষ্টি নামলো। অতিকষ্টে ভিজে ঢোল হয়ে শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে আমরা ঘুমে এসে হাজির হলুম। এই পথে ঘুম সকলের চেয়ে উঁচু—৭৪০৭ ফিট্। কার্সিয়ং থেকে ঘুমে আসতে ২৫৪৩ ফিট্ চড়াই ভাঙ্গতে হয়েছে। একে প্রবল বারি পতন, তার উপর কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে রয়েছে, 'ঘুম' যেন ঠিক ঘুমিয়েই

আছে! একবার বিশ্রামের জন্য ষ্টেশনে গিয়ে ঘুমের টেম্পারেচার ৫৬ ডিগ্রী (ফারেণহাইট্) দেখে অবাক হ'তে হ'ল। কিছুক্ষণের পর বৃষ্টি কমে গেল। ঘুম থেকে দার্জ্জিলিং চার মাইল নীচুতে। আমরা ভিজে অবস্থায় হি হি ক'রে কাঁপ্তে কাঁপ্তে হু হু শব্দে এগিয়ে চল্লুম।

ভগবানের আশীর্ব্বাদে বারো মিনিট পরেই চার মাইল উৎরাইয়ে আজ এতদিন বাদে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে কলকাতা থেকে ৪৩৫ মাইল দার্জ্জিলিং পৌছে 'পথের সাথী' বিউগ্‌লে "মার্চ্চিং" বাজিয়ে নগরবাসীদের আমাদের আগমন বার্ত্তা জানিয়ে দিলুম। দার্জ্জিলিংএর উচ্চতা ৬৮১২ ফিট্। কার্সিয়ং থেকে দার্জ্জিলিং ২০ মাইল।



দার্জ্জিলিং—বাজার

এখানে এসে আমরা সকলের কাছেই প্রচুর সমাদর পেয়েছিলুম। তাঁরা রায়সাহেব ভুবনমোহন চট্টপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'নৃপেন্দ্র নারায়ণ হলে' আমাদের জন্য একটি অভ্যর্থনা সভা ক'রে যথেষ্ট সম্মানিত ক'রেছিলেন।

এখানে পৌছুবার পরদিন থেকে ইন্দ্রদেবের দয়ায় বরুণদেব বৃষ্টিতে

ক্লান্ত ছিলেন বলে, আমরা খুব আনন্দে চারিদিক দেখে শুনে ১৪ই অক্টোবর সকলের কাছে বিদায় নিয়ে স্বর্গরাজ্য ছেড়ে আবার এক ঘেয়ে চার মাইল চড়াই ভেঙ্গে ঘুমে গিয়ে উঠলুম। সিলিগুড়ী থেকে দার্জ্জিলিং উঠ্‌তে মোট ১৭ ঘণ্টা লেগেছিল, কিন্তু ফেরবার সময় আমরা পথে ছ'বার টিউবের লিক্ সেরে, তিনধেরিয়া এবং মোহরগঙ্গ-টি-ষ্টেট্ এর ডাক্তারবাবুদের সঙ্গে দেখা করেও, মোট ছ-ঘণ্টার ভিতর দু-তিন মিনিট অন্তর মাইলের পর মাইল পেরিয়ে বিরাট পর্ব্বতকে পিছনে রেখে সিলিগুড়ী পৌঁছে, এ বৎসরের মত 'ক্যাল্‌কাটা হুইলার্সে'র দুরন্ত ভ্রমণের যবনিকা পাত করলুম।



মেঘের দেশে

———

ভ্রমণের নেশা

চতুর্থবারের ভ্রমণ-কাহিনী



ক্যালকাটা হুইলাস

বাম দিক হইতে—মনীন্দ্র মুস্তোফী, সুকুমার ঘোষ, জহর দত্ত, মন্মথ চক্রবর্ত্তী, লাবণ্য সরকার, রাধারমণ দত্ত.

ভ্রমণের নেশা

"নেশার প্রাধান্য"

সারা দুনিয়াতে কত প্রকার যে নেশা থাকিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে নেশাখোরদের সহিত মিশিতে হয়। লোকে সচরাচর মদ্য, অহিফেন, গঞ্জিকা প্রভৃতির নাম করিয়া থাকেন; অত্যধিক থিয়েটার বা বায়স্কোপ দর্শকদের সম্বন্ধেও বলা হয় 'নেশা চাপিয়াছে'। এইরূপ অনেক প্রকারের নেশা দুনিয়ায় মানবের স্কন্ধে চাপিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এতগুলি নেশার মধ্যে কোন্‌টি প্রধান তাহা সিদ্ধান্ত করা বড়ই কঠিন। কেন না, যিনি যে নেশার ভক্ত, তিনি সেইটাকেই প্রধান মনে করেন। যেমন—আমার মনে হয় দেশ-ভ্রমণের সঙ্গে কোন নেশাই তুলনীয় নহে। সাইকেলে দেশ-ভ্রমণের নেশা আজ চারি বৎসর হইল আমাদের স্কন্ধে চাপিয়াছে।

এবার আমাদের 'ভ্রমণের-নেশা' সুদূর কাশ্মীরের পথে চাপিল। সভ্যের সংখ্যা মোট আটজন—মণীন্দ্র মুস্তোফী (ক্যাপ্টেন), শ্রীশচন্দ্র ঘোষ (ভাইস ক্যাপ্টেন), জহরলাল দত্ত (কোয়ার্টার-মাষ্টার), রাধারমণ দত্ত (মাষ্টার-মেকানিক), লাবণ্য সরকার (ফটোগ্রাফার), মন্মথ চক্রবর্ত্তী (রিপোর্টার), সুকুমার ঘোষ (কর্পোরাল) এবং ধীরেন্দ্র পাল (স্কাউট)। অপর একজন সভ্য নরেন্দ্র ঘোষ (বিউগ্‌লার) আমাদের উৎসাহিত করিবার জন্য 'কুল্টি' ১৪৬ মাইল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া বিউগ্‌লের ভার আমাকে অর্পন করিয়াছিলেন।

সাইকেল-ভ্রমণোপযোগী আবশ্যক দ্রব্যসকল আমরা পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও লইয়াছিলাম। মৃজাপুর ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা হোটেলে ৯ই অক্টোবর ১৯২৯ সালে আমাদের বিদায়-সম্ভাষণকল্পে ক্লাবের পৃষ্ঠপোষকগণ

পুলিশের ডেপুটি কমিশনার মিঃ এ, ডি, গর্ডনএর সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। বেলা তখন চারিটা; সভা ভঙ্গে বিউগ্‌লের প্রাণ মাতান শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চতুর্থবার ভ্রমণের নেশায় বাহির হইয়া পড়িলাম—ভূস্বর্গের অভিমুখে!

বাহির হইতেই বাধা পড়িল! যখন আমরা চিত্তরঞ্জন এভিনিউএর উপরে, তখন অকস্মাৎ দুম্‌ করিয়া এক শব্দের সহিত ফটোগ্রাফারের 'অসময়ের বাঁশী' ধ্বনিত হইয়া হুইলার্সগণকে থামাইতে বাধ্য করিল। বহু লোক মোটরে, মোটর-সাইকেলে ও সাইকেলে কিছুদূর পৌছাইয়া দিবার জন্য আমাদের সাথী হইয়াছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহারাও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গাড়ীর গতিবেগ সংযত করিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে বহু নেত্র একত্র হইয়া ফটোগ্রাফারের প্রতি করুণ দৃষ্টি হানিতে লাগিল। তখন অধোবদনে ফটোগ্রাফার তাহার গাড়ীর পিছনের চাকার সবেমাত্র ফাটা টায়ার হইতে একটুক্‌রা কাচ বাহির করিতেছে। কলিকাতা অতিক্রম না করিতেই এইরূপ বাধা পড়ায় সকলের মন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়া উঠিল। যাহা হউক, আমাদের মাষ্টার-মেকানিক মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে গাড়ী মেরামত করায়, পুনর্ব্বার বিউগ্‌ল-ধ্বনিতে সকলে নিজ নিজ স্থানে সমবেত হইতেই ক্যাপ্টেন বাঁশীতে যাত্রার ইঙ্গিত জানাইল। কলিকাতাকে দ্বিতীয়বার বিদায় দিয়া অন্ততঃ হাওড়ার পূর্ব্বে যাহাতে তৃতীয়বারের বিদায় জানাইতে না হয়, তাহার জন্য একবার অন্তরের সহিত ভগবানের শরণ লইলাম।

শ্রীরামপুরের 'বঙ্গেশ্বরী কটন মিলে'র ম্যানেজিংডাইরেক্টর শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ মল্লিক এল-টি-এম্‌ মহাশয়ের বাটীতে প্রথম রাত্রি যাপনের জন্য পূর্ব্ব হইতে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। অপরাহ্ন সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় শ্রীরামপুর (১৪ মাইল) পৌছিলে মল্লিক মহাশয়ের বাটীর মহিলাগণ শঙ্খধ্বনি করিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন। রাত্রে বহু লোকের

সমাগম হইল। মল্লিক মহাশয়ের দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আমি ম্যাজিক দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার ক্রীড়াকৌতুকে সন্তুষ্ট হইয়া মল্লিক মহাশয় আমাকে উৎসাহিত করিবার জন্য একটি রৌপ্য-পদক উপহার দিলেন।

মল্লিক মহাশয়ের সম্বন্ধে দুই একটি কথা, আশাকরি অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ইনি একজন নীরব কর্ম্মী। যাহাতে দেশ হইতে প্রচুর অর্থ বিদেশে বহির্গত না হয়, সেই কারণে ইনি আমেরিকা হইতে বস্ত্র-বয়ন বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া প্রথমে 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের' ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু কিছুদিন পরে নানা কারণে বিরক্ত হইয়া উক্ত মিলের সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছিন্ন করেন। অতঃপর তিনি অশেষ ত্যাগ স্বীকার করিয়া বর্ত্তমানে শ্রীরামপুরে "বঙ্গেশ্বরী কটন মিল" নামে একটি নূতন কাপড়ের কারখানা নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আশা করি, সাধারণের সহানুভূতিতে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম সফল হইবে।

মল্লিক মহাশয়ের আদর-যত্নে প্রীত হইয়া পর দিবস শ্রীরামপুর ত্যাগ করিলাম। পূর্ব্বানুরোধে বদ্ধ হইয়া চন্দননগরে শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের বাটীতে ক্ষণকাল বিশ্রামের পর পুনরায় আমাদের সাইকেল-সমূহ দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল। বরাকর নদী অতিক্রম করিয়া ১৩ই অক্টোবর আমরা সোণার-বাংলার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম। বিহার প্রদেশে প্রবেশ করিতেই বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র পাহাড়ে ঘিরিয়া ফেলিল। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলির মধ্যে 'পরেশনাথ' পাহাড় উচ্চতম। সমুদ্র-বক্ষ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৪৪৭০ ফিট্। পাহাড়ের উপর পরেশনাথ দেবের মন্দিরে আরোহণ করিবার দুইটি পথ আছে। একটি গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের উপর ১৯৮ মাইলে অবস্থিত নিমিয়াঘাট ও অপরটি ইস্রি হইতে ১৩ মাইল দূরবর্ত্তী মধুবন। প্রথমবারে বারাণসী-ভ্রমণের সময় এই পরেশনাথ পাহাড় ও মন্দিরের বিবরণ বর্ণনা করিয়াছি।

আমরা নিমিয়াঘাট হইতে ১৪ই অক্টোবর পরেশনাথ পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির দর্শন করিয়া আনন্দিত মনে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী 'বাগোদর'কে লক্ষ্য করিয়া চন্দ্র-কিরণে উদ্ভাসিত বনমধ্যবর্ত্তী পার্ব্বত্য পথের মধ্য দিয়া পবন-বেগে সাইকেল ছুটাইয়া চলিয়াছি, এমন সময় পতনের শব্দের সহিত 'অসময়ের বাঁশী' করুণ স্বরে বাজিয়া উঠিয়া ইঙ্গিত করিল—'থাম' !

তখন রাত্রি সাড়ে সাতটা। বাঁশী বাজিবার কারণ অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল, উৎরাই-মুখে সার দিয়া নামিতে নামিতে অকস্মাৎ মাষ্টার-মেকানিকের গাড়ীর সম্মুখের চাকা প্রস্তর-খণ্ডের সহিত প্রহত হওয়ায় গাড়ীর হাতল ঘুরিয়া যায় এবং ফটোগ্রাফারের গাড়ীর পশ্চাৎবর্ত্তী চাকার সহিত সংঘর্ষণ হয়। ফলে, মেকানিক সশব্দে ভূতলে পতিত হইয়া সকলকে থামাইবার জন্য বাঁশীতে রাগিণী তোলে। এইরূপ পতনে তাহার গাড়ীর পা-দানি ভাঙ্গিয়া গিয়া আমাদিগকে মহাবিপদে ফেলিল। কারণ, আর এমন দ্বিতীয় পা-দানি নাই, যাহার দ্বারা গাড়ী চালাইতে পারা যায় বা নিকটে এমন কোন স্থান নাই যে, সাইকেলের দোকান মিলিবে।

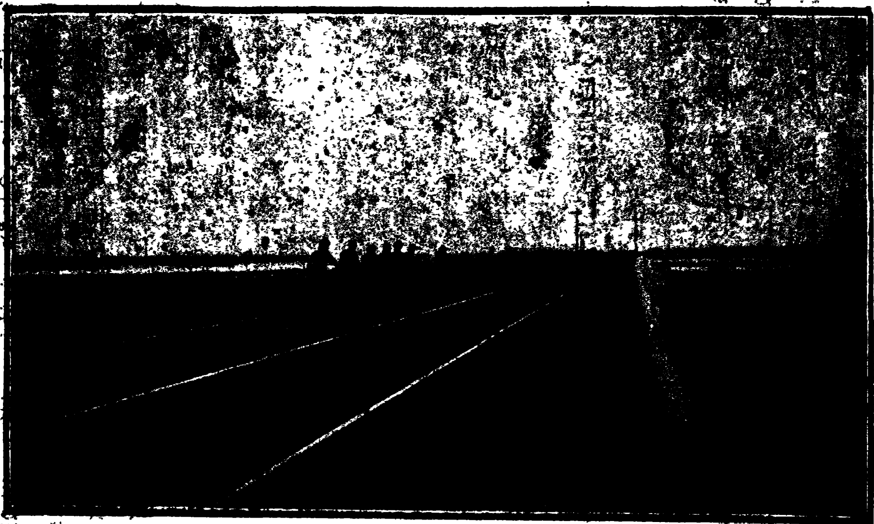
কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল নানারূপ জল্পনা-কল্পনায় কাটিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, দূরে একখানি মোটরগাড়ী দুই চক্ষু বিচ্ছুরিত করিয়া এই দিকেই আসিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমরা রাস্তার মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া হস্ত-উত্তোলন পূর্ব্বক গাড়ীখানির গতিরোধ করিলাম। গাড়ীর ভিতর মানভূম জিলার আবগারির সুপারিন্‌টেনডেণ্ট্ শ্রীযুক্ত সূর্য্যনারায়ণ সহায় ও তাঁহার পরিবারবর্গ ছিলেন। তাঁহারা আমাদের বিপদের কথা শ্রবণ করিবামাত্র আনন্দের সহিত মাষ্টার-মেকানিককে মোটরে তুলিয়া লইলেন। চল্লিশ মাইল পশ্চাতে ধানবাদ সহরাভিমুখে নূতন পা-দানির প্রত্যাশায় মেকানিককে লইয়া মোটর গাড়ী নিমেষের মধ্যে দৃষ্টির অগোচর হইল।

এই দারুণ চিন্তার হাত হইতে অপ্রত্যাশিতভাবে নিষ্কৃতি লাভ

করিয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির-নিশ্চিত হইলাম। অতঃপর মেকানিক মহাশয়ের খঞ্জ গাড়ী সমভিব্যাহারে ধীর-পদে অগ্রসর হইয়া এক মাইল দূরস্থিত ইস্‌রির ধর্ম্মশালায় উপনীত হইলাম। ধর্ম্মশালায় নৈশাহার সমাপ্তির পর নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় মেকানিক মহাশয় সস্মিতবদনে একটি পা-দানি হস্তে রাত্রি প্রায় বারোটার সময় ধানবাদ হইতে ট্রেনযোগে উপস্থিত হইলেন। ইস্‌রির ধর্ম্মশালায় ঐ দিন রাত্রি যাপন আমাদের পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল।

প্রত্যূষে ইস্‌রি হইতে যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নে বাগোদরে (২১৬ মাইল) বিশ্রামের পর পুনরায় দৌড় আরম্ভ হইল। ১৩ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ট্রাঙ্ক-রোড হইতে অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত 'বেলকাফি' নামক স্থানে সূর্য্যকুণ্ড দর্শন করিয়া অভিষ্টপথে যাত্রা করিলাম। অতঃপর হাজারিবাগের বিখ্যাত বিস্তীর্ণ-বনভূমি পার হইয়া গয়া জিলায় প্রবেশ করিলাম। এই পথে আসিবার কালেও আমাদের যে বহুবার গাড়ী মেরামত করিতে হয় নাই এমন নহে।

"বিপদ কখনও একা আসে না!" পূর্ব্বে আমাদের জানা ছিল যে, শনির দৃষ্টিতে পড়িলে অনেক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হয়; কিন্তু জানি না কি এক অজ্ঞাত কারণে আমরা গয়া জিলাতে প্রবেশ করিয়াই শান্তি-রক্ষক পুলিশের 'সুদৃষ্টিতে' পড়িলাম। ফলে, পথে অধিকাংশ পুলিশ ঘাঁটিতেই আমাদের গোষ্ঠির কোষ্ঠী সবিস্তারে বিবৃত করিতে অযথা সময় নষ্ট হইতে লাগিল। অবশেষে ১৭ই অক্টোবর শোন-ইষ্ট-ব্যাঙ্ক ষ্টেসনের মাষ্টার মহাশয়ের অনুমতি লইয়া ভারতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ শোন নদের সেতুর উপর দিয়া গোধূলি লগ্নে সাইকেল ঠেলিতে ঠেলিতে পার হইলাম। সেতুটি অতিক্রম করিতে ৩৭ মিনিট লাগিল।



গোধূলি-লগ্নে শোন নদের সেতু অতিক্রম

রাত্রে সাসারাম সহরে রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হইলাম। সাসারাম বিহারের একটি প্রাচীন সহর। সেরশাহের সমাধি-মন্দির এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য। ইহা সহস্র বর্গফিট পরিমাণ একটি জলাশয়ের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পরদিবস সাসারাম হইতে ৬৫ মাইল অতিক্রমের পর মোগলসরায়ে উপস্থিত হইয়া স্থানীয় ধর্ম্মশালায় গিয়া উঠিলাম।

তখন রাত্রি এগারটা। ক্লান্ত দেহকে শান্ত করিবার নিমিত্ত নিদ্রা-দেবীর পূজার প্রারম্ভে কম্বলগুলি বিছাইতেছি, এমন সময়ে ঘরের দরজার বাহিরে পনের ষোল জন লাঠিয়াল, পিস্তল হস্তে দুইজন নায়কের সহিত অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়া নিদ্রাদেবীর পূজার ব্যাঘাত ঘটাইল। লাঠিয়ালেরা এই ভাবে সন্তর্পণে দরজার নিকট আসিলে, প্রথমে আমাদের বদ্‌মাইসের দল বলিয়া ভ্রম হইল। কিন্তু পরক্ষণে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিতেই বুঝিতে পারিলাম তাহা নহে—মহামান্য শান্তিরক্ষকের দল শ্রান্ত দেহকে অশান্তি দিবার অভিলাষে আসিয়াছেন।

দুইজন বিহারী ইনেস্‌পেক্টর পিস্তল হস্তে অগ্রে ও পশ্চাতে যষ্টী-ধারী চৌকীদারগণ গৃহের ভিতর অবলীলাক্রমে ঢুকিয়া পড়িলেন। ইনেস্‌-পেক্টর মহাশয়রা আমরা ট্রেন থাকিতে সাইকেলে ভ্রমণ কেন করিতেছি, তাহা লইয়া দারুণ আলোচনায় অর্দ্ধঘণ্টা-কাল মস্তক ঘামাইয়াও সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে আমাদের নাম-ধাম ইত্যাদি 'নোট-বুকে' লিখিয়া লইলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা আমাদের আসবাব-পত্রাদি পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। অতঃপর নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রের ভূগোল পরীক্ষার ন্যায়—ইহা কি, উহা কি, প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে আমাদের শ্রান্তদেহ অধিকতর ক্লান্ত হইয়া পড়িল। এমন সময়, বেঙ্গল কেমিকেলের প্রস্তুত "পার্ল পাউডারের" প্যাকেটটি হস্তে লইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ইস্‌মে ক্যা হায়"। দেশী কোম্পানীর প্রস্তুত পার্ল

পাউডার উত্তর পাইয়াও তিনি পুনরায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "ইস্‌সে ক্যা হোতা"। তখন আমাদের কর্পোরাল হাসিতে হাসিতে কতকটা পাউডার বিনা আয়নায় মুখে মাখিয়া এক কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া পড়িলেন। হঠাৎ এইরূপ বর্ণ পরিবর্ত্তনে উপস্থিত সকলেই হাসি-সংবরণ করিতে পারিলেন না। ইহা যে বিস্ফোরক দ্রব্য নহে, তাহার প্রমাণ পাইয়া ইনেস্‌পেক্টর মহাশয়রাও সন্তুষ্ট হইলেন। এইরূপে রাত্রি প্রায় দুইটার সময় পরীক্ষাপর্ব্ব শেষ হইল। কোনরূপে শেষরাত্রি অতিবাহিত হইতেই প্রত্যূষে রওনা হইয়া বেলা প্রায় নয়টার সময় বেনারসে (৪২২ মাইল) উপস্থিত হইলাম।

আমাদের বেনারসে পৌঁছান সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, স্থানীয় অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মল্লিক প্রভৃতি কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। এখানে দুই দিবস আমোদ আহ্লাদের সহিত অতিবাহিত করিয়া শুভার্থী সকলের আশীর্ব্বাদে ২১শে অক্টোবর এলাহাবাদে (৫০০ মাইল) পূর্ব্ব বন্দোবস্ত অনুসারে এডভোকেট মিঃ ব্যানার্জ্জির বাটীতে যাইয়া উঠিলাম। পর দিবস এলাহাবাদের সকল স্থান দর্শন পূর্ব্বক পুনরায় দ্বিচক্রযানে আরোহণ করিয়া ২৫শে অক্টোবর কানপুরে (৬২৪ মাইল) আসিলাম।

কানপুরে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় আমাদের যথেষ্ট আদর-অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার বাটীতে আশ্রয় দিলেন। এখানে আসিয়া কলিকাতা জোড়াবাগান কোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার নিকট যাহা শুনিলাম, তাহাতে বাধ্য হইয়া আমাদের কিছুদূরের জন্য সাইকেল ভ্রমণ ত্যাগ করিতে হইল। তিনি কাশ্মীর হইতে কয়েক দিন-পূর্ব্বে আসিয়াছেন। আমাদের শীতের বস্ত্রাদি দেখিয়া বলিলেন, "কাশ্মীর-ভ্রমণের উপযুক্ত সময় ইহা

আদৌ নহে। এই সময় একবার মেঘ হইলেই কাশ্মীরের প্রায় সকল স্থানে বরফ পড়িয়া থাকে। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, সেখানকার অধিকাংশ পর্ব্বত-চূড়ায় বরফ পড়িতেছে। বহু লোক কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর হইতে জাম্মু এবং রাওলপিণ্ডীতে নামিয়া যাইতেছেন। কানপুর হইতে বরাবর সাইকেলে শ্রীনগর যাইতে হইলে, আপনাদের রাওলপিণ্ডী হইতেই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া ফিরিতে হইবে, কারণ, বরফ পড়িয়া রাস্তা বন্ধ হইয়া যাইবে। আর যদি বা কোনরূপে শ্রীনগর পৌছাইতে পারেন, তাহা হইলে শীতে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইবেন, এমন কি 'নিউমোনিয়া' হইবারও সম্ভাবনা। আপনাদের শীত-বস্ত্রাদি সেখানকার শীতের পক্ষে কিছুই নহে—ইত্যাদি।"

অবশেষে রথীন্দ্রবাবু ও ডাক্তার সুরেন্দ্রবাবুর যুক্তিপূর্ণ কথায় আমাদের বাধ্য হইয়া রাওলপিণ্ডী পর্য্যন্ত ট্রেনে যাওয়াই স্থির করিতে হইল। পর দিবস কানপুরে সমবেত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকট বিদায় লইয়া আমরা সাইকেল সমেত ট্রেনে রাওলপিণ্ডী যাত্রা করিলাম। আমরা এত আশা করিয়া সাইকেলে কাশ্মীর পর্য্যন্ত যাইব বলিয়া বাহির হইলাম, কিন্তু দেখিতেছি—আমাদের বরাত-গুণে সকলই বুঝি বা পণ্ড হয়!

* * * * *

"উত্তর পশ্চিম সীমান্তে"

২৮শে অক্টোবর প্রত্যূষে রাওলপিণ্ডীতে আসিয়া পৌছাইলাম। রাওলপিণ্ডী অতি প্রাচীন সহর নহে। পুরাকালে মোগলদের সময় ইহার নাম ছিল 'ফতেপুর বাওরী'। এখন ব্রিটীশ গভর্ণমেণ্ট সীমান্ত রক্ষার জন্য এখানে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান সৈনিকদের ছাওনী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানে সহরের এক প্রান্তে দেখিবার যোগ্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে—টোপিপার্ক। আব দেখিবার মধ্যে—সীমান্তে ওই হিমালয়ের হিন্দুকুশ পর্ব্বত-শ্রেণী আমাদের এই সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা প্রকৃতির লীলা-নিকেতন ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া অক্ষয় প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান। কিন্তু হায়!...যাক সে কথা—

অতঃপর ষ্টেসন হইতে আমাদের পরিচিত শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া হৈ চৈ আরম্ভ করিয়া দিলাম। নিত্যবাবু এখানকার মিলিটারী-একাউণ্টস্ আফিসে কার্য্য করেন। যে রাস্তায় তাঁহার বাটী সেই রাস্তার নাম দেখিয়া আমরা একটু আশ্চর্য্য হইলাম এবং আনন্দও হইল যথেষ্ট; কারণ সুদূরে বাঙ্গালীর নামে রাস্তা —শশীভূষণ চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট্।

রাওলপিণ্ডী হইতে পেশোয়ার বিশেষ দূর নহে—এখান হইতে ট্রেনে ১০৮ মাইল। এত নিকটে প্রাচীন হিন্দু গৌরবের লীলাভূমি একচ্ছত্র সম্রাট কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর যাহা এক্ষণে পেশোয়ার নামে অভিহিত, তাহা না দেখিয়া একেবারে ভূস্বর্গের পথে আরোহণ করা উচিত মনে করিলাম না। অতএব আমরা শীঘ্র শীঘ্র ঘুরিয়া আসিবার জন্য ট্রেনে ২৯শে অক্টোবর প্রত্যূষে রওনা হইয়া সন্ধ্যায় পেশোয়ার পৌছিলাম।

পেশোয়ার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী। রাওলপিণ্ডী

হইতে ৬২ মাইল দূরে সিন্ধু নদ পার হইয়া সীমান্ত প্রদেশ আরম্ভ। এখানকার সকল রেলওয়ে ষ্টেসন এক একটি ক্ষুদ্রতম দুর্গের আকারে নির্ম্মিত, কারণ মধ্যে মধ্যে এই সকল স্থানে পার্ব্বত্য-জাতিদের (Tribesmen) অত্যাচার সহ্য করিতে হয়। এই সীমান্ত প্রদেশের উত্তরে হিমালয়ের শাখা-পর্ব্বত হিন্দুকুশের অভ্রভেদী চূড়া সকল, দক্ষিণে বেলুচিস্থান, পূর্ব্বে কাশ্মীর-রাজ্য ও পাঞ্জাব এবং পশ্চিমে আফগানিস্থানের সীমান্ত। এই সকল স্থানের অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান। পেশোয়ার ব্রিটিশ-ভারতের শেষ নগর। পার্ব্বত্য-জাতিদের অত্যাচারের ভয়ে এই নগর প্রকাণ্ড প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহাদের দ্বারা পূর্ব্বে এই সহরটি অনেকবার আক্রান্ত হইয়াছে। এখন অবশ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ বলিলেই চলে। সহরটি প্রকাণ্ড; কিন্তু খুব পরিষ্কার বলিয়া মনে হইল না; তথাপি সীমান্ত প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য এই সহরটিকে এক মনোরম শোভায় শোভিত করিয়াছে। পশ্চিম দিকে নগর-প্রান্তে সেনা-নিবাস। এ স্থানের 'রয়েল এয়ার-ফোর্স' উল্লেখ-যোগ্য। এই সেনা-নিবাসের আট মাইল পশ্চিমে ভারতের দ্বার, জগৎ বিখ্যাত 'খাইবার গিরি-সঙ্কট'।

এখন পেশোয়ারে বেশ শীত। অবশ্য এইরূপ শীত অপ্রীতিকর নহে। এ সময়ের আবহাওয়া এ স্থানে বড়ই সুন্দর। গ্রীষ্মকালে দিবসে প্রচণ্ড তাপে প্রায় এক শত বিশ ডিগ্রীর উপর উত্তাপ উঠিয়া থাকে এবং জানুয়ারী মাসের অন্তে কয়েক দিবস কোন কোন বৎসরে ৩২ ডিগ্রীর নিম্নে চলিয়া যায় ও বরফ পড়িয়া থাকে। বর্ষা এখানে খুবই কম, কিন্তু শীতকালে প্রায়ই বৃষ্টি হয়। শুনিলাম এখানকার বসন্তকাল অতি সুন্দর ও থাকেও প্রায় তিন মাস। সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীদের সদাস্ফূর্ত্তিযুক্ত, তেজঃপূর্ণ ও আনন্দোজ্জ্বল মুখ দেখিলে মনে স্বতঃই অপার আনন্দের উদয় হয়। মনে হয়, ভীরুতা কাহাকে বলে

তাহা ইঁহাদের আদৌ জানা নাই। বিপুলকায় সুস্থ দেহ; সুন্দর সুঠাম শরীর দেখিলে মনে পড়ে আমাদের কৃশ, স্বাস্থ্য-হীন, অথবা বিনয়ী ভীরু বাঙ্গালীর কথা।

এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অতিশয় অল্প। প্রায় সকলেই চাকুরীর খাতিরে সুদূর বাঙ্গলা হইতে ভারতের সীমান্তে বাস করিতেছেন। পেশোয়ার ক্যাণ্টনমেণ্টে বাবুমহল্লায় বাঙ্গালীদিগের একটি 'মেস্' অবস্থিত। আমরা তথায় আশ্রয় লইয়াছিলাম। রাত্রে আমাদের সহিত আলাপ করিতে পেশোয়ারবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোক কয়েকজন মেসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার চারুচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমাদের সহিত গল্প-গুজবে কাটাইয়া দিলেন। ঘোষ মহাশয় সীমান্ত প্রদেশের সকলের নিকট, এমন কি পার্ব্বত্য-জাতিদের মধ্যেও বিশেষ পরিচিত। ইঁহারই চেষ্টায় পেশোয়ার আজ জাতীয় উন্নতির দিকে ক্রমশঃই অগ্রসর হইতেছে। এই কারণে পেশোয়ারে বাঙ্গালীর সম্মানও যথেষ্ট।

পর দিবস সকাল ছয়-টায় ৪০ মাইল দক্ষিণে মোটরবাস্ সাহায্যে ব্রিটীশের কোহাট নামক সৈনিকদের ছাওনী দেখিতে গেলাম। এ পথের দৃশ্য অতি চমৎকার। পেশোয়ার হইতে কিছু দূরে রাস্তা কোহাট গিরি-সঙ্কটের মধ্য দিয়া দারুণ চড়াই ও উৎরাইয়ের পর কোহাট ছাওনীতে পৌছিয়াছে। এই সকল পাহাড়ে গাছপালার চিহ্নমাত্র নাই। পথে যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলাম, বহু উচ্চ পর্ব্বতসমূহ হইতে পার্ব্বত্য জাতিরা সম্মুখে বরফ পতনের আশঙ্কা দেখিয়া, সংসারের জিনিষ-পত্র অশ্বতরের পৃষ্ঠে চাপাইয়া নীচে নামিয়া যাইতেছে। কোহাট গিরি-সঙ্কটের পাহাড়সমূহে আফ্রিদি জাতির বাস। এই পার্ব্বত্য-জাতি সময় সময় ভীষণ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ব্রিটীশ সীমান্ত প্রদেশে বহুবার অত্যাচার ও লুণ্ঠন করিয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশের মধ্যে মাত্র গিরি-সঙ্কটগুলি



কোহাট গিরি-শঙ্কটের অভ্যন্তরে

ব্রিটীশের অধীন। অবশ্য ইহা ব্যতীত বহু পর্ব্বতের চূড়ায় সৈন্যদিগের চৌকি দিবার জন্য ঘাঁটি (Picket) রহিয়াছে।

বন্দুক আফ্রিদিদের নিকট অতি মূল্যবান সামগ্রী। তাহাদের ছোট ছেলেরা পর্য্যন্তও বন্দুক বা রিভল্‌বার না লইয়া পথে বাহির হয় না। পার্ব্বত্য জাতিদের বাসগৃহসমূহ এক একটি দুর্গের আকারে মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত; কারণ নিজ জাতির মধ্যে সদ্ভাব বড়ই বিরল। পরস্পরের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামাও যথেষ্ট হয়; কিন্তু ইহাদের একটি বিশেষ গুণ এই যে, বিদেশী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে সকলে সমস্ত বিদ্বেষ ভুলিয়া গিয়া সম্মিলিত ভাবে শত্রুর সহিত যুদ্ধ করে।

বন্দুক প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য পর্ব্বতোপরি স্থানে স্থানে পার্ব্বত্য জাতির কারখানা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই পথে যাইতে এইরূপ আফ্রিদিদের একটি কারখানা দৃষ্টিগোচর হইল। উহা দেখিবার উদ্দেশ্যে আমরা বাস হইতে অবতরণ করিয়া কারখানায় প্রবেশ করিবার অনুমতি লইতে সর্দ্দারের (খাঁন সাহেব) সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। আমরা কলিকাতার লোক শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ সর্দ্দার মহাশয় ভাঙ্গা হিন্দুস্থানী ভাষায় গম্ভীর স্বরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, "কোলকাত্তা! এ কিদার হ্যায়? নেহি নেহি কারখানা দেখনেকো নেহি দেগা—আভি যাও রাস্তাপর উঠো।" সর্দ্দার মহাশয়ের এই কথা উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সকল আফ্রিদিগণ আমাদের প্রতি বিষ দৃষ্টি হানিতে লাগিল। পুনর্ব্বার আমরা তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াও হতাশ হইলাম।

অবশেষে আমাদের পেশোয়ারি মোটরবাস্-চালক বাস্ হইতে অবতরণ করিয়া সর্দ্দার মহাশয়কে পোস্ত ভাষায় নমস্কার জানাইল— "তাড়ে মাসে, তাড়ে মাসে"। অতঃপর বাস-চালক পোস্ত ভাষায় আমাদের সাইকেলে কাশ্মীর-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বুঝাইয়া বলিতেই সর্দ্দার





কোহাট গিরি-সঙ্কটে স্বাধীন আফ্রিদিদের বন্দুকের কারখানা

দস্যু অভিহিত আফ্রিদি সর্দ্দার সাদরে অভ্যর্থনা করিলেন।

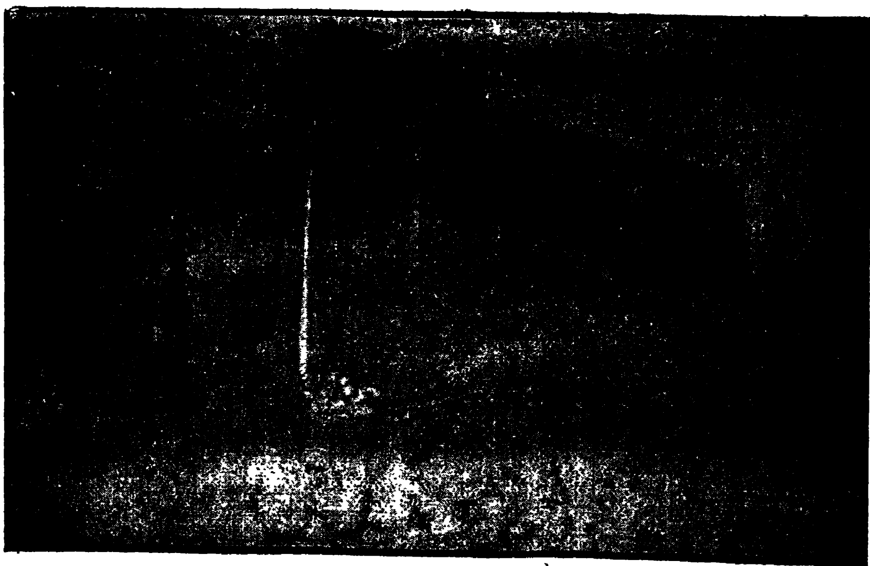
কারখানার মধ্যে বৃদ্ধ সর্দ্দারের সহিত হুইলার্স্‌গণ।

মহাশয়ের রক্তবর্ণ চক্ষু দুইটির পরিবর্ত্তন হইল এবং দস্যু নামে অভিহিত আফ্রিদি সর্দ্দার মহাশয় এই কথা শ্রবণ করিয়া আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কারখানার মধ্যে লইয়া গেলেন !

কারখানার মধ্যে যাইয়া দেখিলাম, কোনরূপ এন্‌জিন কিংবা বৈদ্যুতিক শক্তির দ্বারা ইহা চালিত নহে। যাবতীয় কলকব্জা কতকগুলি বৃহৎ চক্রের সহিত সংযুক্ত করিয়া মনুষ্যের হস্ত দ্বারা চালিত হইতেছে। এই ভাবে কার্য্য করিয়া দৈনিক দুই তিনটি বন্দুক প্রস্তুত হয়। সকল বন্দুকের মধ্যে আট, দশটি টোটা ভরিবার ঘর আছে। বন্দুকগুলি দেখিতে বিলাতি অপেক্ষা কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট নহে। কারখানা দেখা শেষ হইলে সর্দ্দার মহাশয় আমাদের সহিত করমর্দ্দন করিলেন ও আমরাও বিদায় কালে তাঁহাকে 'তাড়ে মাসে' করিতে ভুলি নাই।

কোহাট ছাওনী হইতে ফিরিতে সন্ধ্যা হইল। পরদিন প্রত্যূষে খাইবার গিরি-সঙ্কট দেখিতে যাইবার জন্য একটি মোটর-বাস্ রিজার্ভ করিলাম। আজকাল খাইবার গিরি-সঙ্কটে যাইবার খুবই সুবিধা। পেশোয়ার হইতে বহু মোটর-বাস দর্শকদের লইয়া প্রত্যহই ঐ পথে যাইয়া থাকে। ট্রেণেও যাইবার সুবিধা আছে। পেশোয়ার হইতে প্রত্যূষে ট্রেণ 'ল্যাণ্ডিকোটাল' অবধি গমন করে ও পুনরায় ঐ ট্রেণ সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসে। ল্যাণ্ডিকোটাল হইতে পাঁচ মাইল দূরে 'ল্যাণ্ডিখানা'। সোমবার ও বৃহস্পতিবার ব্যতীত ল্যাণ্ডিখানা অবধি ট্রেন চলে না। ল্যাণ্ডিখানাই খাইবারের শেষ সীমানা, তাহার পরই আফ্‌গান রাজত্ব। কিন্তু ট্রেণে ল্যাণ্ডিখানা যাইলে ষ্টেসনের প্ল্যাটফরম ব্যতীত অন্য কোথাও যাইবার আদেশ নাই। অতএব আফগান ও ব্রিটীশের সীমানা-জ্ঞাপক কণ্টক-বেষ্টনীর দর্শন-লাভ অসম্ভব।

পূর্ব্বে এই গিরি-সঙ্কটে প্রবেশ করিতে হইলে পলিটিক্যাল এজেণ্টের নিকট অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া অনুমতি-পত্র লইতে



কোহাট গিরি-সঙ্কটের শেষ পুলিশ-ছাওনি

হইত। আজকাল ল্যাণ্ডিকোটাল অবধি গমন করিলে কোনরূপ অনুমতি-পত্রের প্রয়োজন হয় না। যদি ল্যাণ্ডিকোটাল হইতে শেষ সীমানা ল্যাণ্ডিখানা যাইতে হয়, তাহা হইলে অনুমতি-পত্র ব্যতীত যাওয়া যায় না। আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও ল্যাণ্ডিখানা অবধি যাইবার জন্য অনুমতি পাইলাম না। কি জানি, ভালরূপ পড়াশুনায় মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও—পরীক্ষায় সেকেণ্ড-ডিভিসন। অর্থাৎ ল্যাণ্ডিকোটাল হইতে তিন মাইল 'মিছ্‌নিকাণ্ডাও' অবধি যাইবার আদেশ হইল। এই স্থান হইতে ল্যাণ্ডিখানার দূরত্ব দুই মাইল ও প্রায় পাঁচশত ফিট্ নিম্নে পরিষ্কার ছবির ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়।

খাইবার গিরিসঙ্কটে প্রবেশ করিতে হইলে অনেক প্রকার আদেশ পালন করিয়া চলিতে হয়, যথা—প্রাতে সাড়ে এগারটার পর কাহাকেও গিরি-সঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। অপরাহ্ন তিন ঘটিকার মধ্যে ল্যাণ্ডিকোটাল ত্যাগ করিয়া সন্ধ্যা সাত ঘটিকার ভিতর খাইবার ছাড়িয়া যাইতে হইবে। টাঙ্গাগাড়ী ও মোটর ব্যতীত পদব্রজে কিংবা সাইকেলে প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। অবশ্য টাঙ্গাগাড়ী করিয়া ঐ দারুণ পার্ব্বত্য-পথের মধ্যে যাইতে কেহই ভরসা করেন না। গিরি-সঙ্কটের রাস্তা ছাড়িয়া বাহিরে পার্ব্বত্য জাতিদের রাজত্বের মধ্যে কেহ পদক্ষেপ করিবে না, ইত্যাদি।

রাঁচী হইতে শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু সেন মহাশয় পেশোয়ার-ভ্রমণে আসিয়া বাবু-মহল্লার মেসেতেই উঠিয়াছিলেন। তিনিও আমাদের সহিত খাইবার পথের পথিক হইলেন। তাঁহার বন্ধুবর এখানকার জেনারেল পোষ্ট আফিসের পেশোয়ারী পোষ্ট-মাষ্টার কর্ত্তৃক ল্যাণ্ডিকোটাল দুর্গের পলিটিক্যাল তহসিলদার মহাশয়ের নিকট টেলিফোনযোগে সংবাদ প্রেরিত হইল—"ক্যাল্‌কাটা হুইলার্সের কয়েকজন সভ্য খাইবার দেখিতে যাইতেছেন।"

পেশোয়ার হইতে যাত্রা করিয়া যখন খাইবার গিরি-সঙ্কটের পাহাড়-গুলি প্রথম দৃষ্টিগোচর হইল, তখন হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল সেই ইতিহাসে পড়া খাইবার-গিরি-সঙ্কট—যে সঙ্কটের মধ্য দিয়া ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বে সুদূর গ্রীসবাসী আলেক-জাণ্ডারের ভারত-অভিযান হইয়াছিল। তাহার পর বিখ্যাত মুসলমান নেতা মামুদের ১০০০ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে এই পথ দিয়াই ভারত প্রবেশ ও পেশোয়ারের সমভূমিতে জয়পালের সহিত সাক্ষাৎ। জেঙ্গিস খাঁর বংশধর বাবর হুমায়ুন প্রভৃতিও এই পথ দিয়া একাধিক বার যাত্রা করিয়াছিলেন। সুতরাং এই খাইবার গিরি-সঙ্কটই প্রধান অবলম্বন হইয়া বহুবার ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। যাহা হউক, এই সকল ঐতিহাসিক চর্চ্চায় বেশীক্ষণ মনোযোগ দেওয়া সম্ভব হইল না। কারণ, আমাদের মোটর-বাস্ 'জামরুদে' আসিয়া থামিয়া গেল।

পেশোয়ার হইতে জামরুদ দশ মাইল ও এই স্থান হইতে কয়েক মাইলের পর গিরি-সঙ্কট আরম্ভ। এইখানে সকল মোটরবাস্‌কে টোল মাশুল দিবার জন্য থামিতে হয় ও পুলিশ কর্ত্তৃক যাত্রীদের পরীক্ষাও আর একটি উদ্দেশ্য। রাস্তার দক্ষিণে জামরুদ দুর্গ। শুনিলাম এই দুর্গ পঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত। কম্যাণ্ডিং অফিসারের অনুমতি লইয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলাম। এখানে ভারতীয় সৈন্যেরই সংখ্যা অধিক। তাহারা সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। দুর্গ-মধ্যে এক স্থানে রণজিৎ-সিংহের সৈন্যাধ্যক্ষ বীর হরিসিংহের লৌহজাল-বেষ্টিত স্মৃতি-মন্দির দেখিলাম। সিপাহী বিদ্রোহকালে হরিসিংহ এই দুর্গটি তাঁহারই বলিয়া ঘোষণা করেন; এবং ব্রিটীশের বিরুদ্ধে জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ইহার রক্ষার্থে প্রাণ উৎসর্গ করেন। জামরুদ দুর্গের একজন ভারতীয় সৈন্যের জমাদার বচন সিংহ মহাশয় আমাদের খাইবার সম্বন্ধে

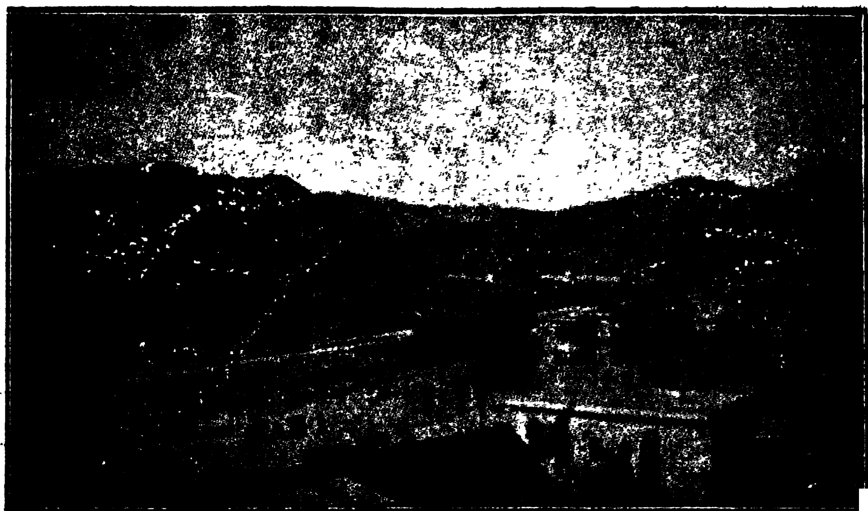
বুঝাইয়া দিবার জন্য আনন্দের সহিত ল্যাণ্ডিকোটাল অবধি চলিলেন। এ স্থান হইতে ল্যাণ্ডিকোটাল ১৯ মাইল এবং ল্যাণ্ডিখানা আরও পাঁচ মাইল।

জামরুদ ছাড়িয়া যাইতেই ক্রমশঃ চড়াই আরম্ভ হইল ও দেখিতে দেখিতে বৃক্ষলতাদি-শূন্য পাহাড়সমূহ চারি দিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে আমাদের খাইবার গিরি-সঙ্কট সম্বন্ধে নানারূপ ভয়াবহ ধারণা ছিল। এক্ষণে দেখিলাম, ব্রিটীশরাজ মূলগিরি-সঙ্কট অনুসরণ করিয়া পর্ব্বতক্রোড়ে দুইটি সুন্দর রাস্তা নির্ম্মিত করিয়া গিরি-সঙ্কটের সঙ্কটতা দূর করিয়া ফেলিয়াছেন। ইহা ব্যতীত পেশোয়ার হইতে ল্যাণ্ডিখানা অবধি প্রশস্ত (Broad gauge) রেলপথ উল্লেখযোগ্য। জামরুদ হইতে ইহার কার্য্য ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়া কিছু দিন স্থগিত ছিল। বহু অর্থ ব্যয়ে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ল্যাণ্ডিখানা অবধি সাড়ে ছাব্বিশ মাইল পথ-নির্ম্মাণ সম্পন্ন হয়। এই রেলপথ ৩৪টি সুড়ঙ্গ ও অসংখ্য সেতু অতিক্রম করিয়াছে। সুড়ঙ্গগুলি একত্র সংযোগ করিলে দৈর্ঘ্যে তিন মাইল হইবে। রেলপথ দ্বারা বহির্বাণিজ্যের উপস্থিত কিছুই সুবিধা হয় নাই। উষ্ট্রই এই পথের প্রধান যানরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। পার্ব্বত্য জাতিরা উষ্ট্রপৃষ্ঠে পণ্য-দ্রব্য লইয়া মধ্য এসিয়ার সহিত ভারতের বাণিজ্য চালায়। বাণিজ্য-সম্ভার পৃষ্ঠে লইয়া পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় উষ্ট্রের গমন—সে এক মনোরম দৃশ্য। অধুনা ব্রিটীশরাজের খাইবার মধ্যস্থিত দুর্গসকলের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি রেলযোগে প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে জামরুদ হইতে ল্যাণ্ডিখানা পর্য্যন্ত পাহাড়ের উপর দিয়া মজবুত লৌহ-তারের দড়ার সাহায্যে শূন্যপথে (Ariel Rope-way System) মালপত্রাদি প্রেরণের বন্দোবস্ত ছিল।

জামরুদ হইতে পাঁচমাইল দূরে 'সাগাই' নামক একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত রক্তবর্ণের দুর্গের নিকট উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, এই দুর্গটি কয়েক বৎসর মাত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। সাগাই হইতে নিম্নে অল্প দূরে আলি-

মস্‌জিদ নামক স্থানে ব্রিটীশদের একটি দুর্গ ছিল, কিন্তু পার্ব্বত্যজাতির উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া ব্রিটীশ-রাজ সাগাই দুর্গটি নির্ম্মান করিয়াছেন। এই পার্ব্বত্য পথের মধ্যে এতদূর পর্য্যন্ত কোন বৃক্ষাদি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখন আলি-মসজিদের নিকট আসিতেই কয়েকটি বৃক্ষ দেখিয়া বিশাল মরুভূমি মধ্যস্থিত জলাশয়ের কথা স্মরণ হইল। বৃক্ষ-সমন্বিত একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মস্‌জিদ, চতুঃপার্শ্বে নানারূপ রঞ্জিত পতাকা। এই ক্ষুদ্র মস্‌জিদের নামই 'আলি-মস্‌জিদ'। এইরূপ রম্য স্থানে মস্‌জিদ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম বহু কাল পূর্ব্বে আলি নামক একজন মুসলমান ফকির এই স্থানে ঈশ্বর-আরাধনায় মগ্ন হইয়াছিলেন। বহু পার্ব্বত্য জাতি তাঁহার শিষ্য হইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিত। এখানে তিনি দেহত্যাগ করেন ও পরে শিষ্যাদি কর্ত্তৃক উক্ত মসজিদটি স্থাপিত হইয়া 'আলি-মস্‌জিদ' নামে মুসলমানদিগের তীর্থস্থান হইয়া উঠিয়াছে।

আলি-মস্‌জিদ অতিক্রম করিয়া কিছু দূর যাইতে একটি পানীয় জলের কারখানা দেখিতে পাইলাম। এই নিরালা পর্ব্বত মধ্যস্থিত জলের কারখানাটি সৈন্যদিগের পিপাসা নিবারণের জন্যেই প্রস্তুত। কারখানার নিকটবর্ত্তী রাস্তার মধ্যে কয়েক স্থানে কল থাকায় পার্ব্বত্য জাতিদেরও যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। কারখানা অতিক্রম পূর্ব্বক রাস্তা ক্রমশঃই ঘুরিতে ঘুরিতে রেলপথের পার্শ্ব দিয়া চলিতে লাগিল। এই সকল স্থানের বহু পর্ব্বত-চূড়ায় সৈন্যদিগের ঘাঁটি রহিয়াছে। সাগাই হইতে ১৪ মাইলের পর খাইবার পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান ল্যাণ্ডিকোটাল (৩৫০০ ফিট্) পৌছিলাম। এ স্থান হইতে দুইটি জলস্রোত একটি উত্তর-পশ্চিম অভিমুখে কাবুলের দিকে ও অপরটি দক্ষিণ-পূর্ব্বে জামরুদের দিকে প্রবাহিত। ল্যাণ্ডিকোটাল সৈন্যদিগের একটি বৃহৎ আড্ডা। ক্ষুদ্র সহরটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—পর্ব্বত মধ্যস্থিত উপত্যকায় স্থাপিত।



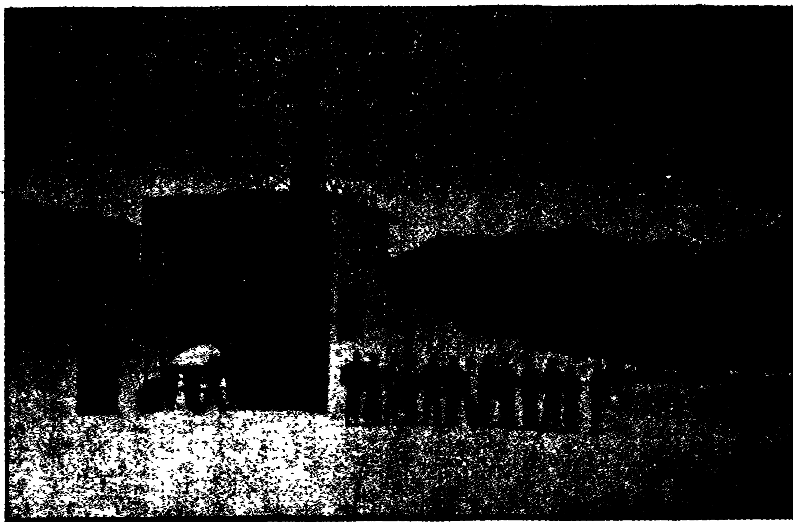
মরুদ দুর্গ হইতে আফ্রিদিগণের 'জাম' নামক ক্ষুদ্র গ্রাম ও খাইবার পাহাড়ের দৃশ্য

শহরের এক পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র বাজার, এমন কি সৈন্যদিগের আমোদের জন্য একটি 'সিনেমা-হাউস্'ও আছে। আমাদের সহিত জমাদার বচন সিং ল্যাণ্ডিকোটাল দুর্গ অবধি আসিয়া বিদায় লইলেন।

পেশোয়ারের পোষ্টমাষ্টার মহাশয় এই দুর্গে আমাদের খাইবার-ভ্রমণের বিষয় টেলিফোনে জানাইয়া ছিলেন। সেই কারণে এখানকার পলিটিক্যাল তহসিলদার, বর্ডার একজামিনার, আই-এম্-এস্ অফিসার এবং পোষ্ট-মাষ্টার মহাশয়গণ আমাদের সসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাদের জন্য প্রচুর পরিমানে জলযোগের ব্যবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইলাম। এই দুর্গ অধিকাংশই ব্রিটীশ সৈনিক দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। দুর্গটী বৃহৎ নহে এবং এখানে উল্লেখযোগ্য কিছুই নাই।

ল্যাণ্ডিকোটাল প্রদক্ষিণের পর দুর্গের পোষ্ট-মাষ্টার আমীর বক্স্ মহাশয়কে সুবিধার জন্য সঙ্গের সাথী করিয়া যাত্রা করিলাম; কারণ, তাঁহার এই সকল স্থানের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে। নিয়মানুযায়ী একজন আফ্রিদি চৌকিদার আমাদিগকে নজর-বন্দীতে রাখিবার জন্য দুর্গ হইতে প্রেরিত হইল। অতঃপর লৌহ-নির্ম্মিত ফটক পার হইয়া হু হু শব্দে তিন মাইল উৎরাই অতিক্রম পূর্ব্বক মিছনী-কাণ্ডাওয়ে আসিয়া পড়িলাম। মিছ্নীকাণ্ডাও হইতে দুই মাইল উৎরাইএ খাইবার গিরি-সঙ্কটের শেষ সীমানা 'ল্যাণ্ডিখানা'।

এখানে গুর্খাসৈনিকগণের একটি ঘাঁটি অবস্থিত। এই ঘাঁটি হইতে পোষ্টমাষ্টার মহাশয় একটি ভাল দূরবীক্ষণ আনিয়া আমাদের ল্যাণ্ডিখানার দৃশ্য দেখিবার বড়ই সুবিধা করিয়া দিলেন। দূরবীক্ষণ দ্বারা যে কি চমৎকার দৃশ্য দেখিলাম, তাহা আমার মত ক্ষুদ্র লেখকের লেখনীর দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব। আফ্গান রাজত্বের ভিতর পর্ব্বত-সমূহ সারের পর সার দিয়া সমুদ্রের ঢেউএর ন্যায় দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গিয়াছে। দূরবর্ত্তী তুষারাচ্ছাদিত পর্ব্বত-রাজির উপর সূর্য্য-রশ্মি



ল্যাণ্ডিকোটাল দুর্গের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিদায় গ্রহণ—খাইবার

পতিত হওয়ায় মনে হয়, প্রকৃতিদেবী যেন লজ্জায় শুভ্র অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত। এই মনোরম পর্ব্বতমালার মধ্য দিয়া কাবুল নদী প্রবাহিত; দূর হইতে মনে হয় যেন পর্ব্বতমালা রৌপ্য মেখলায় ভূষিত। ক্ষুদ্র উপত্যকার মধ্যে ল্যাণ্ডিখানার দৃশ্য দূরবীক্ষণ সাহায্যে সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। এমন কি আফগানের সীমানার চিহ্ন স্বরূপ কাষ্ঠ ও কণ্টক-বেষ্টনী সাক্ষ্য দিতেছে, তাহাও দেখিলাম। বেষ্টনীর সংলগ্ন একটি কাষ্ঠ-ফলকের উপর কয়েক ছত্র ইংরেজী ভাষায় কি লেখা আছে তাহা পড়িতে না পারায় পোষ্টমাষ্টার মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, "It is absolutely forbidden to cross this border into Afgan Territory" অর্থাৎ—এই সীমানা-পার হইয়া আফগান রাজত্বে প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। বেষ্টনীর অপর পার্শ্বে আফগানের অন্তঃর্গত শুভ্র বর্ণের পোষ্ট অফিস, দুর্গ ও পাহাড়ের চূড়ায় কয়েকটি ঘাঁটিও দৃষ্টি-গোচর হইল। ল্যাণ্ডিখানায় ব্রিটীশরাজের স্থায়ী তাঁবুগুলি সুন্দররূপে বিরাজ মান।

ভারতের দ্বার, ল্যাণ্ডিখানা গুর্খা সৈন্যের দ্বারা রক্ষিত! ইহার চতুঃপার্শ্বে পার্ব্বত্য জাতি—আফ্রিদি, সিন্‌য়োরীস, ও মামোণ্ডিদের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গের ন্যায় কুটীরসমূহ অবস্থিত। কোন কোন স্থানে পাহাড়ের গুহায় ঐ সকল জাতি বসবাস করিতেছে। দূরে পর্ব্বত-চূড়ায় ব্রিটীশের 'চারবাক' নামে দুর্গটি স্থাপিত এবং ইহার নিকট দুই তিনটি নির্ঝরিণী কলকল নাদে প্রবাহিত। পূর্ব্বে এই স্থানটি আফগানের অধিকারভুক্ত ছিল, এখন কাবুল-ব্রিটীশের যুদ্ধের পর ব্রিটীশ হস্তগত হইয়াছে। এই সকল দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে আমরা ভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলাম। এমন সময় এই বাস্তব সৌন্দর্য্যের সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ করিয়া পোষ্টমাষ্টার মহাশয় ঘড়িতে আড়াইটা বাজিয়াছে তাহা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কারণ, তথা হইতে তিনটার মধ্যে ফিরিতে



খাইবার গিরি-সঙ্কট (মিচ্‌নীকাণ্ডাও)

হইবে ইহাই ব্রিটীশ-রাজের আইন, তাহা আমরা জানিতাম। এই কারণে, অতি দুঃখের সহিত ঐ মনোরম স্থান বাধ্য হইয়া ত্যাগ করিতে হইল।

মোটর-বাস গমনের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একটি ১৭ বৎসর বয়স্ক দীর্ঘ, বলিষ্ঠ, সুন্দর আফগান বালক খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে মোটর-বাসের নিকটস্থ হইয়া অতি ক্লান্তভাবে দেশীয় ভাষায় কি যে বলিতে লাগিল তাহা আমাদের বোধগম্য নয়। কিন্তু পোষ্টমাষ্টার মহাশয় তাহার কথায় বুঝিতে পারিলেন যে, বালকটি নগ্নপদে কাবুল হইতে এতদুর পদব্রজে আসিয়াছে। এইরূপ আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বালকটি বলিতে লাগিল, "আমি কাবুলে নাদিরশাহের অধীনে একটি দুর্গে কার্য্য ও দেশীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা-নবিশী করিতাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুর্গটি বাচ্চাইসাকোর লোক দ্বারা ভস্মীভূত হওয়ায় আমি ব্যতীত সমস্ত-লোক মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছে। সেইজন্য আমি প্রাণভয়ে অতিকষ্টে তথা হইতে পলায়ন করিয়া এতদূর আসিয়াছি—ইচ্ছা পেশোয়ার যাইব। কারণ, সেখানে অনেক দেশওয়ালী ভাই আছে, যদি কেহ দয়া করিয়া কোন চাকুরী দেয় এই আশায়। আপনারা যদি দয়া করিয়া পৌছাইয়া দেন তাহা হইলে এই বিপন্নের প্রতি অনুগ্রহের জন্য খোদা আপনাদের মঙ্গল করিবেন।"

এই সকল কথা পোষ্টমাষ্টার মহাশয় ইংরেজীতে তর্জ্জমা করিয়া আমাদের বুঝাইয়া দিলেন। অতঃপর সেই সাহসী বালকটিকে মোটরে তুলিয়া লইলাম বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাকে আমাদের সহিত বেশী দূর যাইতে হইল না। কারণ, ল্যাণ্ডিকোটাল দুর্গের কাছে মোটরবাস আসিয়া থামিতেই, আইনতঃ আফ্রিদি চৌকিদার সঙ্গে থাকা সত্বেও আমরা সকলে ফিরিয়াছি কি না ব্রিটীশ নিয়োজিত কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা গণিত হইলাম। সেই আফগান বালকটি তাঁহাদের তীক্ষ্ণ চক্ষু এড়াইল না। তাঁহারা



সিছ্নীকাণ্ডাও হইতে ব্রিটিশের শেষ সীমানা ল্যাণ্ডিখানার দৃশ্য

তাহাকে আটক করিয়া আমাদের সকলকে অবাধে যাইতে দিলেন। কিন্তু বালকটি ঐ সামান্য পথ সঙ্গে আনয়ন করার জন্য কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হইয়া আমাদের হাসিমুখে সেলাম করিয়া হৃদয়ের সরলতা দেখাইল, এবং বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাদের সহিত চলিয়া গেল। পোষ্টমাষ্টার মহাশয়ও অমাদের নিকট বিদায় লইয়া দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিলেন। ল্যাণ্ডি-কোটাল পশ্চাতে রাখিয়া সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকার সময় আমরা খাইবার গিরি-সঙ্কটকে বিদায় দিয়া ইস্‌লামিয়া কলেজে পৌছিলাম। ল্যাণ্ডি-কোটাল হইতে ইস্‌লামিয়া কলেজ ২১ মাইল ও এখান হইতে পেশোয়ারের দূরত্ব ৮ মাইল।

ইস্‌লামিয়া কলেজটি যে স্থানে অবস্থিত পূর্ব্বে সে স্থান বড় ভয়ঙ্কর ছিল। কারণ পার্ব্বত্য জাতির অত্যাচারের ভয়ে কেহ দিবসেও আসিতে সাহস করিত না। কিন্তু এখন ইহা সর্ব্বদাই নব্য পাঠান ছাত্রদের কোলাহল ও আনন্দধ্বনিতে মুখরিত। নানারূপ ফল ফুলের বৃক্ষ ব্যতীত কলেজ সংরক্ষণের জন্য অন্য কোনরূপ প্রাচীর নাই; ইচ্ছা করিলে আফ্রিদিগণ নিমিষের মধ্যে কলেজ লুণ্ঠন করিতে পারে। কিন্তু তাহারা ইহাকে তাহাদের জ্ঞান-মন্দির বলিয়া জানে ও ইহা আক্রমণ করা ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ মনে করে। সার জর্জ্জ রুজ কেপেল্ ও নওয়াব সার আবদুল কৈয়মখান এই দুই মহাপ্রাণ ব্যক্তির উদ্যমে ৩০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজটি স্থাপিত হইয়াছে।

ক্ষুদ্র দুইটি পাহাড় কলেজের সন্নিকটে অবস্থিত। এই পাহাড় দুইটি খনন করিয়া বুদ্ধদেবের বহু মূর্ত্তি, মুদ্রা ও অন্যান্য প্রস্তরসমূহ বাহির হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে এ স্থানে বুদ্ধদেবেব মন্দির ছিল, তাহা ভূতত্ত্ববিৎ ও প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। কলেজটি আবার যুদ্ধের কার্য্যেও সময় সময় ব্যবহৃত হয়; গত ১৯১৯ সালে ব্রিটীশ-আফগান যুদ্ধের সময় ইহা সেনানিবাস ও হাসপাতালে পরিণত

হইয়াছিল। প্রথম কলেজ স্থাপিত হইবার পর অতি কষ্টে ৪৬ জন ছাত্র জুটাইয়া কলেজ বসিল। কিন্তু বর্ত্তমানে ছাত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০০ হইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশ, ভারতের বাহিরে মালাকান্দ, খাইবার, ওয়ানা, কোহাট, টচি, চিত্রাল ও কোরামভ্যালী প্রভৃতি স্থান হইতে ছাত্রেরা আসিয়া থাকে। পূর্ব্বে ইহা কেবলমাত্র মুসলমাল ছাত্রদিগের জন্যই স্থাপিত হয়, কিন্তু শুনিলাম কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রাভাবে বা যে কোন কারণেই হউক এবার হইতে হিন্দুছাত্র লইতে মনস্থ করিয়াছেন। পেশোয়ার হইতে শুনিয়াছিলাম এখানকার Economicsএর প্রফেসার ঢাকা জিলার অন্তর্গত একজন বাঙ্গালী—রকীবউদ্দিন আহাম্মদ মহাশয়। আমরা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় অকস্মাৎ এতগুলি বাঙ্গালীর দর্শনে আশাতীত আনন্দে বিভোর হইয়া, তিনি আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া কলেজের প্রত্যেক স্থান দেখাইলেন। তাঁহার অনুরোধে জলযোগে প্রবৃত্ত হইতেই পাঠান ছাত্রদিগের অতিথি-সেবায় আত্মনিয়োগ ও আহম্মদ মহাশয়ের প্রতি অপার ভক্তি দেখিয়া আমরা বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিলাম।

যাহা হউক, আমাদের বিদায় কালে আহাম্মদ মহাশয়ের মন যে খুবই খারাপ হইয়া উঠিল, তাহা তাঁহার কথাবার্ত্তায় প্রকাশ পাইল। রাত্রি সাড়ে আটঘটিকায় পেশোয়ারে বাবুমহল্লার মেসে উপস্থিত হইলাম। ডাক্তার ঘোষ মহাশয় পূর্ব্ব হইতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহার সহিত নানারূপ আলোচনায় জানিতে পারিলাম, পার্ব্বত্য জাতিরা নানা প্রকার জীব-জন্তুর চামড়া পেশোয়ারে বিক্রয়ার্থ আনয়ন করে, এবং উহা সময় সময় নামমাত্র মূল্যে বিক্রয় করিয়া যায়। নানাবিধ মেওয়া ফলও এই স্থান হইতে ভারতের চতুর্দ্দিকে প্রেরিত হয়। এখনও এই সকল ব্যবসায়ের যথেষ্ট সুবিধা আছে।

পরদিন পেশোয়ার হইতে বিদায় লইয়া পুনরায় ট্রেণে চাপিয়া বসিলাম—রাওলপিণ্ডির পথে। ট্রেণ যখন রাওলপিণ্ডি জিলার অন্তর্গত

উপত্যকামধ্যস্থ প্রাচীন যুগের ক্রীড়াভূমি তক্ষশীলায় উপস্থিত হইল, তখন আমরা ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলাম। কারণ, রামায়ণ-কথিত তক্ষশিলা অর্থাৎ ভরতের পুত্র তক্ষের রাজধানী অধুনা তক্ষশীলা বা ট্যাক্শীলা দেখিবার লোভ-সংবরণ করিতে পারিলাম না। রামায়ণ মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া ঐতিহাসিক যুগ অবধি এ স্থানের নৃপতিগণের কীর্ত্তিরাজির কথা সবিশেষ বিখ্যাত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে এখানে একটি বিশাল শিক্ষা-কেন্দ্র অবস্থিত ছিল। পৃথিবীর বহু দেশ হইতে শিক্ষার্থিগণ তক্ষশীলা



তক্ষশীলায় বৌদ্ধযুগের মন্দিরে

বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। ভারত গভর্ণমেণ্টের প্রত্ন-তত্ত্ববিভাগ এই স্থানের কিয়দংশ খনন করিয়া প্রাচীন যুগের কীর্ত্তি মন্দির, নগর, বৌদ্ধস্তূপ, শিলালিপি, বিহার ও নানারূপ দ্রব্যাদি আবিষ্কার করিয়া ভারত যে অতীতে জ্ঞান ও সভ্যতার এক কেন্দ্রভূমি ছিল, তাহা আজ মানবের নিকট সপ্রমাণ করিতেছেন। আমরা এই সকল দেখিবার নিমিত্ত তথাকার মিউজিয়মের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে অনুমতি-পত্র লইয়া আবিষ্কৃত স্থান সমূহ দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিলাম। এখনও খনন কার্য্য পূরাদমে চলিতেছে।

তক্ষশীলা হইতে তখন ট্রেণ না থাকায় মোটর বাসে গ্রাণ্ড-ট্রাঙ্ক-রোড ধরিয়া ২২ মাইল দূরবর্ত্তী রাওলপিণ্ডীতে উপস্থিত হইলাম। ৩রা নভেম্বর প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে বিউগল ধ্বনিতে উন্মত্ত হইয়া রাওলপিণ্ডী হইতে পুনরায় সাইকেলে আরোহণ পূর্ব্বক ভূস্বর্গের রাজধানী শ্রীনগরাভিমুখে গতি নিয়ন্ত্রিত করিলাম। এখান হইতে শ্রীনগর ১৯৮ মাইল।

"ভূস্বর্গে আরোহণ"

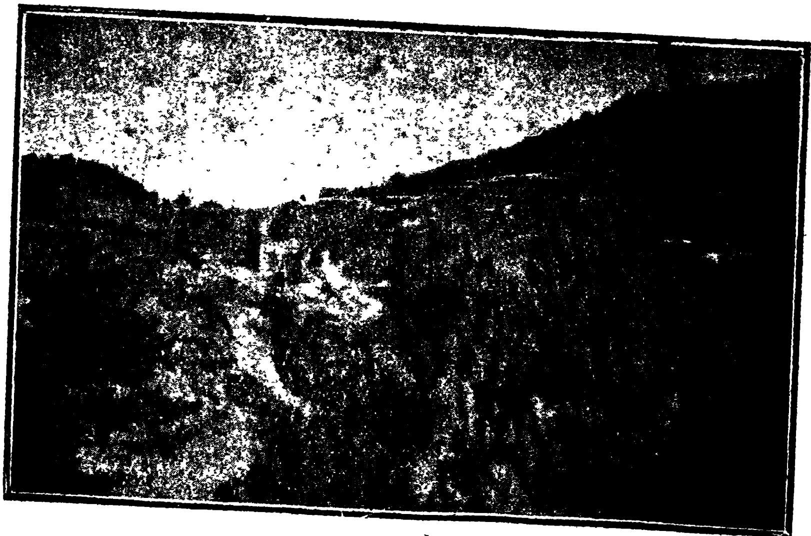
রাস্তা সমতল পাইয়া দ্রুতগতি সাইকেল ছুটাইয়া চলিয়াছি। সম্মুখে হিন্দুকুশের অভ্রভেদী শৃঙ্গরাজি দিগদিগন্তর ব্যাপিয়া ঘোর তরঙ্গের ন্যায় আকাশ-পথ প্লাবিত করিয়াছে,—যেন আমাদের ভূস্বর্গারোহণের পথ রুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান। ক্রমে ১৪ মাইল সমতল ভূমি অতিক্রম করিয়া বৃক্ষলতাদি-শূন্য পার্ব্বত্য পথের উপর দিয়া যাইতে লাগিলাম। ১৬ মাইল ছয় ফারলংএর নিকট 'বরাকো' নামক স্থানে (২০৬০ ফিট্ উচ্চ) টোল আফিসের নিকট উপস্থিত হইতেই সম্মুখে আবদ্ধ ফটকের উপর থামিবার নির্দ্দেশ দেখিয়া সকলে গাড়ী হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলাম। অতঃপর টোল আফিসে মাশুল দেওয়ার পর ফটক উন্মুক্ত হইল। ফটক পার হইয়া বাম পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র বাংলো দেখিলাম। এই বাংলোটি রাওলপিণ্ডীনিবাসী মহম্মদ একবাল্ মহাশয় নির্ম্মাণ করিয়া পথিকদিগের থাকিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। এখানে ক্ষুদ্র কয়েকটি চা ও অন্যান্য খাদ্য-দ্রব্যের দোকানও আছে।

টোল অফিসের পর হইতে রাস্তা ক্রমাগত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। পথের প্রচণ্ড ধূলা ও চড়াইয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে করিতে বিশেষ ক্লান্ত হইয়া ছর্‌রা-পানি (২৭ মাইল ও ৪০৩১ ফিট্ উচ্চ) নামক ক্ষুদ্র পল্লীতে চায়ের দোকান দেখিয়া বিশ্রামলাভ ও চা পানের অভিলাষে গাড়ীর গতিরোধ করিলাম। অর্দ্ধঘণ্টাকাল বিশ্রামের পর পুনরায় সম্পূর্ণ শক্তিতে গাড়ীর পাদানি চাপিতে লাগিলাম; কিন্তু দুঃখের বিষয়, অধিক শক্তি প্রয়োগেও বাতপঙ্গু ছ্যাক্‌রা গাড়ীর ঘোড়া অপেক্ষা সাইকেলের গতি অধম হইয়া পড়িল। এইরূপ কায়িক পরিশ্রমের ভিতরেও মুণ্ডিত-মস্তকবিশিষ্ট পর্ব্বতের স্থানে-স্থানে কেশগুচ্ছের ন্যায় দেবদারু বৃক্ষরাজি যে কৌতুকজনক দৃশ্য ধারণ করিয়াছে—তাহা দেখিতে বিস্মৃত হই নাই।

ক্রমে রাস্তা অধিকতর উচ্চে উঠিতে লাগিল বলিয়া আমরা সাইকেল হইতে অবতরণ করিতে বাধ্য হইলাম। অগত্যা সামগ্রী সমেত প্রায় একমণ পনের সের ভারি গাড়ীগুলি অতি কষ্টে ঠেলিতে ঠেলিতে চলিতে লাগিলাম। এই ভাবে প্রায় চার মাইল অতিক্রম করার পর গগন-মণ্ডল ঘোরঘন ঘটাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ অন্ধকারে ছাইয়া ফেলিল। পুনঃ পুনঃ মেঘগর্জ্জন পর্ব্বত-গাত্রে আহত হইয়া গর্জ্জননিরত বর্ষা-সমুদ্রের ন্যায় ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বিদ্যুৎদেবী মধ্যে মধ্যে তাঁহার ক্ষণিকের আলোক দ্বারা জনশূন্য পার্ব্বত্য পথকে আলোকিত করিয়া পুনরায় তমাচ্ছন্ন করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুর্য্যোগে নিকটবর্ত্তী কোন আশ্রয় লইবার স্থান দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন আমরা সাহসের উপর নির্ভর করিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলাম।

কয়েক পদ অগ্রসর হইতেই অকস্মাৎ পর্ব্বত-গাত্রে পটাপট শব্দ করিয়া নিমেষের মধ্যে বারি-পতনের পরিবর্ত্তে শিলাবৃষ্টি আসিয়া পড়িল। ঈশ্বরের কৃপায় এই ভীষণ দুর্য্যোগ বেশীক্ষণ আমাদের ভোগ করিতে হয় নাই। কারণ রিপোর্টার মহাশয় বিদ্যুতালোকে অনতিদূরে কয়েকখানি গৃহ দেখিয়া প্রফুল্ল মনে সকলের ভগ্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে তথায় ছুটিয়া গিয়া দেখিতে পাইলাম নিকটস্থ একখানি গৃহদ্বার উন্মুক্ত। গৃহস্বামীর বিনা আদেশেই সকলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—ইহা শিখদিগের ধর্ম্মশালা! এইরূপ দুর্য্যোগ সত্ত্বেও আমরা যে হিন্দু তাহা ধর্ম্মশালা-রক্ষকের নিকট প্রমাণ করিতে পারিলাম বলিয়া আশ্রয় মিলিল, নচেৎ মিলিত—অর্দ্ধচন্দ্র।

আশ্রয় পাইয়া জানিলাম এ স্থানটির নাম 'ঘোড়াগলি' (৫২৮০ ফিট্ উচ্চ)। রাওলপিণ্ডী হইতে ৩২ মাইল দূরবর্ত্তী ঘোড়াগলি,



সমুদ্র বক্ষ হইতে ৭২৫০ ফিট উচ্চে 'মারে' পর্ব্বতের দৃশ্য

৩৫৯১ ফিট্ চড়াই ভাঙ্গিয়া আসিতে প্রায় দশঘণ্টা লাগিয়াছিল। রাত্রে খাদ্যদ্রব্যাদি না মেলায় বাধ্য হইয়া নিরম্বু-একাদশী করিতে হইল। অবশেষে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে কম্বলে আপাদমস্তক আবরণ পূর্ব্বক নিদ্রাদেবীর আরাধনায় রত হইলাম—তখনও কাষ্ঠনির্ম্মিত আবদ্ধ কুটীরের মধ্য হইতে শিলা-বৃষ্টির ভীষণতা অনুভব করিতে পারিতে ছিলাম।

প্রভাতে আটঘটিকার সময় ঘোড়াগলি হইতে রওনা হইয়া 'সানি-ব্যাঙ্ক' (৬০৫০ ফিট্ উচ্চ) নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। রাওলপিণ্ডী হইতে ইহার দূরত্ব ৩৭ মাইল ও এখান হইতে ১২০০ ফিট্ উচ্চে দুই মাইল দূরে 'মারী'তে সৈনিকদিগের বৃহৎ ছাওনী অবস্থিত। এখন তুষার পতিত হইবার আশঙ্কায় মারী হইতে সকলে রাওলপিণ্ডী নামিয়া গিয়াছে। সানিব্যাঙ্ক স্থানটি বড়ই মনোরম; প্রায় পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর বলিলেই হয়। ক্ষুদ্র বাজার ও কয়েকটি হোটেল আমাদের দক্ষিণে রাস্তার উপর দৃষ্টিগোচর হইল। কিন্তু ঐ সকল হোটেল-কর্ত্তাগণও আসন্ন বরফের আশঙ্কায় হোটেল বন্ধ করিয়া স্থান ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল-মাত্র সানি-ব্যাঙ্ক নামক বৃহৎ হোটেলটি এখনও পথিককে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

এই হোটেলের নিকট পথটি দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণে মারী ও বামে কাশ্মীরাভিমুখে গমন করিয়াছে। আমরা বাম পথটি অনুসরণ করিয়া দুই মাইল চড়াই উৎরাইয়ের পর হঠাৎ অসম্ভবরূপ উৎরাই পথে নামিতে আরম্ভ করিলাম। পথটি অতিশয় বক্রাকারে নিম্নগতি অবলম্বন করিয়াছে। ইহার এক পার্শ্বে শত সহস্র ফিট্ নিম্নে ক্ষুদ্র পাহাড়ের চূড়াগুলি দৃষ্টিগোচর হয় ও অপর পার্শ্বে প্রস্তর-নির্ম্মিত বৃহৎ প্রাচীরের ন্যায় গিরি অটল অচল ভাবে দণ্ডায়মান। আমরা আমাদের উৎরাই পথে নামিবার নিয়মানুযায়ী

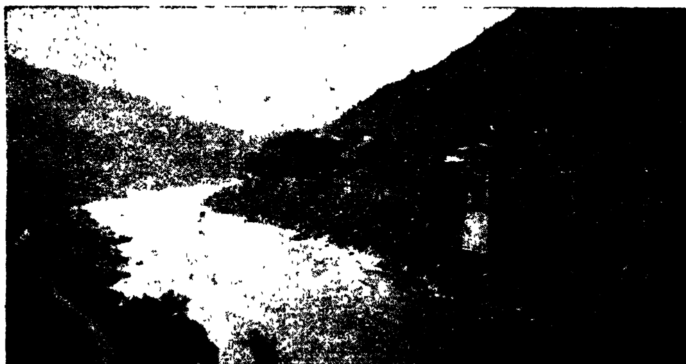
প্রত্যেকে প্রায় ৪০ ফিট্ ব্যবধানে সার দিয়া নামিতে লাগিলাম। কারণ এইরূপ উৎরাইয়ে পিছু পিছু নিকটস্থ ভাবে গমন করিলে বিপদের আশঙ্কা আছে।

প্রায় ১৫ ফিট্ প্রশস্ত পথ দিয়া মাঝে মাঝে হুস্ হুস্ শব্দে মোটরবাস্ গমন করায় আমাদের অধিকতর সাবধান হইয়া সাইকেলের হাতল ঠিক রাখিতে হইতেছে। এইরূপ পথে নামিতে নামিতে আমার গত বৎসরের দার্জ্জিলিং ভ্রমণের কথা স্মরণ হইল। দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিবার সময় ঠিক এইরূপ উৎরাই পথে নামিতে হইয়াছিল। অবশ্য ঐ রাস্তায় ঘন ঘন রেলপথের উপদ্রব থাকায় এ স্থান অপেক্ষা অধিকতর বিপদজনক। যাহা হউক, অকস্মাৎ পথটি সূক্ষ্ম কোণের আকার ধারণ করিয়া ঝরণার উপরিস্থ সেতু বাহিয়া নিম্নে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। প্রথম ব্যক্তি এইরূপ বিপদজনক বক্র পথ দেখিয়া নিয়মানুসারে সকলকে সতর্ক করিবার জন্য বংশীধ্বনি করিতেই, পর মুহূর্ত্তে 'অসময়ের বাঁশী'র করুণ রাগিণী শ্রবণ করিবামাত্র সকলে থামিতে বাধ্য হইলাম; কিন্তু 'ব্রেক' চাপিতে চাপিতে গাড়ী প্রায় ২৬ হাত দূরে গিয়া থামিবার পূর্ব্বেই যাহা দেখিলাম, তাহাতে সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল!

দ্বিতীয় ব্যক্তি (ফটোগ্রাফার) সতর্ক হইবার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া সাবধান হইবার জন্য গাড়ীর 'ব্রেক' পুনঃ পুনঃ কষিতে কষিতে রাস্তার বক্র স্থানে পৌঁছাইবামাত্র, সাইকেল পিছলাইয়া সজোরে ভূতলে পতিত হইল; এবং তাহার বলিষ্ঠ দেহখানি সরীসৃপের ন্যায় ভূমিতল ঘর্ষণ করিতে করিতে নিমেষে প্রায় ১০ হাত দূরবর্ত্তী সেতুর বেষ্টনী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত খুঁটীতে লাগিয়া থামিল। জীর্ণ খুঁটীটি হেলিয়া গিয়াও তাহার গতিরোধ করিয়াছে বলিয়া আজ আমাদের বন্ধুটি এ যাত্রা দৈববলে রক্ষা পাইল; নচেৎ পর্ব্বত-মধ্যস্থিত সেতুর প্রায় তিন চারি শত ফিট নিম্নে পতিত হইয়া প্রবাহিত ঝরণার

প্রবাহে কোন্ অজানা স্থানে গিয়া কেমন করিয়া কিরূপে থাকিত, তাহা কে বলিতে পারে ?

অতঃপর ফটোগ্রাফারের নিকট গিয়া দেখিলাম, দারুণ শীতের প্রকোপে উপর্য্যুপরি কয়েকখানি গরম পরিচ্ছদাদি পরণে থাকায় তাহার বক্ষঃস্থল প্রস্তরের আঁচড় হইতে রক্ষা পাইয়াছে ; কিন্তু গরম কোট, দস্তানা ও ফ্লানেলের পায়জামার জানুদেশটি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। এইরূপ ভীষণ ভাবে পতিত হইয়াও সামান্য আঁচড় ব্যতীত তাহার শরীরে আর কোনরূপ আঘাত লাগে নাই।



ঝিলাম নদী-তীরস্থ কোহালা গ্রাম

অনবরত উৎরাইয়ে 'ব্রেক' চাপিয়া নামিতে নামিতে কখন যে তাহার গাড়ীর ব্রেকের অংশ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সে জানিতে না পারায় এই বিপদকে আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

মাষ্টার-মেকানিক কর্ত্তৃক সকল গাড়ী পরীক্ষিত হইলে পর পুনরায় আমরা যাত্রা করিলাম। মধ্যে মধ্যে এইরূপ পরীক্ষা-পর্ব্ব চলিতে লাগিল। ঘোড়াগলি হইতে ৩২ মাইল আসিতেই 'কোহালা' (১৮৮০ ফিট্ উচ্চ) নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া অদ্যকার মত ভ্রমণ স্থগিত রাখিলাম।

ঘোড়াগলি হইতে সানি-ব্যাঙ্ক পর্য্যন্ত ৫ মাইল যাইতে ৭৭০ ফিট্ চড়াই উঠিতে হইয়াছিল ও সানি-ব্যাঙ্ক হইতে কোহালা অবধি আসিতে ৪১৭০ ফিট্ নামিতে হইয়াছে।

মারী হইতে একজন পুলীশ সাবইন্সপেক্টর আমাদের অনুসরণ করিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেরূপ সন্দিগ্ধচিত্তে তিনি সহসা আবির্ভূত হইয়া আমাদের উদ্ব্যস্ত করিলেন, সেরূপ সন্দেহজনক কোন দ্রব্যাদি না পাইয়া বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল।

কোহালা গ্রামটি পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্যে ঝিলাম নদীর পার্শ্বে



'ঝিলাম ভ্যালী রোডের' উপরিস্থ মাইল-স্তম্ভ

পর্ব্বত-গাত্রে অবস্থিত। কোহালাই ভূস্বর্গের দ্বার—মধ্যে ঝিলাম নদীর ব্যবধান। এই পথে গত বৎসরের প্রবল বন্যায় ভগ্ন কয়েকটি সেতু পুনঃনির্ম্মিত হওয়ায় আমরা আসিতে কোন অসুবিধা ভোগ করি নাই। কিন্তু নিকটবর্ত্তী রাস্তাটি ভাসাইয়া দেওয়ার ফলে অত্যন্ত-কদর্য্য হইয়া গিয়াছে। এ স্থানে এক রাত্রি বাসের পর ঝিলাম নদীর উপরিস্থ সেতু

অতিক্রম করিয়া পর্ব্বতভেদী 'বিউগলধ্বনি' করিতে করিতে চির-আকাঙ্ক্ষিত কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলাম।

ভারতের সকল রাজ্যের মধ্যে কাশ্মীর রাজ্যের আয়তন বিশালতর। ইহার পরিমাণ প্রায় ৮৪০০০ বর্গ মাইল, বঙ্গদেশ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। লোকসংখ্যা প্রায় ৩৩০০০০০; অধিকাংশই মুসলমান। কিন্তু এ স্থানের মহারাজা হিন্দু—মহারাজধিরাজ হরি সিং বাহাদুর। কাশ্মীরের দক্ষিণে পাঞ্জাব, উত্তরে চীন তুরকীস্থান, পূর্ব্বে তিব্বত ও পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ। চতুর্দ্দিকে বিশাল হিমানী শোভিত পর্ব্বতমালার মধ্যস্থিত কাশ্মীর উপত্যকা। উপত্যকাটির আয়তন প্রায় ২১০০ বর্গমাইল ও নাঙ্গা, অমরনাথ, হরমুখ, কোলাহই, পীরপাঞ্জাল ইত্যাদি পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, আবহাওয়া, ফলফুলের প্রাচুর্য্য, জলের শোভা—জীবন যাহাতে সুখকর হয় সেই সকল উপাদানই কাশ্মীরে সুলভ ও এই কারণে ইহা ভূস্বর্গ নামে অভিহিত। কথিত আছে, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয়তমার জন্য কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন প্রশ্ন করায়, তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "সমস্ত ত্যাগ করিতে পারেন—'বেগর তক্ত জাফ্‌রান'—অর্থাৎ সিংহাসন ও কাশ্মীর ব্যতীত।

এই কাশ্মীরে প্রবেশ করিতেই বামপার্শ্বে আবগারি অফিসের কর্ম্ম-কর্ত্তাগণ বিশেষ ভদ্রভাবে তাঁহাদের নিয়মানুযায়ী আমাদের সঙ্গের কয়েকটি দ্রব্যাদি পরীক্ষা করিয়া যাইবার অনুমতি দিলেন। অতঃপর 'ঝিলাম-ভ্যালি-রোড' ধরিয়া ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বিশাল পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যস্থিত ঝিলাম নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে হিন্দুকুশের পদধৌত করিয়া অন্যান্য ভগিনীদিগের সহিত মিলিত হইবার আশায় সবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে! এই নদীর এক পার্শ্বে পর্ব্বতশ্রেণীর বক্ষ ভেদ করিয়া পথটি অসম্ভব রূপ বক্রগতিতে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুড়ঙ্গ ও সেতু অতিক্রম করিয়া শ্রীনগরাভিমুখে ধাবমান।

এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের সকল রাস্তায় দিবাভাগে গো-শকট ও রাত্রে মোটর, টোঙ্গা ও সাইকেল ইত্যাদির যাতায়াত নিষিদ্ধ।

কোহালা হইতে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী 'ডোমেল' আসিয়া পৌছিলাম। ইহা একটি মনোরম ক্ষুদ্র সহর বিশেষ। কাশ্মীর-রাজের একটি বৃহৎ বিশ্রামাগার (Rest House), ডাকবাংলো, ডাক্তারখানা ও পোষ্ট আফিস্ এ স্থানের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছে ও কিষণগঙ্গা নামক



সুড়ঙ্গে প্রবেশ (ঝিলাম ভ্যালী রোড)

একটি নদী ঝিলামের সহিত মিলিত হইয়া যে কিরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। ঝিলামের উপরিস্থ বাম পার্শ্বের ঝুলন-সেতু পার হইয়া একটি পথ এবোটাবাদের দিকে গমন করিয়াছে। এখানে সাইকেল-প্রতি আট আনা হিসাবে টোল মাশুল দিয়া কোহালা হইতে ৩৪ মাইল দূরে 'গার্হী' (উচ্চতা ২৬২৮ ফিট্) নামক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলাম। ঝিলাম নদীর উভয় কূলে গ্রামটি অবস্থিত বলিয়া ঝুলন-সেতুর দ্বারা গমনাগমনের সুবিধা করা হইয়াছে। শুনিলাম, এইরূপ মনোরম স্থানেও শরৎ কালে মশকের অত্যাচারে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হয়।

সন্ধ্যা আগত হওয়ায় রাত্রে এখানে অবস্থান করিয়া পরদিন প্রভাতে

আহারাদির পর যাত্রা করিলাম। চেনারী নামক গ্রামটি অতিক্রম করিলাম, ১৬ মাইল ভ্রমণের পর। এই পথে স্থানীয় ব্যক্তিগণের নির্ম্মিত, একটি লম্বা লৌহের তার ঝিলামের উভয় পার্শ্বে উচ্চ পাথরের উপর মজবুত করিয়া আবদ্ধ এবং মালার ন্যায় ভিন্ন একটি তার ঐ লম্বা তারের মধ্যে গলাইয়া দোলনার আকারে প্রস্তুত; এক ব্যক্তি মালার ন্যায় তারটিতে উপবিষ্ট হইয়া হস্তের দ্বারা উপরিস্থিত বদ্ধ লম্বা তারটি ঠেলিতে ঠেলিতে নদী পার হইতেছে। মালা তারটিতে দুইটি লম্বা



ঝরণার উপরিস্থ সেতু (ঝিলাম ভ্যালী রোড)

দড়ি বাঁধিয়া উভয় পার্শ্বে রক্ষিত; কারণ, যে কোন পার্শ্ব হইতে ইহা ধরিয়া টানিলে অপর পার হইতে মালাটি আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ পারাপারের অদ্ভুত ঝোলা তিন চারটি স্থানে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতে হইল; কেন না ইহা হইতে দৈবাৎক্রমে যদি কেহ পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার কোন অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

স্থানে স্থানে পর্ব্বত হইতে শীর্ণ প্রস্রবণ রৌপ্যরেখার ন্যায় রাস্তার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া নিম্নে ঝিলামের সহিত মিশ্রিত হইতেছে। রাস্তার উপর ঐ সকল স্থান অনতিগভীর নালার ন্যায় প্রস্তর দ্বারা বাঁধাই।

বর্ষাকালে ইহা ভীষণ রূপ ধারণ পূর্ব্বক পাহাড় ধ্বসাইয়া রাস্তা চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া কাশ্মীর-রাজের বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। ক্রমে পথটি বৃক্ষ গুল্মাদি-সমন্বিত তুষারাবৃত পীরপাঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করিয়া ঝিলামকে বহু নিম্নে রাখিয়া অতিশয় বক্র গতিতে গমন করায় বিপদজনক হইয়াছে। এ স্থানে মধ্যে মধ্যে ভল্লুকের অত্যাচারও হইয়া থাকে।

কোহালা হইতে ৬৯ মাইলে 'উরী' (৪৩৭০ ফিট্) পল্লীতে আসিলাম। ভূ-স্বর্গের প্রকৃত দৃশ্য এই উরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম। এখানে প্রকৃতিও যেমনি অপূর্ব্ব শোভাময়ী, স্থানীয় অধিবাসিগণও তেমনি সৌন্দর্য্যে অতুলনীয়। এই স্থান হইতে ক্ষুদ্র পল্লী সকল বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইয়া কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষত্ব প্রকাশ করিতেছে। এই সকল অঞ্চলে আট আনা হিসাবে এক রাত্রির জন্য ক্ষুদ্র ঘর ভাড়া মিলে। এখানে সুন্দর বৃহৎ বাংলো থাকা সত্ত্বেও আমরা পূর্ব্বোক্ত একখানি ঘর ভাড়া করিলাম। কিন্তু দারুণ শীতের তাড়নায় সমস্ত পোষাকাদির আচ্ছাদন সত্ত্বেও খাটিয়ার উপর উপবিষ্ট হইয়া থর থর কম্পনে জাগরণে রাত্রি ভোর হইল।

প্রাতে আট ঘটিকার পর গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দেখিলাম— সমস্ত রাত্রি ধরিয়া তুষার পতিত হওয়ায় নিকটবর্ত্তী পর্ব্বত-শৃঙ্গগুলি যেন আমাদের অসময়ে আগমনে অভিমান বশতঃ কটিদেশ পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠনে আচ্ছাদিত। এমন কি সমগ্র গ্রামখানি নীহারাবৃত হইয়া সূক্ষ্ম বরফ-স্তরে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ স্থানে বেলা দশ ঘটিকার পূর্ব্বে রাস্তায় বাহির হওয়া কঠিন। অতঃপর, উপযুক্ত সময়ে বাহির হইয়া কোহালা হইতে ৯৯ মাইল (৫১৯৩ ফিট্ উচ্চ) দূরবর্ত্তী 'বারামুল্লায়' বৈকাল চার ঘটিকায় পৌঁছিলাম। এই পথে আসিতে ৭৫ মাইলের নিকট বহু পুরাতন প্রস্তর-নির্ম্মিত একটি ভগ্ন মন্দির ও ৭৮



তুষারাবৃত পীরপাঞ্জাল পর্ব্বতশ্রেণী

মাইলের মধ্যে 'মোহরা' নামক স্থানে কাশ্মীর রাজ্যের বৈদ্যুতিক শক্তির কারখানা (Power House) দেখিলাম।

কারখানাটি দেখিবার অভিলাষে স্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারের নিকট অনুমতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। এ স্থান হইতে ৫০ মাইল দূরবর্ত্তী শ্রীনগরে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরিত হইতেছে। এই পথে ক্ষুদ্র গ্রামগুলিও এই শক্তির দ্বারা রাত্রে আলোকিত হয়। তিনটি ৩৬ ইঞ্চি ব্যাসের ষ্টীল-পাইপ-পূর্ণ জল তিন শত ফিটের উপর হইতে নামাইয়া Turbine চালান হইতেছে। ইহার সহিত



ঝিলাম নদীকূলে 'বারামুল্লা'

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদক-যন্ত্র সংযুক্ত করিয়া ২৩০০ 'ভোল্ট'কে Step up Transformer দ্বারা ৩৫০০০ হাজার পরিমাণ 'ভোল্টে' পরিণত করা হইতেছে। এইরূপ প্রবৃত্তির সাহায্যে কারখানা চালিত বলিয়া অতি অল্প ব্যয়ে এই শক্তি বিতরণ করায় স্থানীয় কুঁড়েঘরটি পর্য্যন্ত আলোকিত হইয়া থাকে।

বারামুল্লায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঝিলাম নদী মধ্যে মধ্যে দৃষ্টির

বাহিরে চলিয়া যাইতেছিল। এখানে ঝিলাম অতি শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করায় বহু নাবিকের নৌকা বাহিবার সুবিধা হইয়াছে। অনেকে এ স্থান হইতে শিকারা-যোগে (ক্ষুদ্র নৌকা) শ্রীনগরে গমন করিয়া থাকেন।

তুষারাচ্ছাদিত বিশাল পর্ব্বত-শ্রেণী ক্রমশঃই দূরে সরিয়া গেল। এখন কাশ্মীর-রাজ্যের উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। উপত্যকার প্রারম্ভে বারামুল্লা ও এ স্থান হইতে শ্রীনগরের দূরত্ব ৩৫ মাইল। বারামুল্লা সহরটি দেখিতে অতি সুন্দর। ডাকবাংলো, কাশ্মীর রাজের বিশ্রামাগার, রোমান ক্যাথলিক মিশন, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, বাজার ইত্যাদি এ স্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এখান হইতে দক্ষিণে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী 'গুলমার্গ' (৮৮৭০ ফিট্ উচ্চ) অভিমুখে একটি পথ চলিয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয়, ঐ স্থানে বরফ পড়িয়া যাওয়ায় এইরূপ অল্প শীতবস্ত্র লইয়া তথায় যাইতে ভরসা হইল না। যাহা হউক, একজন কাশ্মীরী হিন্দু ধনী ব্যবসায়ী—মোহন সিং বালি মহাশয়ের বিশেষ অনুরোধে আজিকার জন্য তাঁহার অতিথি হইতে বাধ্য হইলাম।

পরদিন আমরা তাঁহার কাছে বিদায় গ্রহণের পর বাজার হইতে সামান্য খাদ্যদ্রব্যাদি ক্রয় করিতে গেলাম; কারণ, 'উলার' হ্রদ দেখিয়া শ্রীনগর পৌছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যাইবে। এমন সময় স্থানীয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আমাদিগকে যেন কি এক অপরূপ জীব মনে করিয়া দেখিবার জন্য ঘিরিয়া দাঁড়াইল। লাল আপেলের ন্যায় বর্ণযুক্ত লোকগুলিকে দেখিয়া মনে হইল—সত্যই যেন তাহারা স্বর্গের অধিবাসী। শীতের প্রতাপে ইহারা প্রত্যেকে গরম বস্ত্রের অঙ্গরাখা পরিয়াছে, কিন্তু প্রত্যেকের উদরগুলি হাঁড়ির ন্যায় স্ফীত দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানিতে পারিলাম—প্রচণ্ড শীতের প্রতাপ হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত অঙ্গরাখার মধ্যে 'কাংড়ী' (হসন্তিকা) লইয়া

আছে। কাংড়ী অর্থাৎ একটি মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ভাণ্ডের চতুঃপার্শ্ব বেত্র দ্বারা বুনন করিয়া ফুলের সাজির ন্যায় প্রস্তুত। ইহার মধ্যে অগ্নি রক্ষা করিয়া শীত-প্রধান দেশে শরীর উত্তপ্ত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অকস্মাৎ বিউগ্‌ল-ধ্বনিতে জনতা হটিয়া গেল, আমরাও বারামুল্লা ত্যাগ করিলাম। এখান হইতে শ্রীনগর অবধি বেড়ার ন্যায় 'সফেদা' বৃক্ষের (Poplar Tree) সারি পথের দৃশ্য অতি চমৎকৃত



যেন কি এক অপরূপ জীব মনে করিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইল
(বারামুল্লা বাজার)

করিয়াছে। কিন্তু তুষার পতনের সময় বলিয়া কাশ্মীরের সকল বৃক্ষের ফল আহরণের পর পত্রাদি ঝরিয়া পড়িতেছে। অসময়ে কুসুম-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রায় প্রতি বৃক্ষের অবস্থা দেখিলাম কঙ্কালসার। পথে যাইতে যাইতে মধ্যে মধ্যে আপেল, ন্যাস্‌পাতি ও আখ্‌রোট বৃক্ষাদি দৃষ্টিগোচর হয়; কিন্তু হায় এই সকল বৃক্ষের ফল আপন হস্তে আহরণ করিয়া গলাধঃকরণের সৌভাগ্য বিশেষ ঘটিল না! তের, চৌদ্দ প্রকারের আপেল ও ন্যাসাপতি ব্যতীত অন্যান্য মেওয়া ফলও প্রচুর পরিমাণে এখানে



'সফেদা' বৃক্ষের সারি পথের দৃশ্য অতি চমৎকৃত করিয়াছে

উৎপন্ন হয়। দুঃখের বিষয়, কলিকাতায় এক প্রকার আপেল ন্যাসপাতি ভিন্ন আর আমাদের চক্ষে পড়ে না। এখানে সকল স্থানের বাজারে এই সকল মেওয়া ফল অতি অল্প মূল্যে এখনও বিক্রয় হইতেছে।

যাহা হউক, এখন একঘেয়ে পর্ব্বতোপরিস্থ পথের পরিবর্ত্তে সমতল ভূমির উপরে শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া মনে অপার আনন্দ হইল। বারামুল্লা হইতে নয় মাইল অতিক্রম করিয়া বাম পার্শ্বের পথটি ধরিয়া চার মাইল পরে 'সোপোর' নামে একটি গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এখান হইতে কর্দ্দম-যুক্ত জলাভূমি ও বনভূমির মধ্যস্থ প্রায় দুই মাইল সরু পথ অতি কষ্টে পার হইয়া ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত ডাক-বাংলোয় পৌঁছিলাম। ঝিলাম নদী উলার হ্রদ ভেদ করিয়া এ স্থান হইতে বাহির হইয়াছে। বাংলোয় সাইকেলগুলা রাখিয়া উলার হ্রদের দৃশ্য দেখিতে শিকারাযোগে বাহির হইলাম।

ঝিলাম নদী ও চতুঃপার্শ্বস্থ তুষারাবৃত পর্ব্বতের জলধারা, ৫১৮০ ফিট উচ্চে প্রায় এক শত বর্গ-মাইল ব্যাপিয়া এই উলার হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতের মধ্যে সকল হ্রদ অপেক্ষা এই হ্রদটি বৃহৎ। এ হ্রদে প্রচুর পরিমাণে পানিফল ও মৎস্যাদি জন্মিয়া থাকে। তিন ঘণ্টাকাল শিকারাযোগে হ্রদে ভ্রমণ করিলাম। বেলা তিনটা বাজিতেই সূর্য্যদেব দৃষ্টির অন্তরালে কোথায় লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া শীত প্রবল পরাক্রমে আমাদের আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। শীতের কবল হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তথা হইতে পলায়ন করিয়া শ্রীনগরের দিকে ছুটিলাম।

বারামুল্লা হইতে ১৬ মাইলে 'পাট্টান' নামক ক্ষুদ্র গ্রাম। এখান হইতে দুই মাইল অতিক্রম করিতেই 'ঝিলাম ভ্যালী রোডে'র মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান (৫৩০০ ফিট্) পার হইলাম। মধ্যে মধ্যে চেনার নামক বৃক্ষের দ্বারা পথের সৌন্দর্য্য বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। দূরে নাঙ্গা পর্ব্বতের

তুষারাবৃত শৃঙ্গে সূর্য্যের রক্তবর্ণ রশ্মি পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। দিবা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্ধ্যার ক্রোড়ে লুক্কায়িত হইল। তখন আমরা সাইকেল হইতে অবতরণ করিয়া আলোগুলি প্রজ্জ্বলিত করিলাম। কয়েক মাইল আসিবার পর একটি কাষ্ঠ-ফলকের উপর লিখিত অক্ষরগুলি গুলমার্গের ভিন্ন একটি পথ নির্দ্দেশ করিল। ইহা দক্ষিণে রাখিয়া কিছুদূর যাওয়ার পর দূরে কতকগুলি আলো দেখিতে পাইয়া আমাদের মন বিপুল আনন্দে নাচিয়া উঠিল



উলার হ্রদে শিকারাযোগে হুইলার্সগণ

ও সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলাম—ঐ শ্রীনগর! কিন্তু দারুণ শীতে ওষ্ঠদ্বয় কাঁপিতে কাঁপিতে কথাটি বিকৃত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিল। আমি উল্লাসে বিউগ্‌ল ফুৎকারিত করিতেই অতি কষ্টে স্বর বাহির হইল,—চিঁ-ইঁ-ইঁ।

৮ই নভেম্বর রাত্রি আট-ঘটিকায় শ্রীনগরে উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত ললিত চন্দ্র বসু মহাশয়ের বাটীতে যাইয়া উঠিলাম। ললিতবাবু কাশ্মীর রাজ্যের প্রধান ইলেক্‌ট্রিক্যাল ও মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এখানে আমরা তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলাম না; কারণ, তিনি জম্মুতে নামিয়া

গিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে বন্দোবস্ত থাকায় তাঁহার বাটীর রক্ষক আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। আমাদের মত অত্যাচারীর দল মধ্যে মধ্যে আসিয়া ললিতবাবুকে বিরক্ত করেন বলিয়া তিনি তাঁহার বাটীর মধ্যে দুইটি সুন্দর কাম্‌রা অতিথিশালায় পরিণত করিয়া রাখিয়াছেন।

দারুণ শীতে এ স্থানে পাঁচ দিনের অধিক অবস্থান করা অসহ্য হইয়া উঠিল। কারণ, আমাদের শীতের পোষাকাদি এখানকার শীতের তুলনায় কিছুই নহে। এই সময় রাত্রে ৩২ ডিগ্রির নিম্নে ও দিবসে ১২ টা হইতে ২টা অবধি ৪৫ ডিগ্রি উত্তাপ তাপমান যন্ত্রে উঠিতেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের নিকট শুনিলাম, এক্ষণে আকাশে মেঘ জমিলেই বৃষ্টির পরিবর্ত্তে তুষার পতিত হইবে। প্রতি বৎসর এখানে প্রায় আট ফিট্ অবধি তুষার পতিত হয়। এইরূপ সময় ভূস্বর্গবাসী হওয়া নির্বুদ্ধিতা। ভূস্বর্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার সময়, ইংরেজী 'মে' মাস হইতে 'অক্টোবর' মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত। আমাদের মত এইরূপ সময়ে যদি কেহ শ্রীনগর ভ্রমণে বাহির হন, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন —বৎসরান্তে ভূস্বর্গে কলি লেপন; অর্থাৎ চতুঃপার্শ্বে তুষার-মণ্ডিত পর্ব্বতরাজি দেখিয়া মনে হয়, কলি ফিরানর প্রারম্ভে শ্রীনগর-অট্টালিকার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে চূণ স্তূপীকৃত করা হইয়াছে। সমস্ত রাত্রি নীহার পতনে দিবসে নয়টা পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম বরফ-স্তর জমিয়া থাকায় মনে হয়, স্তূপীকৃত চূণ হইতে কিয়দংশ বাতাসে উড়িয়া নগরময় বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এইরূপ বিক্ষিপ্ত চূণ অর্থাৎ নীহার বা সূক্ষ্ম বরফ-স্তর হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত নগরবাসী বিশেষ কোন কারণ ব্যতীত দিবসে দশ ঘটিকার পূর্ব্বে ও রাত্রি আট ঘটিকার পর পথে বাহির হন না। কাশ্মীরী নারীর রূপ ভূ-স্বর্গ সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কলি লেপনের সময় গৃহমধ্যস্থ আসবাবাদি নষ্ট হইবার ভয়ে যেমন বস্ত্রের দ্বারা আবরিত করা হয়— সেইরূপ এখন এই অপ্সরাগণ তাহাদের অনিন্দ্যসুন্দর রূপটি অঙ্গরাখায়



ঝিলাম নদীর উভয়কূলে শ্রীনগর

আবৃত করিয়া 'কাংড়ী'র দ্বারা ভূষিতা, স্ফীত-উদর লইয়া কার্য্য-কর্ম্মে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।

কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ভূস্বর্গের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত ও মহারাজার গ্রীষ্মাবাস। শীতকালে মহারাজ জাম্মুতে অবস্থান করেন। শ্রীনগরের শ্রী অতি সুন্দর। সহরটি ঝিলাম নদীর উভয় কূলে বিরাজমান ও সাতটি সেতুর দ্বারা সংযোগিত। নদীর উভয় কূলে অসংখ্য হাউস-বোট এক্ষণে জনশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে। ঝিলাম হইতে কয়েকটি কাটা খাল নগরের মধ্যে ছড়াইয়া রহিয়াছে। এই সকল খালেও হাউস্-বোট যথেষ্ট; —কিন্তু খালের জল অতি অপরিষ্কার। হাউস্-বোটগুলি এক একটি ক্ষুদ্র বাংলো আকারে নির্ম্মিত। ভিতরে শুইবার ঘর, স্নানের ঘর ও বিলাতী কেতায় সাজান বৈঠকখানা আসবাব-পত্রাদিতে পূর্ণ। রাত্রে এই ঘরগুলি বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত হইয়া হাউস-বোটের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে। এখন ইহা অতি অল্প মূল্যে ভাড়া পাওয়া যায়। এইসকল হাউস-বোট হইতেই সকল প্রকার ভৃত্য মিলে। আমাদের রন্ধন কার্য্যের জন্য একটি পাচক এ স্থান হইতে লইয়া গিয়াছিলাম। অবশেষে তাহার ব্যবহারে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইয়াছিল। ইহার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে হইলে অধিকতর বকিতে হয়; কিন্তু কয়েকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। যদি কেহ কাশ্মীর ভ্রমণে গিয়া এইরূপে ভৃত্য নিয়োগ করেন, তাহা হইলে পূর্ব্বেই তাহার সহিত মাহিনার বন্দোবস্ত করিবার সময় অন্ততঃ দুইজন সাক্ষী সংগ্রহ করিতে ভুলিবেন না। কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে ইহাদের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন; নতুবা তিন জনের আহারের বন্দোবস্তে একজনেরও কুলাইবে না। ইহারা ভয়ানক মিথ্যাবাদী ও অপরিষ্কার। কিন্তু অতিশয় কাপুরুষ। ইহাদের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে খুব কড়া হইতে হইবে—এই কথাটি যেন সর্ব্বদা মনে থাকে, নচেৎ ঠকিতে হইবে।

শ্রীনগরের রাস্তা-ঘাট প্রশস্ত। কিন্তু এক এক স্থানে অসম্ভব রূপ সঙ্কীর্ণ গলির দুই পার্শ্বে কাষ্ঠ-নির্ম্মিত গৃহে কাশ্মীরীগণ বসবাস করেন। এই সকল পথ-ঘাট বড়ই অপরিষ্কার এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগের সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর দেহটি সর্ব্বদাই অপরিচ্ছন্নতায় পূর্ণ। এইরূপ অপরিচ্ছন্নতার জন্য এখানে প্রায়ই ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হয়। কাশ্মীরে মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্পও হইয়া থাকে; সেই জন্য এখানকার সকল গৃহই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। প্রত্যেক গৃহের কামরা উত্তপ্ত রাখিবার জন্য চিম্‌নির বন্দোবস্ত আছে। শ্রীনগরের বাজারটি বৃহৎ, এমন কোন দ্রব্য নাই যাহা দুষ্প্রাপ্য। উপত্যকার ভূমি উর্ব্বর বলিয়া তথায় সকল প্রকার ফসলাদি জন্মিয়া থাকে এবং ঐ সকল দ্রব্য অতি সুলভে বিক্রীত হয়। ইহা ব্যতীত তুলা, জাফ্‌রাণ, তামাক, গম ইত্যাদির চাষও হইয়া থাকে। পূর্ব্বে কলিকাতায় অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম যে, কাশ্মীরের চাউল অতি উৎকৃষ্ট; কিন্তু আমরা যথেষ্ট অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি অতি উৎকৃষ্ট চাউল এ স্থানে জন্মায় না। পেশোয়ার ও ডেরাদুন হইতে উত্তম চাউল এখানে আমদানী হয়। অবশ্য এখানে সাধারণ চাউল যথেষ্ট পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু বিদেশে রপ্তানী আইন-বিরুদ্ধ।

যাহা হউক, কাশ্মীর শিল্পীর স্বপ্ন! গরম বস্ত্র, স্বর্ণ, রৌপ্য ও কাষ্ঠের শিল্প এবং নানারূপ কারুকার্য্য-বিশিষ্ট শাল, রেশম প্রভৃতি—এ সকলের তুলনা হয় না। পুরাকাল হইতেই এ স্থান রেশমের শিল্পের জন্য বিখ্যাত। এক্ষণে জগতের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ কারখানা স্থাপিত হওয়ায় রাজ্যের আর্থিক অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। কারখানাটি 'মোহরা' হইতে বৈদ্যুতিক শক্তি লইয়া চালিত। প্রায় ৪০০০ হাজার ব্যক্তি এ স্থানে প্রত্যহ কার্য্য করিতেছে। কারখানায় 'গুটি' হইতে কেবলমাত্র সূতা বাহির করা হয়, বস্ত্র তৈয়ারী হয় না। ইহা ব্যতীত শ্রীনগরে দেখিবার মধ্যে এই কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—রেশমের কারখানার

সন্নিকটে যাদুঘর ও টেক্‌নিক্যাল স্কুল। এই স্কুলের ছাত্রগণের কাষ্ঠের কারুকার্য্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তখ্‌ত-ই-সুলেমান বা শঙ্করাচার্য্য পাহাড়; এই পাহাড়টি সহরের অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। ইহার উচ্চতা এখান হইতে প্রায় এক হাজার ফিট্।

পাহাড়ের চূড়ায় একটি মন্দির অবস্থিত; ইহার মধ্যে প্রায় পাঁচ ফিট্ উচ্চ এবং তিন ফিট্ ব্যাসের একটি কাল পাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিগ্রহটির নাম জ্যেষ্ঠবর। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ২০০ অব্দে বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী জালক কর্ত্তৃক এ স্থানে একটি মন্দির স্থাপিত হয়; এক্ষণে তাহার চিহ্ন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে রাজা গোপাদিত্য ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি সংস্কার করিয়া শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। পুনরায় ইহা লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল; কিন্তু অষ্টম শতাব্দীতে হিন্দুধর্ম্ম-সংস্কারক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যদেবের আমলে ইহা পুনঃ সংস্কৃত হয় এবং তৎকাল হইতে পাহাড়টি শঙ্করাচার্য্য নামে অভিহিত। পাহাড়ের অপর নাম তখ্‌ত-ই-সুলেমান হইবার কারণ সম্বন্ধে এই কিম্বদন্তী শুনিলাম, কোন সময় মুসলমান কর্ত্তৃক মন্দির আক্রান্ত হইয়া মস্‌জিদে পরিণত হওয়ায় ঐ নামে প্রসিদ্ধ হয়; কিন্তু শিখজাতীর দ্বারা উহার পুনরুদ্ধার হইয়াছে। এক্ষণে জ্যেষ্ঠবরদেবের দৈনিক পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরের পার্শ্ববর্ত্তী তিনটি স্থানে ও চূড়ার উপর বৈদ্যুতিক আলো থাকায় রাত্রে বহুদূর হইতে আলোক-স্তম্ভের ন্যায় কার্য্য করে। এই পাহাড়ে আরোহন করিবার পরিষ্কার পথ আছে। শ্রীনগর সহরটি যে ক্ষুদ্র নহে, তাহা ইহার উপর হইতে উত্তমরূপে ধারণা করা যায়। ডাল হ্রদের দৃশ্য ও গোলক ধাঁধার ন্যায় ঝিলাম নদী কিরূপে নগরের মধ্যে প্রবাহিত—তাহা ইহার উপর হইতে নিরীক্ষণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।

হ্রদকে কাশ্মীরী ভাষায় 'ডাল' কহে। সহরের এক প্রান্তে দশ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া স্বল্পগভীর স্বচ্ছ-সলিলা ডাল। জলের উপর নল ও

কাষ্ঠাদি ছাড়াইয়া তাহার উপর শৈবাল এবং মৃত্তিকার দ্বারা ভাসমান উদ্যান রচনা করা হইয়াছে। এই সকল উদ্যানে টোম্যাটো, কপি, তরমুজ, গাজর প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। ডালের দৃশ্য অতি মনোরম। চতুঃপার্শ্বে উন্নতশির শৈলশ্রেণী এবং 'বাগ বাগিচায়' পূর্ণ। বাদশাহ



শঙ্করাচার্য্য পর্ব্বতে মন্দির (শ্রীনগর)

জাহাঙ্গীর তাঁহার প্রিয় সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের জন্য 'সালিমার বাগ' নামে একটি সুন্দর উদ্যান এস্থানে রচনা করিয়া গিয়াছেন। মহাদেব পর্ব্বতের তলদেশে আকবর বাদসাহের রচিত রম্য উদ্যান

'নিসাম বাগ'। পর্ব্বতোপরি বহু পুরাতন ভগ্ন অট্টালিকা—পরীমহল। কিম্বদন্তী আছে, এই পরীমহলে দেবরাজ ইন্দ্রের পরীগণ ইচ্ছামত লীলাখেলা করিত। গোলাপ ভবন—ঝিলাম নদী তীরস্থ রাজ-প্রাসাদ অপেক্ষা এই ভবনে কাশ্মীরাধিপতি অধিক সময় অতিবাহিত করেন। হরি-পর্ব্বতের শৃঙ্গে আকবর বাদশাহের মৃত্তিকা-নির্ম্মিত দুর্গ অবস্থিত। এই দুর্গ দেখিতে অনুমতি-পত্র লইতে হয়। যাহা হউক, এই সকল দেখিতে হইলে শিকারাযোগে গমন করাই উপভোগ্য। ইহা ব্যতীত চশ্‌মাসাহি, চেনার-বাগ্, নাসিম্‌বাগ্, মুন্সীবাগ্ প্রভৃতি উদ্যানও রহিয়াছে।



শ্রীনগর, শীতের তাড়নায় হুইলার্সগণের অবস্থা

পঞ্চ দিবসের মধ্যে আমরা পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহ দর্শন করিয়া জাম্মুর পথে ফিরিবার জন্য একটি মোটরবাসের বন্দোবস্ত করিলাম। কাশ্মীরে দর্শনীয় আরো অনেক স্থান আছে; কিন্তু ঐ সকল স্থান বরফে ঢাকিয়া যাওয়ায় দর্শন ঘটিল না। আমাদের সাইকেলযোগে জাম্মু গমনের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু জাম্মু হইতে ললিতবাবু টেলিফোনে নিষেধ

করিয়াছিলেন। কারণ, এই পথে নয় হাজার ফিট্ উচ্চে উঠিতে হয় এবং সাত হাজার ফিট্ হইতেই স্থানসমূহ তুষারাবৃত হইয়া গিয়াছে। রাত্রে তুষার পতনের পর, দিবসে পথ পরিষ্কার করিবার নিমিত্ত লোক নিযুক্ত করা আছে। শুনিলাম, আর কয়েক দিবস পরেই এই পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে।

* * * * *

১৩ই নভেম্বর—তখন বেলা এক ঘটিকা। সূর্য্যদেবের প্রখর কিরণের পরিবর্ত্তে দূরে তুষার-কিরীটধারী পর্ব্বত-শৃঙ্গ নিমেষে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘের অন্তরালে অদৃশ্য হইল। শুনিয়াছিলাম, এ সময় আকাশে মেঘ জমিলে তুষারপতন সুনিশ্চিত। আমরা অত্যাধিক শীতের তাড়নায় মরিয়া হইয়া তুষার পতনের দৃশ্য দেখিবার অপেক্ষায় ছিলাম; কিন্তু হায়! এক্ষনে আমাদের মোটরবাস্ ভূস্বর্গের রাজধানী দূরে ফেলিয়া দ্রুতগতিতে ছুটিয়াছে জাম্মুব উদ্দেশ্যে। দেখিতে দেখিতে সেই কৃষ্ণকায় মেঘটি ক্রমশঃই দূর হইতে দূরে সরিয়া অদৃশ্য হইল।

পাঁচ মাইলের পর হইতেই 'পাম্পর' পর্য্যন্ত (৮ মাইল) মোটরবাসটি জাফ্রাণ ক্ষেত্র ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। বহুস্থানব্যাপী নবদূর্ব্বাদল-সদৃশ শ্যামল জাফরাণ গাছগুলি গাঢ়-রক্তবর্ণ পুষ্পে শোভিত। ইহার সুগন্ধ বায়ুমণ্ডল সুরভিত করিয়া আমাদের প্রাণ মাতাইয়া তুলিল। ক্রমশঃ যাইতে যাইতে বনিহাল গিরিসঙ্কটের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

চড়াই সুরু হইল। পর্ব্বতের পর পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া বাস চলিতে লাগিল। পথের গতি অতিশয় বিপদজনক বলিয়া বাস-চালক অতি সন্তর্পণে বাস চালাইতে আরম্ভ করিল। এই পথে বর্ণনাতীত দৃশ্য দেখিয়া আমরা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া গেলাম!

সন্ধ্যা হইতে দুই ঘণ্টা কাল বিলম্ব। সহসা সুনিবিড় মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন হইল। প্রবল বেগে বাতাস বহিতে লাগিল। তখন আমরা নয়

হাজার ফিট্ উচ্চে প্রকাণ্ড একটি সুড়ঙ্গ ভেদ করিয়া গেলাম। নিম্নে, উপরে, পর্ব্বত গাত্র সমূহে—কেবল বরফ ; এমন কি নির্ঝরগুলি পর্য্যন্ত জমিয়া বরফাকারে পরিণত হইয়াছে। এইভাবে সুড়ঙ্গ পার হইয়া উৎরাইয়ে নামিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা নামিয়া আসিল ; অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়িতে লাগিল। ধরণী অন্ধকারময়ী হইতেই ৭১ মাইল দূরবর্ত্তী 'বনিহাল' (৫৫০০ ফিট্ উচ্চ) নামক গ্রামে এক রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যূষে বাস্ পুনরায় ছুটিয়া চলিল।

কয়েক মাইল অতিক্রম করিতেই এই পথে ঝিলামের ভগ্নী 'চেনাবে'র সহিত সাক্ষৎ। এইরূপে বহু চড়াই ও উৎরাই ভাঙ্গিয়া নানাপ্রকার পাহাড় পর্ব্বতের অতি চমৎকার দৃশ্য দেখিতে দেখিতে বেলা চার ঘটিকায় জাম্মুতে (১২০০ ফিট্ উচ্চ) উপস্থিত হইলাম। ভূ-স্বর্গ ত্যাগ করিয়া আসিতেই ভূতলের উষ্ণ-বায়ু শরীরে লাগিয়া অত্যন্ত আরাম বোধ করিলাম। শ্রীনগর হইতে জাম্মু ২০৩ মাইল। এখানে আসিয়া ললিত-বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

এখান হইতে সাইকেলে কানপুর অবধি যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নির্দ্ধারিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় সকলে ট্রেণযোগে কলিকাতায় ফিরিতে বাধ্য হইলাম। ১৫ই নভেম্বর ট্রেণে আরোহণ করিবার পূর্ব্বেই বিউগ্লে অবসর লইবার ইঙ্গিত (Retreat-call) ধ্বনিত করিলে গগন-মণ্ডল মুখরিত হইয়া উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও এ বৎসরের ন্যায় ভ্রমণের নেশা ছুটিয়া পলাইল। অবশেষে আমরা সশরীরে দেশে ফিরিয়া আসিলাম।
